শ্রীমতী ছবি মুখোপাধ্যায়

বনতোষী

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

বনকেতকী

বাবার স্মৃতি-উদ্দেশে

বনকেতকী

ঝিরঝির করে এক পসলা বৃষ্টি ঝরে পড়ে। অসীমা হাত বাড়িয়ে শার্সীটা টেনে দেয়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকেনা ঐ ঝিরঝিরে বৃষ্টিটুকু। আবার দেখা দেয় পশ্চিমাকাশে ক্রমবিলীয়মান ভঙ্গিতে শরতের মেঘ-মুক্ত আলোর ছটা! জলভরা খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো সারা আকাশটা জুড়ে পেঁজা তুলোর মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর তারই উপর ছড়িয়ে পড়েছে সূর্য্যাস্তের খানিকটা লাল্‌চে আলো! মনে হচ্ছে আকাশের বুকে বুঝি কোন এক খেয়ালী শিল্পী উল্টে দিয়েছে তার নানা রং-ভরা বাটিগুলো! তাই এত রংয়ের খেলা!!

উদাস বিষণ্ণ চোখে অসীমা রঙ্গীন আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার মুখের উপর, খোঁপার পাশে, শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে আকাশের রং ছড়িয়ে পড়ে যেন আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেল্‌ছে। ঐ স্বল্প আলোর আবছা ছায়া অসীমার সর্ব্বাঙ্গে যেন আর্দ্রতা ছড়িয়ে দেয়। জলভরা মেঘের মতই তার চোখ দুটো বিষণ্ণতায় ছলছল করছে প্রতি মুহূর্ত্তে ঝরে পড়ার অব্যক্ত একটা ব্যাকুলতায়। তবু অসীমা কাঁদেনা। শুধু মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে, নিচের গাড়ীবারান্দা দিয়ে এই মুহূর্ত্তে যে ট্যাক্সিখানা

ছুটে যাবে, সেই দিকে চেয়ে একটু হাসে। চলে গেল ধ্রুব আর তার মা! আবার জনশূন্য সেই রাজপথ চোখের সামনে থমথম করতে থাকে। যেন মৃত্যুর তুহিন শীতল বাতাস সিরসির করে চতুর্দ্দিকে বইছে। যে মহানগরীর পথ জনকোলাহলে সর্ব্বদা মুখর, উচ্ছ্বাসে উদ্বেল, আজ সেই পথ মৃত নিস্পন্দ!! প্রতিদিনের সেই পিচ-ঢালা কর্ম্মব্যস্ত মানুষের ঢেউ-তোলা পথ নয়, যেন বিরাট এক কালনাগ পড়ে আছে চকচকে মসৃণ দেহ এলিয়ে দিয়ে। অসীমা কেমন যেন চমকে ওঠে রিক্ততার শ্বাস ফেলে। ষোলই আগষ্টের আন্দোলন আজ মানুষকে পশুর স্তরে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে। মানুষই আজ মানুষের চোখে মৃত্যুর দূত, মানুষই আজ মানুষকে দেখে কেঁপে উঠছে ভয়ে! বুঝি সমগ্র পৃথিবীটা হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাই চতুর্দ্দিকে এত আর্ত্তনাদ, আর আতঙ্কের ছায়া!!

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিছুটা অবশ্য কমে এসেছে, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষ আজ বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলেছে বলেই, রাজপথের সেই কর্ম্মব্যস্ত কোলাহলমুখর চেহারাটা আর চোখে পড়ছে না। প্রত্যেকটি বাড়ীর বন্ধ দরজা জানালার ভিতর থেকে একটা ভয়-ভয় থমথমে জমাট আবহাওয়া রাস্তার গায়ে ছড়িয়ে পড়ে পথের নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর করে তুলছে। তবে রাস্তা দিয়ে যে একেবারেই চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে একথা বলা যায় না। কেননা, মধ্যে মধ্যে দু' একজন-পথিক, গাড়ী, ঘোড়া প্রয়োজনে ঠিকই যাওয়া আসা করছে। কিন্তু সেই চলাচলের মধ্যে পূর্ব্বেকার অন্তরঙ্গতাটা যেন নেই; আছে প্রতি পদক্ষেপে অবিশ্বাসীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে সতর্ক করে রাখার বিশেষ একটা ভঙ্গি! অসীমা পথের দিকে চেয়ে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যায়! মনে হচ্ছে জীবন্ত শহরটা হঠাৎ বুঝি কোন এক জাদুর প্রভাবে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেছে, বাঁচার আর কোন

আশাই নেই! হিংসার বিষে বুঝি সারা পৃথিবীটাই মরে গেছে, তাই আশ্রয়হীন মানুষগুলো সব বিহ্বল চোখে চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? যেখানে মীমাংসা নেই—আছে শুধু স্বার্থের হানাহানি, সেখানে বাঁচার আশা করাই যে বোকামি! তবু, ভয়ার্ত্ত মানুষ বাঁচতে চায়! তবু ভাঙা-ঘর আবার নতুন করে সে বাঁধতে চায়! নিজের মনেই একটু হাসি আসে অসীমার।

একদিন যারা স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জির বিরাট বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর দখল করে সামান্য একটু আশ্রয় নিয়েছিল, আজ তারা সবাই আবার যে যার স্থানে চলে গেল। অর্থাৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আশ্রয়হীন, আর যে শুধু আতঙ্কেই পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে, আজ সবাই তারা এক এক করে চলে গেল। একদিন বিনা দ্বিধায়, বিনা আহ্বানে যেখানে তারা ভয়ার্ত্ত পশুর মত ছুটে এসে মুখ থুব্‌ড়ে পড়েছিল, আজ সেখান থেকে সবাই তারা চলে যাচ্ছে, অসীমার আতিথ্য আর উদারতার যথেষ্ট প্রশংসা করতে করতে। এমনকি সদ্যবিধবা দাঙ্গায় নিহত প্রমথের স্ত্রীও ধ্রুবকে কোলে করে অসীমার পায়ের ধূলো নিয়ে হাসিকান্না মেশান অনেক স্তুতি গেয়েই দূরাত্মীয়ের সঙ্গে চলে গেল কিছু আগে। এখনও অসীমা দেখতে পাচ্ছে রবারের হাঁসটা ধ্রুব দু' হাতে চেপে ধরে প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ শুনে যেন হাস্‌ছে।

চোখদুটো চট্ করে মুছে ফেলে অসীমা। যাকে সে পাবে না তার জন্য চোখের জল ফেলার কোন কারণ নেই। সত্যিই ত' কেউই এরা থাকতে এখানে আসেনি! আর সেও এমন কোন অনাথআশ্রম খোলেনি যে, কে কোথায় দাঙ্গায় নিহত হয়েছে, কিংবা বিপন্ন হয়েছে, তাদের সাহায্য করবে জীবনভোর। বরং তারা যে চলে গেছে, এর জন্য সে কৃতজ্ঞ তাদের কাছে। এই মাস কয়েকে বাড়ীতে যেন ঢোকাই বিভ্রাট হয়ে উঠেছিল অসীমার পক্ষে। চেনা নেই, জানা নেই, কত যে ছেলে-

মেয়ে, অথর্ব্ব পঙ্গু নানা বয়সের লোক বাড়ীর মধ্যে জমা হয়েছিল তার হিসাব করা যায় না। যেন তার কর্ত্তব্য এদের সেবা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, এদের একটা ব্যবস্থামত স্থানে নিজের অর্থব্যয় করে পাঠান। কিন্তু কেন সে এদের জন্য এত খরচ করবে? যারা অসীমার কেউ নয়, যারা তার শুধু করুণাটুকুই চেয়েছিল, তাদের জন্য এই বৃথা খরচের প্রয়োজন কি? সত্যিই সে ভুল করেছে এদের স্থান দিয়ে!

নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে, লোকগুলো নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে চলে গেল দেখে অসীমা অভিযোগ করে না। যে ধ্রুবকে অসীমা নিজের বলে আঁকড়ে ধরে এই দু'মাস ছিল, সেই ধ্রুবও জন্মের দাবী, দুধের ঋণ পরিশোধ করতে মায়ের সঙ্গে পা-পা হেঁটে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসল; নিরাশ্রয় একজন দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের বিধবা, ছেলের স্বত্ব ছেড়ে দিতে পারলেন না বটে, কিন্তু ধ্রুবর জন্য মাসিক একটা বরাদ্দ অসীমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে তিনি ভুলে যাননি। কে বলবে নিরুপমা অশিক্ষিতা গ্রামের মেয়ে! নিজের স্বার্থ কিসে বজায় থাকবে এটা তিনি বেশ ভাল ভাবেই শিক্ষা করেছিলেন বোধ হয়।

কিন্তু অসীমার এই কাঙ্গালপনা কেন? নিজের দুর্ব্বলতায় নিজের কাছেই লজ্জিত হয় অসীমা।

অসীমা ঈজিচেয়ারে সারা শরীরটা এলিয়ে দিয়ে কোলের উপর থেকে ধ্রুবর রবারের হাঁসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

"দিদিমণি"—

অসীমা রাসুর ডাকে চম্‌কে ফিরে তাকাল।

রাসু ঘরের অগোছাল জিনিসপত্রগুলো গোছগাছ করতে করতে বললে, "প্রায় ছ'টা বাজে, শচীনবাবু এখনই আসবেন।" কথার সঙ্গে সঙ্গে রাসু বিছানার উপর থেকে ধ্রুবর খেলনাগুলো চাদরসুদ্ধু জড়িয়ে তুলে নিতে নিতে বিরক্তির ঝঙ্কার তোলে—"যত আপদ এসে জুটেছিল!

দিন দিন তোমার যে কি মনের ভাব হচ্ছে সে তুমিই জান বাপু! এত বড়লোকের মেয়ের কি এসব হাঘরে নিয়ে হৈ হৈ করা পোষায়? গেছে না আমার হাড় জুড়িয়েছে।" বলতে বলতে অসীমার পুরান ঝি রাসু পাশের ঘরে ঢোকে ধোয়া চাদর আনতে।

হারিয়ে-যাওয়া অসীমা হঠাৎ যেন নিজেকে আবার খুঁজে পায়। সত্যিই ত' এতবড় সম্পত্তির মালিক যে, তার কি এসব সাজে?

অসীমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় নিজের বেশ বদলাবার জন্য। এখুনি তার মিলের ম্যানেজার শচীন লাহিড়ী আসবেন, মিল সংক্রান্ত কথা বলতে। এখন বসে থাকলে আর চলবেনা। অসীমা তাড়াতাড়ি বাথরুমের দিকে চলে যায়। রাসু এসে ঘর গোছায়।

নিচে থেকে ফোন এলো। ব্যস্ত পায়ে অসীমা ড্রইংরুমে এসে ঢুকল। শচীন লাহিড়ী একমুখ হেসে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অসীমাকে নমস্কার করে বললে, "সময়ের মূল্য আমি রেখেছি, উপরন্তু আপনিই লেট দেখছি।" শচীন লাহিড়ী হাসতে হাসতে নিজের চেয়ারে আবার জুত হয়ে বসে।

অসীমা প্রতিনমস্কার জানিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে মৃদু হেসে বললে, "লেট আমি কখনই নই, এইত ছ'টা মাত্র বাজল।"

শচীন লাহিড়ী মাথা নেড়ে দেয়ালের বড় ঘড়িটার সঙ্গে নিজের রিষ্টওয়াচটা একবার দেখে নিয়ে সহাস্যে বললে, "মাত্র ছ'টা কখনই নয়। ছ'টা বেজে তিন মিনিট বলুন।" অসীমা খিলখিল করে হেসে বললে, "বেশ—তাই হ'ল! তিন মিনিটই না হয় দেরি হয়েছে। তাই বলে, মিলের লেবারদের মত লেট্ এ্যাটেণ্ড্যান্সের দাম নিশ্চয়ই দিতে হবেনা, কি বলেন?"

"মিলের যিনি প্রপ্রাইটর তাঁর লেট্ এ্যাটেণ্ড্যান্সের দাম কাটার ব্যবস্থা করলে, আমার চাকরীই হয়ত ঘুচে যাবে তাঁর কলমের খোঁচায়। সুতরাং

চাকরীটা বজায় রাখতে আমায় বলতে হচ্ছে ঘড়িটা বোধ হয় ফাস্ট চলছে।" শচীন লাহিড়ী হাসতে থাকে, অসীমার মুখের দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারপর হঠাৎ যেন বাড়ীর ভিতর দিকে কিছু শোনবার জন্য সে উৎকর্ণ হয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করে, "আপনার নর-নারায়ণেরা এত চুপচাপ যে! ব্যাপার কি?"

অসীমা মুখের উপর থেকে চুলের গোছাটা আল্‌তো হাতে সরিয়ে দিতে দিতে হাল্কা গলায় জবাব দেয়—"চলে গেছে সব।"

"এ্যাঁ, বলেন কি, চলে গেছে? আচ্ছা হাঁদারাম ত' সব! আমি এমন সুখ-সুবিধে ছেড়ে মোটেই কিন্তু যেতাম না। সত্যি, আপনার অতিথিসেবাটা লোভনীয় বটে! মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে হ'ত যে, হাতে পায়ে একটা চোটটোট লাগিয়ে, এখানে এসে জেঁকে বসি।"

অসীমা চেয়ার থেকে উঠে লাইটটা জ্বালার জন্য সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শচীন লাহিড়ীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকায়। তারপর মৃদু হেসে বলে: "বেশত, এসেই দেখতেন আশ্রয় পাওয়া সম্ভব কিনা, দরজায় রামসিং আছে কিসের জন্যে? এখানে ঠক্-জোচ্চোর কেউ আসেনি, এসেছে যারা সত্যিই বিপন্ন আশ্রয়হীন। সুতরাং এখানে আপনার মোটেই কোন সুবিধে হ'ত বলে মনে হয় না।" কথার শেষে সে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসে সস্মিত প্রসন্ন মুখে।

শচীন লাহিড়ী কৃত্রিম ভীতি দু'চোখে ফুটিয়ে বলে ওঠে: "যাক্ আপাততঃ আপনার ঐ ভোজপুরীয়ার হাত থেকে যে বেঁচেছি, এ আমার ভাগ্যের জোর বলতে হবে। তবে এটা ঠিকই আজ যে ভাবে আমি চন্দননগর থেকে মোটরে কলকাতা এসেছি, তাতে আপনার ঐ বিপন্ন লোকগুলোর চেয়েও বিপদের সম্ভাবনা কম ছিল বলে মনে

হয় না, মুসলমানগুলো ধরলে আর আস্ত রাখতনা নিশ্চয়ই।” শচীন লাহিড়ী হাসতে থাকে প্রাণখোলা সাবলীল ভঙ্গিতে।

অসীমা প্রথমটা যেন একটু বোকার মত শচীন লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আশ্চর্য লাগে এই মানুষটিকে! তিনটে বছর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে এসেও এই লোকটিকে অসীমা আজও বুঝতে পারে না! রাগ হয়ে যায় এই বেপরোয়া সাহস দেখে, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কেউ একা মোটরে এমন করে রান্ করে? এসব সত্যি অসীমা মোটে পছন্দ করেনা বলেই মাঝে মাঝে শচীন লাহিড়ীর সঙ্গে মতের অমিল ঘটে। একটু যদি প্রাণের মায়া, শরীরে যত্ন করে লোকটি! পরিচয় অনেক দিনের হ’লেও, তিন বছর একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি কাজ করার জন্য লৌকিক ভদ্রতাটা চলে গেছে বলেই হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে অসীমা রাগত সুরে বলে ওঠে: “আমাকে বিপদে ফেলাই বুঝি আপনার মতলব, নয়? এই জন্যেই আপনাকে কোন কাজ দিয়ে আমার স্বস্তি থাকেনা। দু’দিন পরে গেলেও চলত বোধ হয়।” শচীন লাহিড়ী অসীমার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে। বললে, “ভয় পেলেই ভয় এসে দাঁড়ায়। আর দু’দিন বাদে গেলে ত’ সত্যিই চলে না। মিল যদি বন্ধ থাকে, কতটা ক্ষতি হিসেব করে দেখুন ত’? সুতরাং যাতে মিল আমাদের চালু থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবেই। দাঙ্গার ভয়ে এই ক’টা মাস দিব্বি সব মিল বন্ধ করে বসে মাইনে নিলে। কিন্তু আর বন্ধ রাখা মোটেই উচিত নয়। কাল ওরা অয়ার করে হেড অফিস থেকে যে, ষ্টাফের একটি লোকও মিলে জয়েন করতে রাজী নয়। তখন আমাকে বাধ্য করল মোটর ছোটাতে। কিন্তু এটা আমি ভেবেই পাইনা, মিলে কাজ করতে ভয়টা কিসের? বিশেষ করে সবাই যেখানে হিন্দু, একটা কলোনীর মত করে রয়েছে, সেখানে বেরুতে ভয় হবে কেন?”

শচীন লাহিড়ীর উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে অসীমা শান্ত গলায় বললে, "ভয়টা কেন, এটা আমাদের জিজ্ঞাস্য ব্যাপার নয়। কেননা ভয় যখন পাচ্ছে তখন জোর করে তাদের মিলে যোগ দেওয়ান উচিত নয়। আর একটা মাসের জন্যে মিলগুলো না হয় বন্ধই থাক। অর্থাৎ জীবনের মূল্যটা কাজের চেয়ে যখন সত্যিই অনেক বেশী তখন ওদের ছুটি দিয়ে দিন।"

অসীমার মুখের দিকে চেয়ে শচীন লাহিড়ী গম্ভীরভাবে বললে, "মিলের আপনি যদিও প্রপ্রাইটর, তবু আপনার মিলগুলো কেমন করে ম্যানেজ' করতে হবে-না-হবে সেটা যখন আমারই ওপর আইনসঙ্গত ভাবে স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জি চাপিয়ে গেছেন, তখন আমার হুকুম মতই মিল চলবে। ওদের ছুটি দেওয়া-না-দেওয়া আমার বিচারেই ব্যবস্থা হবে। তবে তর্ক করে যদি আপনি বোঝাতে চান আপনিই হেরে যাবেন। কেননা, আজকাল জীবনের মূল্য কাজের মূল্যের চেয়ে অনেকগুণ ক'মে গেছে। জানেন ত' এটা যান্ত্রিক যুগ। এযুগে জীবনের কিছুমাত্র মূল্য নেই।"

অসীমা হাসবার চেষ্টা করে বললে, "আপনার মত সাহসী কর্ম্মী ওরা যদি না হতে পারে, তার জন্যে জোর-জুলুম ত' করা যায়না।"

"কেন করা যাবেনা জোর-জুলুম। মাসের মাইনে বসে বসে যদি নিতে পারা যায়, তাহ'লে আমরাও লাঠি চার্জ্জ করাতে পারি।"

শচীন লাহিড়ীর কথা শুনে অসীমা মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে যায়! সে জানে কতটা ক্ষমতা রাখে এই লোকটি। সত্যিই অন্যায় সে মোটে সহ্য করতে পারে না। নিজে যেমন প্রাণ দিয়ে খাটে, তেমনি ভাবেই সে চায় অপরেও কাজ করুক। কিন্তু শ্রমিকরা যদি আজ প্রাণ ভয়ে মিলে যোগ দিতে রাজী না হয়, তাই বলে সে তাদের উপর জুলুম করে মিল চালু রাখবে!! মিলের চাপরাসীগুলো অসীমার

চোখের উপর ভেসে ওঠে। একটা সামান্য ইঙ্গিত মাত্র শচীন লাহিড়ীর, তারপর! তারপর আর যেন কল্পনা করতে পারেনা এমনি ভয়ার্ত্ত স্বরে অসীমা বলে ওঠে: "না না ওসব মোটে আমি সহ্য করতে পারিনা মিঃ লাহিড়ী। তার চেয়ে বরং মিল আমি তুলে দেব।"

শচীন লাহিড়ী নিজের উষ্ণতা সামলে নেয়, অসীমার পাংশু বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলে: "আপনি ভীষণ নার্ভাস দেখছি! লাঠি চার্জ্জ কখনও হয়েছে আপনার মিলে যে ভয় পাচ্ছেন অমন? তবে ভয় দেখাতে হয় মাঝে মাঝে, নইলে এইশ্রেণীর লোকগুলো মাথায় উঠে যায়।"

অসীমা ঠোঁটটা কামড়ে অনেকগুলো কথাকে যেন সামলে নিয়ে বলে: "এখানে ছোটলোক ভদ্রলোক নিয়ে কথা নয়। কেননা, প্রাণটা সকলেরই যখন এক বস্তু দিয়েই ভগবান গড়েছেন, তখন ওঁরা আপনার লেবার বলে জুলুম করা যায়না, উপরন্তু এতে ষ্ট্রাইক হতে পারে।"

"ষ্ট্রাইক হতে পারে কি, হয়েছেই ত', নইলে কোন মিলের একটা লোকও কাজে নামছেনা কেন? চার-চারটে মিল একেবারে বন্ধ। যেন ওদের ইচ্ছেয় আমরা চলব ভেবেছে!" শচীন লাহিড়ী রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে ওঠে, কথার শেষে পকেট থেকে টেলিগ্রামখানা বার করতে করতে।

অসীমা তবু কথার কাটান দেয়: "এ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের ইচ্ছেমত কোন মিল চলছে বলে শুনিনি, বরং ওরাই আপনাদের হুকুম তামিল করছে রাতদিন সমানভাবে খেটে। কিন্তু ওরা কতটা সুখ-সুবিধে পাচ্ছে একবার ভেবে দেখেছেন কি?"

"এতটা সুখ-সুবিধে কোন মিলে দেয়না, এটাও বোধ করি আপনার জানা উচিত।" তিক্তস্বরে শচীন লাহিড়ী নিজেদের মহত্বটা জানাল শুনে অসীমার ভ্রূ মুহূর্ত্তের জন্যে কুঁচকে উঠলো। তারপর হাসবার চেষ্টা করে

অসীমা বললে, "দেয়না ঠিকই, কিন্তু, যাদের নিয়ে আপনার কাজ, তাদের সুখ-সুবিধের যদি আপনিই খবর না করেন, তবে ঐ নিরাশ্রয় দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী মানুষগুলো কার কাছে নিজের দুঃখ জানাবে বলুন ত' ? অসীমা একটু আনমনা হয়ে বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে থাকে কথার শেষে। যাকে উদ্দেশ্য করে সে কথাগুলো বলল, সেই দৃঢ়চিত্ত কর্ম্মব্যস্ত শচীন লাহিড়ী জোরাল গলাতেই বলে ওঠে : "এখানে গরীব বড়লোকের কথা খাটেনা। কেননা সমগ্র পৃথিবীতেই চলছে কাজের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করে মানুষের জীবন ধারণ। তবে জন্মগত অধিকার-সূত্রে কাজের এই যা ছোটবড় হিসাব। অর্থাৎ যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের একটা শ্রেণী, আর যারা নিরক্ষর, শুধু দৈহিক শ্রম করতে পারে, তাদের একটা শ্রেণী। সুতরাং কাজের মূল্যে যখন সবাই জীবন ধারণ করে তখন অযথা লেবারদের জন্য আপনার মনটা এত কোমল করলে আমরা মিল চালাতে পারব না। দেখছেন ত', ভারতী মিলের রতন দাস আগরওয়ালার ব্যাপারটা ! যেই লাঠি তুললে, অমনি ষ্ট্রাইক ভেঙ্গে সুড়সুড় করে সব কাজে নামল।" শচীন লাহিড়ী এতক্ষণ বাদে মনের চাপা উত্তাপের বাষ্প কিছুটা ছেড়ে দিয়ে যেন হাল্কা হয়ে গেল। তারপর হাসতে হাসতে বললে, "আমি নোটিশ দিয়ে এসেছি যে, তিনদিনের ভেতর কাজে জয়েন না করলে ভারতী মিলের অবস্থা হবে। অর্থাৎ যে সব সুবিধে আমরা এখানে দিয়েছি সে সব কিছু পাবে না। উপরন্তু এই আড়াই মাসের মাইনে কাটা যাবে।"

অসীমা ঠোঁটের কোণ টিপে অদ্ভুত একটা ধারাল হাসি হেসে কথার উপর টিপ্পুনী কেটে বললে, "নোটিসটা কি শুধু লেবারদের জন্যেই টাঙ্গিয়ে দিয়ে এলেন ? আমার ত' মনে হয় যে, হোল ষ্টাফের ওপর নোটিসটা জেনারেল অফিস পর্য্যন্ত জারী করা উচিত ছিল।

শচীন লাহিড়ী হেসে উঠল অসীমার ধারাল বিদ্রূপের খোঁচায়। বলল,

"আমি যদি এই টেলিগ্রামটা পেয়ে কালই চন্দননগর না যেতাম, তা'হলে আমার দিক থেকে অপরাধী হতাম বইকি! সুতরাং আমি আপনার যথার্থবিশ্বাসী কর্ম্মচারী ঠিকই।" বলে সে হাতের টেলিগ্রামটা পকেটে রাখল। শচীন লাহিড়ীর যুক্তিটা শুনে অসীমা রাগ করতে পারে না। হেসে ফেলে বলে, "এত বিশ্বাসী কর্ম্মচারী যে তাকে কাজের কথা বলতেই ভয় হয়, নইলে সন্ধ্যেবেলা কেউ চন্দননগর এই দিনে বেরুবার সাহস রাখে? কিন্তু সবাই ত' আর আপনার মত প্রাণের মায়া না করে কাজ কাজ বলে ছুটোছুটি করতে পারেনা! সুতরাং আমি বলি কি, মিল যখন আপনার চালু করাই উদ্দেশ্য, তখন আমরা লেবারদের ডবল পেমেণ্ট করব বলে জানিয়ে দিন, দেখবেন ঐ প্রাণভয়েভীতু লোকগুলোই কেমন এক এক করে মিলে ঢুকছে। সত্যি, সামান্য এই দেড়টাকা, আড়াইটাকা, কিম্বা বড় জোর তিনটাকা রোজ হিসাবে কি নিজের প্রাণটা দিতে পারে ওরা! বরং মাইনেটা একটু বেশী হলে নিশ্চয়ই নিজের জীবন তুচ্ছ করে বেচারীরা আপনার কাজে যোগ দেবে। টাকার লোভটা ওরা সামলাতে পারবে না। অতএব ল্যাঠির ভয় না দেখিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে আপনি আপনার মিল দিব্বি চালু করতে পারেন। আমি বিবাদ ঝঞ্ঝাটের ভেতর যেতে চাই না।" শেষের দিকের কথাটায় অসীমার স্বরে যেন কর্ত্তৃত্বের সামান্য একটু ছোঁয়া শচীন লাহিড়ীর কানে এসে লাগল। কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বললে, "যুক্তিটা মন্দ নয়, কিন্তু যে পরিমাণ ক্ষতি চলছে এ ক'মাস, তাতে মাইনে বাড়ান মোটেই সম্ভব নয়।" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীন লাহিড়ী হাতঘড়িটায় দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "বড় বড় ফার্ম্মে লাভের কিছু অংশ বোনাস হিসাবে দেয়। কিন্তু আমাদের লাভ ত' হচ্ছেই না, উপরন্তু—"

"লস্ দিচ্ছেন এই বলবেন ত'? কিন্তু ওরা যদি খেতে না পায়, আপনার লাভটা তুলবেন কাদের দিয়ে বলুন ত'?" অসীমা যেন শচীন লাহিড়ীর কথাটা মাঝপথ থেকেই লুফে নিয়ে যুক্তির মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শচীন লাহিড়ী অসীমার এই সুকোমল মনের সঙ্গে অনেকদিন থেকে পরিচিত বলেই পরমাত্মীয়ের মত স্নিগ্ধ স্বরে বলে, "দয়া জিনিসটা খুবই ভাল, কিন্তু দয়ার অপব্যবহার আমি মোটেই সইতে পারছি না। এতে কতকগুলো কুড়ে আর শয়তান প্রশ্রয় পাচ্ছে। সুতরাং আপনার এই মাইনে বাড়ানোর কথায় আমি রাজী হতে পারছি না।" কথার শেষ রেশটার সঙ্গে সে যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। শচীন লাহিড়ীর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে অসীমা সহজ স্বরে বললে, "আমি না হয় কুড়ে আর শয়তানদের মাইনে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশ্রয় দিচ্ছি। কিন্তু আপনি যে আপনার মাইনের সব টাকাই লেবার এসোসিয়েশানে ঢেলে দিচ্ছেন সেটা কি দয়ার অপব্যবহার নয়?"

মুহূর্ত্তে শচীন লাহিড়ী চম্‌কে উঠে অসীমার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে একবার তাকায়। এতদিনের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও যে গোপন কথাটা আজ হঠাৎ অসীমা প্রকাশ করে দিলে তার যেন কৈফিয়ৎ হিসাবেই একটু থতিয়ে বলে, "যে টাকাটা এখানে আমি মাইনে হিসাবে পাই সেটা আমার নিজের লাগেনা। কারণ পৈতৃক সম্পত্তি আমার এত বেশী যে, আমি একটা লোক অন্ততঃ বেশ আরাম করেই জীবন কাটাতে পারি। সুতরাং মাইনের টাকাটা লেবার এসোসিয়েশানে ডোনেশান হিসেবেই আমি দিচ্ছি। মিলে, কারখানায় হাতপা কেটে সামান্য ক'টা টাকা নিয়ে চিরজীবনের জন্যে যারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাদেরই সাহায্যে আমার টাকা আমি ব্যয় করি। এই সব দাঙ্গাবাজ ষ্ট্রাইকওয়ালা কুড়ে শ্রমিকদের আমি সাহায্য করি না।"

"বেশ আমি না হয় কুড়েদেরই সাহায্য করছি, হ'ল ত'!" অসীমা

কৃত্রিম কলহের সুর কণ্ঠে এনে চেয়ারে জুত হয়ে বসতে বসতে বললে, "আমিও বলতে পারি যে, আমার পৈতৃক সম্পত্তি এত কম নয়, যাতে করে লেবারদের মাইনে বাড়ালে আমি খেতে পাব না। আমার মতন দশটা মেয়ে থাকলেও, আমার বাবার সঞ্চিত অর্থ খরচ করতে পারত কিনা সন্দেহ। সত্যি, বাবা যে এত টাকা কেমন করে সঞ্চয় করেছেন ভেবে পাই না আমি! শুনেছি, ঠাকুর্দা বলে বাড়ী থেকে এক কাপড়ে বেরিয়ে যান সটান একেবারে রেঙ্গুন। সেই থেকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি আমাদের বংশে উপুড় হয়ে ঝরে পড়তে সুরু করে।" হঠাৎ অসীমা কেমন যেন চমকে ওঠে নিজের কথাতেই। 'আমাদের বংশ' কথাটা কানে বেসুরো লাগলেও অসীমা প্রশ্রয় দেয়না পুরান চিন্তাকে। একটু সামলে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "তবে এই কথাই রইল যে মিলের লেবারদের মাইনেটা এবার থেকে বাড়ান হবে। কেননা এ বিষয় আমি অনেক ভেবেছি। সুতরাং এটা আর যুক্তি তর্ক দিয়ে আপনি কাটান যাতে না দেন, তাই আমি চাই।"

শচীন লাহিড়ী প্রথমটা কেমন যেন বোকা হয়ে যায় অসীমাকে এইভাবে কথা বলতে শুনে। তবে সেও আর এ বিষয়ে অযথা গায়ে পড়ে কিছু বলতে চায় না বলেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও, মৌখিক ভদ্রতাটা বজায় রেখে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, "আমি মিলের সামান্য একজন কর্ম্মচারী, আপনি প্রপ্রাইটর। আপনার হুকুম মতই আমাকে কাজ করতে হবে। আমি আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতায় কখনই হাত দিতে চাই না অসীমা দেবী।"

অকস্মাৎ যেন বিতর্কের স্বচ্ছল পরিবেশটি কৃত্রিম লৌকিকতার আড়ষ্টতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অসীমা অবশ্য ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু শচীন লাহিড়ীর এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে সে একটু

থতমত খেয়ে গেল কি বলবে ভেবে। তারপর যেন কৈফিয়তের সুরে বললে, "আমার কথাটা আপনি ভুল বুঝে যদি রাগ করেন, তা'তে সত্যি আমি দুঃখ পাব! সব দায়িত্বই আপনার ওপর। এসব কথা বললে কাজের ক্ষতিই হবে, লাভ আর কিছুই হবেনা। যাক্, যা ভাল হয় করুন, তবে আমার অনুরোধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামাটা দয়া করে করবেন না, দোহাই আপনার।"

অসীমা কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে আসন্ন চোখের জলটাকে সামলে নিচ্ছে দেখে শচীন লাহিড়ী কথাটাকে লঘু করতে একটু হেসে বললে, "আমি রাগ করিনি মোটেই। তবে আপনি ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল্, তাই আপনাকে একটু-আধটু না বললে চলে না। যদিও এখন অধিকারটা তেমন ভাবে পাইনি, তবু মধ্যে মধ্যে নিজের দখলীস্বত্বটা মনে জেঁকে বসে বলেই রাগ ঝাঁজ প্রকাশ হয়ে পড়ে।"

অসীমা মুখটা লাল করে চেয়ারের গায়ে পিতলের পাত্রে রাখা পামগাছটার ঢলে পড়া একটা পাতা নাড়তে নাড়তে মৃদু হেসে নিচু গলায় বলে, "নিজের দখল সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন দেখছি। যাক্, তবু ভাল, 'সীমা' থেকে হঠাৎ যেভাবে অসীমা দেবীতে এসে গেলাম, তাতে ভরসা পাচ্ছিলাম না যেন!" শচীন লাহিড়ী কি যেন প্রতিবাদের ছলে পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় রাসু রূপার ট্রে সাজিয়ে চা জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। অসীমা উঠে তাড়াতাড়ি নিজের হাতে ট্রেখানা নিয়ে পাশের মোরাদাবাদী ছোট্ট টেবিলটার উপর রাখলে, তারপর রাসুকে বললে, "তুই তোয়ালেটা কেষ্টকে দিয়ে বাথরুমে পাঠিয়ে দে, উনি মুখ হাত ধুতে যাবেন।" রাসু তাড়াতাড়ি চলে গেল অসীমার কথানুযায়ী কাজ করতে। কিন্তু যাকে নিয়ে তাদের এত ব্যস্ততা সে হঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হাত মুখ ধোয়ার পাট আপততঃ আজ তোলা থাক। কারণ আমি কাল

সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়েছি, এখন ফিরছি। বাড়ীতে মা ভাবছেন আর শরীরটাও খুব টায়ার্ড লাগছে। আজ চলি, কাল আসব, আপনার অতিথি সেবার লোভে।”

অসীমা ট্রেখানার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললে, “এর পর আর আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়। মা ভাবছেন সত্যিই। এবারে ওঁর সঙ্গে যখন দেখা হবে, আপনাকে শাসন করতে বলব ভাবছি। ছিঃ, এই দিনে কি এমনি করে কেউ বের হয়!” অসীমা কথার সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে যায় ওপাশের বড় থামটা ঘুরে। এদিকে ততক্ষণে শচীন লাহিড়ী ঘর বারান্দা পেরিয়ে হাসতে হাসতে মোটরের দিকে এগিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে শচীন লাহিড়ীর মোটরটা রাস্তার বাঁক পেরিয়ে গেল।

শচীন লাহিড়ীর কাজের একটু ইতিহাস আছে। যেদিন কাজের প্রথম ইণ্টারভিউ দিতে সে এসেছিল, সেদিনই স্যার হরিনাথের নজরে পড়ে সে। সে আজ বছর কয়েক আগের কথা। তখন সবে মাত্র সে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। তারপর স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জিই তাকে জার্ম্মানী পাঠান এবং সেখান থেকে যখন সে রীতিমত শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসে, তখন তাদের অতবড় কারখানাটা স্যার হরিনাথ শচীন লাহিড়ীর উপর ছেড়ে দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মিলগুলোও ক্রমশঃ তিনি শচীন লাহিড়ীর হাতেই যেন ঠেলে দিয়ে শেষের ক'টা দিন শান্তিতে কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, সেটা তাঁর ভাগ্যে সইল না। মাস তিন-চার পরেই হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হওয়ার দরুণ স্যার হরিনাথ মারা গেলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছাটা তিনি এইভাবেই প্রকাশ করেছিলেন যে, অসীমার যদি মত পান সানন্দে তিনি শচীন

লাহিড়ীকে জামাই হিসাবে পেয়ে খুশি হন। সেই কথাই আজ এক বছর ধরে চলছে। কিন্তু আজ অবধি অসীমা কিছুই ভেবে পাচ্ছে না তার নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। অথচ, দ্বিধাই বা আর কেন? অসীমা আর ভাবতে পারে না! কেমন যেন টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে, আকস্মিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে। অসীমাকে বিছানায় শুয়ে পড়তে দেখে' পুরান ঝি রাসু একটু শুধু হাসে। তার-পর বাম্‌নীর কাছে চাপা-গলায় হাস্য-মিশ্রিত কৌতুকের সুরে বলে, "শচীনদা খাবার খেলেন না বলে দিদিমণির খাওয়া হ'ল না। আশ্চর্য্য ভালবাসা বাপু!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে দোতালার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

বাম্‌নী মাথা হেলিয়ে বললে, "তা হবেনা, কর্ত্তাবাবু বিয়ে ঠিক করে গেছে, এখন হলেই যে বাঁচি। এম্নি খাঁ খাঁ বাড়ী আমার কিন্তু ভাল লাগে না।" রাসু কথায় সায় দিয়ে সিঁড়ি উঠতে উঠতে বললে, "তা ত' ঠিকই, তবে কবে যে দু'হাত এক হবে ভগবানই জানেন!"

অসীমা বিছানায় শুয়ে অসহ্য কান্নাটাকে যেন দমন করতে চায়। সবাই তাকে শচীন লাহিড়ীর মত মার্জ্জিত রুচির শিক্ষিত একজন ভদ্র যুবকের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়, সুখী দেখতে চায়। কিন্তু তাকে নিয়ে শচীন লাহিড়ীর জীবন সত্যিই কি পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে? যাকে অসীমা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে, যাকে পাবার জন্য অন্তরে সে প্রতিমুহূর্ত্ত আকুল, সেই লোকটির জীবনের মান-সম্মান, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছু সম্বন্ধেই অসীমাকে ভাল করে চিন্তা করতে হচ্ছে যে, শেষ পর্য্যন্ত অসীমাকে নিয়ে সে জীবন কাটাতে পারবে কিনা। একদিন যে প্রলয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে জীবনটা পর্য্যন্ত তার ভেঙ্গেচুরে বদলে দিতে হয়েছে, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের চিহ্নিত জীবনটা আবার নতুন করে ঘর বাঁধার আগে একবার ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে।

যদিও সে গ্রাম্য বালিকাটি নয়, রীতিমত শিক্ষিতা, তবু কেন জানি ঘর বাঁধতে সে ভরসা পায় না মনে। যেন জীবনের একটা দুষ্ট গ্রহের আতঙ্কে সর্ব্বদাই সে ভীত সন্ত্রস্ত !!

রাসু হঠাৎ ধমক দিয়ে বলে ওঠে, "রাতদিন কেবল চিন্তা! ঘুমোদিকি একটু!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীমার বিছানায় উঠে বসে মাতৃহারা অসহায় একটি শিশুর মত •অসীমার মাথাটা কোলে তুলে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়। রাসুর কাছে অসীমা হেরে যায়। একসময় সত্যিই সে শ্রান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, মায়ের মত স্নেহভরে যে তাকে আজও আগলে আছে, সেই বুড়ী ঝির কোলে মাথা হেলিয়ে দিয়ে।

দুই

"এই বুঝি কাল সকাল হল?" অসীমা ছোট্ট মেয়ের মত অভিমানের সুরে শচীন লাহিড়ীকে অভিযোগ করলে। তারপর তাকে নিয়ে সটান চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

শচীন লাহিড়ী হাসতে হাসতে বললে, "অফিসের ভয়ে দু'জনেই যদি পালাই, তবে বেচারীরা আমাদের অভিশাপ দেবে। তার চেয়ে বরং আসুন বারান্দায় বসি।" বলে সে ঘরের সামনেই যে বিরাট খোলা-বারান্দা ছিল নানারকম ফুলের টবে সাজান-গোছান, সেইখানে ডেক-চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। অসীমা হাসি চেপে বললে, "ঘরে ঢুকতে বুঝি ভয় হ'ল, পাছে মিথ্যে কথার জন্যে আপনার সেই ষ্টোরকিপারের অবস্থা করি!"

শচীন লাহিড়ী দুষ্টুমির সুরে বললে, "বিশ্বাস কি! উল্টে আমার ফন্দিতে আমিই যদি পড়ি। সে বেচারা ত' সরল মনেই ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু আমি যে তাকে বন্ধ করে রাখব মিথ্যে কথার জন্যে, বুঝতে পারলে কি ঢুকত?"

তা' যে ঢুকতনা সে আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি। যাক্, এই এক হপ্তা আসেননি কেন?" অসীমা সামনের টুলটা টেনে নিয়ে বসল।

শচীন লাহিড়ী অসীমার আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের দিকে চেয়ে কৌতুক করে বললে, "এই মিলের আমি জেনারেল ম্যানেজার। সুতরাং মিল সংক্রান্ত কথা ছাড়া রোজই যে মাননীয়া মালিক মহাশয়ার কাছে হাজিরা দিতে হবে, এমন কোন কথা চাকরি নেওয়ার সময় ছিল না। তাই আজ মিলের প্রয়োজনেই আমাকে এই সাত সকালে ছুটে আসতে হচ্ছে।"

"বেশ, আসাটা যদি চাকরির সঙ্গে কথা ছিল না বলেই আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখন ঐ প্রসঙ্গ আমিই বাতিল করছি।" অসীমা মুখটা ফিরিয়ে নেয়, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "মিলের কাজ ঠিক মত চলছে—না, এখন সব বন্ধ !"

"সেই কথাই ত' জানাতে এলাম, এক নোটিসেই কাজ হাসিল। এখন ওদের মাইনে বাড়ান সম্বন্ধে আপনার যা অভিমত, বলুন আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"হঠাৎ মাইনে বাড়ানর ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহের কারণটাই ত' বুঝতে পারছি না।" অসীমা কেন জানি শচীন লাহিড়ীর সহজ কথাটাকে বাঁকাভাবে ধরে ভাল করে একটা তর্কের উদ্দেশ্যে জেঁকে বসল টুলটার উপর। বোধ হয় মনের এই গুমরে-থাকা চাপা অভিমান ঝেড়ে ফেলার সুযোগ একটা পেলে। কিন্তু শচীন লাহিড়ী আজ আর তর্ক করেনা, উপরন্তু রাসুকে চা-খাবার আনতে দেখে সোল্লাসে বলে ওঠে : "যাক্ আপনি অতিথির অপমান করলেও, রাসু আমার. মনের কথাটা শুনেছে। দাও, চায়ের কাপটা আগে এগিয়ে দাও।" বলে সে রাসুর হাত থেকে চায়ের কাপটা তুলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ক'চুমুক দিয়ে কাপটা টিপয়ের উপর নামিয়ে রাখলে।

রাসু শচীন লাহিড়ীর দিকে চেয়ে স্মিত মুখে বললে, "এবেলাটা এখানেই থাবে কিন্তু, সেদিনের মত চলে যেওনা হুট্‌পুটিয়ে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমার গম্ভীর মুখের দিকে এক নজর বুলিয়ে নিয়ে রাসু ট্রে ভর্ত্তি খাবার রেখে অসীমাকে বললে, "তোমরা খাও, আমি রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।" রাসু চলে গেল দ্রুত পায়ে, দরজার পর্দাটা সরিয়ে।

"কর্ত্রীরই উপযুক্ত দাসী! হুকুম করার মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা।" অসীমা হেসে ফেললে শচীন লাহিড়ীর কথায়, বললে, "তা নাহলে আপনাদের মত লোকের সঙ্গে আমরা পেরে উঠ্‌ব কেমন করে।

যাক্, খেতে খেতে গল্প করুন”—বলে অসীমা খাবারের প্লেটটা শচীন লাহিড়ীর দিকে এগিয়ে দেয়।

শচীন লাহিড়ী মুহূর্ত্তের জন্য খাবারের প্লেটখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে, “আজকাল কি আমি খাবারের দোকানগুলো এক এক গ্রাসে খেয়ে ফেলছি বলে খবর পেয়েছেন নাকি?”

অসীমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উদ্গত হাস্যবেগটা থামিয়ে বললে, “সেটা রাস্থকেই না হয় জিগ্‌গেস করবেন? নইলে আমার আপনার প্লেটে এমন তফাৎ হ'ল কেন! বরং আমিই কাল রাতে কল থেকে এসে খাবার আর অবসর পাইনি, এমনি ঘুম পেয়েছিল। যদিও ইন্দিরা তার বাড়ীতেই থেকে যেতে বলেছিল, কিন্তু সে আমি পারিনা যেন! নিতান্ত ইন্দিরার বৌদির কেস্ বলেই গিয়েছিলাম, তা না হলে সাধারণতঃ আমি কোথাও যাই না জানেন ত'। মাঝ থেকে কাল রাতে আমার খাওয়া হয়নি, অথচ আমার ভাগেই কম।” অসীমা কৌতুকে আর খুশির ঝাপটায় মাথাটা হঠাৎ দুলিয়ে এমন ভাবে হেসে উঠল যে, পিঠের উপর রাশীকৃত ভিজে চুলের গোছা নানা ভঙ্গিমায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সদ্য স্নান করা অতিসাধারণ বেশভূষায় কখন অসীমাকে শচীন লাহিড়ী দেখেছে বলে মনে পড়েনা। কিন্তু প্রতিদিনের প্রসাধনে পরিমার্জ্জিত রূপটার সঙ্গে আজকের এই চেহারটাই যেন বেশী মুগ্ধ করে শচীন লাহিড়ীকে। একটু সময় অপলক চোখে অসীমার অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে, “মেয়েদের সকালে স্নান-করা চেহারাটা আজকাল চোখে পড়েনা বলেই ভারী ভাল লাগল এই ভিজে চুল আর স্নিগ্ধ ভাবটা। ঐ যে ঘুম থেকে উঠেই বাসি মুখে আর রুক্ষ চুলে মেয়েরা একটা প্রসাধন করে, ওটা দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে। আজ অনেক দিন আগের প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতিটা মনে পড়ল। মাকে ঠিক এমনি স্নান-করা অবস্থায় আমরা দেখতাম। এখনও মনে

পড়ে লালপাড় তসরের শাড়ী, ভিজে চুল পিঠের ওপর, কপালে টক্‌টক্‌ করছে লাল একটা সিঁদুরের ফোঁটা,—মা আমার সাজি হাতে পুজোর ঘরে ঢুকছেন। কি সুন্দরই না দেখাত মাকে! যাক ভুলে যাওয়া একটা মিষ্টি জিনিস চোখে পড়ল। আমি ভেবেছিলাম, আজকাল মেয়েরা বুঝি সকালে স্নান-করা ব্যাপারটা তুলেই দিয়েছে!"

"আরও অনেক কিছু করেছে, যথা—মাথায় কাঁপড় দেওয়াটা বন্ধ করেছে, কপালে সিঁদুর ফোঁটা দেয়না, সিঁথির একধারে একটা লাল রেখা যদি বা দিল, এমন ভাবেই ফাঁপিয়ে আলবার্ট কাটলে যে, ঐ সিঁদুরটুকুও লুকিয়ে পড়তে বাধ্য হ'ল! হাতে শাঁখা পরেনা, লোহা রাখেনা, রীতিমত কুমারী মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্ততঃ দুই তিন সন্তানের মা হয়েও মেয়েরা সাজসজ্জা করে,—বলুন বলুন, থামলে চলবে না! মেয়েদের নিয়ে নিন্দে করতেই যখন বসেছেন আজ, তখন মন খুলেই একবার করুন দেখি!"

অসীমা কথার সঙ্গে সঙ্গে চুলগুলোকে চট্ করে হাত ফিরিয়ে বেঁধে নেয়। শচীন লাহিড়ী বেপরোয়া হয়ে বলে উঠল: "আমি আগে থেকেই এসব বিষয় ভীষণ গোঁড়া—সুতরাং সাবধান!" চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অসীমা বললে, "এই না বলেন, আপনি কারুর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দেন না?"

"বেশ যখনকার কথা তখন দেখা যাবে, আপাততঃ খাওয়া যাক্,"—বলে নিজের ইচ্ছামত কিছু খাবার শচীন লাহিড়ী চামচে করে একটা প্লেটে তুলে নিলে। অসীমা বললে, "চায়ের বদলে আপনাকে কফি দিতে বলব?" শচীন লাহিড়ী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালে। তারপর বললে, "কাল আমি মিলে যাচ্ছি খবরাখবর করতে। তারপর যাব বীরভূমে রাইস মিলটার হিসেবপত্তরগুলো ভাল করে চেক্ করতে।"

"সে না হয় যাবেন, কিন্তু কাল চন্দননগর না গেলেই কি নয়? কাল আমি একবার বেরুব ভেবেছিলাম। অনেকদিন যাওয়া হয়নি, হাসপাতালটা

কেমন চলছে কে জানে!” অসীমা একটা সিঙ্গাড়া ভেঙ্গে মুখে দিলে কেমন একটু আনমনা ভাবে।

শচীন লাহিড়ী অসীমার চিন্তাধারার কিছুটা সন্ধান যেন খুঁজে পেয়েই বললে, “এই সময় খোঁজ নেওয়া বোধহয় উচিত হবেনা।”

ছেলেমানুষের মত আব্দারের সুরে অসীমা বললে, “বারে, আপনিই ত' সঙ্গে থাকবেন, এতে ভয়টা কিসের শুনি?”

হা হা করে শচীন লাহিড়ী হেসে উঠল। “আপনার মিলের লেবারদের কনট্রোল করার ক্ষমতা রাখি বলে দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের যে সামলাতে পারব, এ ভরসা দিই কি করে বলুন দেখি? বাইশ বছব বয়স থেকে যদিও হাতুড়ী পিটতে হয়েছে কলেজে, কিন্তু মানুষের মাথায় কেমন করে লাঠি ভাঙ্গতে হয় সেটা যদি প্র্যাকটিস থাকত তা'হলে আমি এখনি আপনাকে নিয়ে যেতে রাজী হতাম।”

শচীন লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে অসীমা ভ্রূটা কুঁচকে বললে, “সব সময়ই আপনি আমার কথার কাটান দেন কেন বলুন ত'?”

“যেহেতু আপনি বয়সে সাবালিকা হলেও বুদ্ধিতে নাবালিকা।”

“হ্যাঁ, তা'হলে আর এম. বি. পাশ করতে হ'ত না। বুদ্ধি আমার যথেষ্টই আছে, মোট কথা আপনি আমাকে নিয়ে যেতে চাননা এই আর কি!”

অসীমা এবারে সত্যিই রাগ করছে দেখে শচীন লাহিড়ীকে পরিহাস ত্যাগ করতে হ'ল; বললে, “নিয়ে যাব না কেন, পথে যদি কিছু বিপদ হয় সেই জন্যে বারণ করছিলাম! তবে দিন দশ বার পরে গেলে যদি চলে, আমি নিয়ে যেতে পারি। মানে, ঐখান থেকে গোটা চারেক দরোয়ান, নেপালী দুটো, আর এখানকার দরোয়ান সব কটাকে মোটর বোঝাই করে সঙ্গে নিয়ে যেতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আমি নিয়ে যেতে পারি।”

“বেশ তাইতেই রাজী। রীতিমত সাঁজোয়া গাড়ী নিয়েও আপনি যদি

আমাকে এই ক'দিনের ভেতর একবার চন্দননগর নিয়ে যান আমি উপকৃত হই।"

ঠোঁটের কোণটা মুচ্‌কে শচীন লাহিড়ী হাল্‌কা বিদ্রূপ করে, "এত উপকৃত হওয়ার যথার্থ কারণটা জানতে পারি কি?"

অসীমা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশের দিকে একটু সময় চেয়ে থাকার পর বললে, "আপনাদের চন্দননগর অফিসের হেড্‌ক্লার্ক সুরেন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কমলা দেবীকে আমার একবার দেখা প্রয়োজন। এই মাত্র তার চিঠি পেলাম, বেচারীর অবস্থা তেমন ভাল নয়। হাত-পা ফুল্‌ছে, অল্প অল্প জ্বর হচ্ছে রাতের দিকে। অথচ, স্বামী গুণধরটি কোন খবরই রাখেন না! সত্যি, এইসব দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষগুলো সংসারে কেমন করে স্বামী নামধারী এক ভগবান সেজে, স্ত্রীর সেবায় পরিপুষ্ট হয়ে ভোগবিলাসে জীবন কাটাবার সুবিধেটা করে নেয়, ভেবে পাইনা! আর এরই ফলে,—মাঝ থেকে কতগুলো রুগ্ন অসহায় শিশু পৃথিবীতে আসে শুধু কষ্ট করতে—ছিঃ ছিঃ!" হঠাৎ এতগুলো কথা শচীন লাহিড়ীর কাছে বলে ফেলে অসীমা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারপর নিজেকে সহজ করার উদ্দেশ্যে বলে, "কমলাকে আমি হাসপাতালে ভর্ত্তি করে আসব। মেয়েটার নিজের বলতে কেউই নেই। তাই আমাকে দিদি বলে, আর খুবই মান্য করে। সেই জন্যেই ভেবেছি এই অবস্থায়, জোর করে হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হ'লে একমাত্র আমিই পারব।" শচীন লাহিড়ী চায়ের শেষে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে, "কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম সুরেন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর আপনি কাজিন্‌। এই ত' সে রটিয়ে বেড়ায় আপনার অফিসে, আপনি তার আত্মীয়া এবং সেই সূত্রেই কাজে এসেছেন তিনি।" কথার শেষে শচীন লাহিড়ী হাসে। অসীমার আর সহ্য হয় না সুরেন চক্রবর্ত্তীর এই স্পর্দ্ধাটা! সে স্থান কাল পাত্র সব যেন ভুলে শচীন লাহিড়ীকেই ধমকে

ওঠে, "এতদিন একথা আমায় কেন বলেননি? ওকে তা'হলে স্টাফ থেকে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু দেড় বছর চাকরি হয়ে গেছে!"
অসীমা হাত-পা ভেঙ্গে মাঝ-পথে যেন ভুমড়ে পড়ল। এমনি অসহায় এক অবস্থা যখন, তখন হাসতে হাসতেই শচীন লাহিড়ী বললে, "লোকটা ভীষণ চালাক! অর্থাৎ যাকে এককথায় বলা যেতে পারে শ্লাই এণ্ড নেভ্! অফিসে কাজ ত' ছাই করে, কেবল ক্লার্কগুলোকে খাটায়! আর আপনার কাছে চিঠি লিখে ওদের চাকরি খাবে বলে ভয় দেখায়। শুনেছি, ক্যাসিয়ারের সঙ্গে সেদিন পেমেণ্ট নিয়ে প্রায় মারামারি হবার যোগাড়। এও শুনেছি, সুরেন চক্রবর্ত্তী প্রত্যেক কুলীর কাছ থেকে দু'পয়সা করে কেটে নেয়। এদিকে আবার জানেন ত' আমাদের জগৎ মিত্তির কেমন লোক? এই কথা শুনে, বুড়ো একেবারে আমার কাছে এসে হাজির! তখন অনেক করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওঁকে আবার পাঠাই। এবারে আমি নিজে গিয়ে পেমেণ্ট দেখি। তবে মনে হ'ল সুরেন চক্রবর্ত্তী যেন আমার ওপর বেশ একটু চটা! কারণটা ঠিক বুঝলাম না!"
বিরক্ত হয়ে অসীমা বললে, "আর বুঝতে হবে না! এতদিন যদি জানাতেন এই সব কথা, তবে লোকটাকে রাখতাম না ঠিকই।"
"বেশ ত' রাণীগঞ্জে আমার কারখানায় পাঠিয়ে দিন, জব্দ থাকবে সেখানে।"
শচীন লাহিড়ীর কথায়-সায় দিয়ে অসীমা বললে, "ঠিক কথা! কমলার এই ভিড়টা মিটে গেলেই লোকটাকে আপনি বদলি করে দিন।" অসীমার স্বরে তিক্ত একটা ঝাঁজ্ শুনে হাস্যস্মিত মুখে শচীন লাহিড়ী বলে, "বেচারীর কপালটা দেখি এবারে সত্যি সত্যিই ভাঙছে! এতদিন সুরেন চক্রবর্ত্তী আপনার রেকমেণ্ডেশানেই এত বড় ষ্টাফ্‌টার ওপর কর্ত্তৃত্ব চালিয়ে এসেছিল। এখন হঠাৎ ভরাডুবি হলে শেষ অবধি

আমাকে না বিপদে ফেলে আপনাকে পরামর্শ দিয়েছি বলে। কেননা এই যুক্তিটিই সে দেখায় যে, শচীনবাবুই অসীমা দেবীকে চালায়, নইলে অনেক কিছুই আদায় করা যেত !”

অসীমা ঠোঁটটা কামড়ে অনেকগুলো কথা যেন জোর করে গিলে রেখে বললে, “আপনার রামায়ণ কাহিনী এখন থামান। সত্যি আমার বিরক্ত লাগছে এসব কথাবার্ত্তা শুনতে ! কোথা থেকে যে এক রাহু কাঁধে চেপে বসল বুঝতে পাচ্ছিনা, শেষ পর্য্যন্ত কি হবে কে জানে !”

অসীমার কথার মধ্যে একটা ভয়ব্যাকুল অস্বস্তি ফুটে উঠল দেখে শচীন লাহিড়ী সিগারেটটা এ্যাসট্রের উপর টিপে আগুনটা নিবিয়ে দিতে দিতে উপেক্ষার সুরে বললে, “শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হবেনা ! এতবড় একটা কারবার সুরেন চক্রবর্ত্তীর মত সামান্য একটা লোক চুরি করে কত সরাতে পারবে ! বেশ ত' না হয় ক'জোড়া কাপড় সরাবে, সরাক গে। আপনি এখন কবে যাবেন মিল দেখতে সেটা ঠিক করুন, আমি সেই মত ব্যবস্থা করব।” অসীমা এতক্ষণ বাদে আবার সহজ অবস্থায় ফিরে এল যেন। বললে, “আজ হ'ল সোমবার, আসছে সোমবার যদি যাই কোন অসুবিধে হবেনা ত' ?”

শচীন লাহিড়ী মাথা হেলিয়ে বললে, “বেশ তাই হবে।”

এমন সময় বাড়ীর চাকর কেষ্ট এলো খাবারের বাসনগুলো তুলে নিতে। কেষ্টর কৃশ চেহারাটার দিকে চেয়ে অসীমা সহাস্যে বললে, “আপনি যে পরিমাণ যুদ্ধের সাজসজ্জা করছেন, তা'তে কেষ্টর নামটা কিন্তু বাদ দেওয়া উচিত নয়। কেননা সে যে পরিমাণ ছোলা চিবুচ্ছে আর রামসিং-এর ঘরে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে ডন-বৈঠক দিচ্ছে, লাঠি ঘোরাচ্ছে, তাতে পালোয়ান হিসেবে তাকেই আগে এগিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে হয়।”

কেষ্ট অসীমার পরিহাসটা বুঝলেও যেন গায় মাখেনা এমনি ভাবেই বললে, “বুঝলেন শচীনদা, দিদিমণি আমাকে এসব নিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা

করেন। কিন্তু আপনিই একবার বলুন দেখি, যা দিনকাল পড়েছে তাতে এসব একটু-আধটু শেখা উচিত কিনা! শেষে মাথায় একটা ডাণ্ডা পড়লে সামলাতে ত' আর পারা যাবে না!" কথার সঙ্গে সঙ্গে বালক কেষ্ট খাবারের খালি বাসনগুলো তুলে নিয়ে যায় বেশ গম্ভীরভাবে।

শচীন লাহিড়ী হাসিটা একটু চেপে কেষ্টকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে, "তা তুই ঠিক কথাই বলেছিস্ কেষ্ট! সত্যি মাথাটা সামলাতে দু'চারটে ডন-বৈঠক আর লাঠির প্যাঁচ আমাকেও কাল থেকে সুরু করতে হবে দেখছি।" অসীমা খিলখিল করে হেসে বললে, "আচ্ছা একটা বোকা ছেলে! সন্ধ্যে হ'ল কি মাথায় এক পাগ্ড়ী বাঁধল, যদি লাঠি পড়ে! তবে এটা ঠিকই আমি বেরুলে ওকে বাড়ী রাখা দায় হবে। নিয়ে যেতেই হবে, ছেলেমানুষ ত'? অনেকদিন বাবা মাকে দেখেনি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমার স্বরটা কেষ্টর প্রতি সহানুভূতিতে ভরে ওঠে যেন।

অসীমার এই স্নেহময়ী রূপটা শচীন লাহিড়ীর চোখে চমৎকার লাগে। যেন স্নেহমমতা দিয়ে গড়া এক নারীমূর্ত্তি সকলের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করার জন্য আকুল চোখে চেয়ে আছে! কে বলবে যে, এই নারীটিই একদিন পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সকলের উচ্চসম্মান লাভ করে আজ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্বনামধন্যা হয়েছে। যে পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার দরুণ আজকাল ঘরে ঘরেই চাপা অসন্তোষ জেগে উঠেছে, মেয়েরা স্বাধীনভাবে চাকরিতে নেমেছে, ট্রাম-বাসে লাফিয়ে উঠছে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পা ফেলে, পার্টি থেকে রাত করে বাড়ী ফিরছে একা মোটর চালিয়ে, অসীমা যে তাদেরই একজন এই কথাটা ভাবতে শচীন লাহিড়ীর যেন অনেকটা সময় লাগে। সত্যিই সে এতদিন পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিল। শিক্ষাকে চিরদিনই সে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এসেছে, কিন্তু যে-শিক্ষা নারীর সহজাত কোমল মনটাকে নষ্ট করে ফেলে সেই

শিক্ষার ভয়েই এতদিন শিক্ষিতা মেয়েদের সে রীতিমত এড়িয়েই চলেছে। এখন অসীমার সংস্পর্শে এসে ধারণাটা তার বদলে গেছে সম্পূর্ণভাবে। শিক্ষা কখনো মানুষকে কুপথে ঠেলে দেয় না। এটার জন্য দায়ী হচ্ছে আজকালকার অন্ধ অভিভাবকের দল। মেয়েকে শিক্ষিতা করতে হলে যদি ভারতীয় ঐতিহ্য, নারীর সেই মমতাময়ী মূর্ত্তিকে মুছে ফেলে পরের দেশের কুপ্রথাকে আঁকড়ে ধ'রে শিক্ষার নামে যথেচ্ছাচার আরম্ভ হয়, সেটার জন্য নিজেদেরই সে দায়ী করে। কিন্তু স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জি তাঁর মেয়েকে সম্পূর্ণভাবেই সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিতা করে তুলেছেন। শচীন লাহিড়ীর চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিয়ে অসীমা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনি ততক্ষণে অফিসের চিঠিগুলো দেখুন, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি।" বলে সে কিছু আগে ডাকে-আসা-কাগজ-পত্রগুলো আনতে ব্যস্ত লঘু-পায়ে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

তিন

মিল পরিদর্শনটা অসীমার একটা খেয়াল বলেই মনে হয়। আজ হরিনাথ মিলের এবং মিলের কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অর্থাৎ মিলের মধ্যে তাদের দোকান, বাজার, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি অনেক কিছুই অসীমার আগ্রহে স্যার হরিনাথ স্থাপন করেছেন। কিন্তু তবু যে-সমাজে অসীমা আশৈশব প্রতিপালিত, যাদেয় সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্ত তাকে ওঠা-বসা করতে হয়, সেই শিক্ষিত, পরিমার্জ্জিত ওজন-করা জীবনযাত্রা যেন অসীমার মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনা বলেই, সে ছুটে আসে অসহায় এই শ্রমজীবী সরল লোকগুলোর কাছে। যন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে যদিও এই মানুষগুলো প্রতি মুহূর্ত্ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, যদিও এদের ভবিষ্যতের কোন আশা নেই, তবু এদের মধ্যে অসীমা যে আন্তরিকতা পায় সেটা তাদের সমাজে দুর্লভ! অর্থের প্রাচুর্য্য দেখে অসীমার কাছে এরা স্তুতি গাইতে আসেনা, কিংবা প্রতিযোগী হিসাবে এগিয়ে দাঁড়ায় না—আসে, নিজেদের সুখদুঃখের কথা পরমাত্মীয়ের মত একটির পর একটি গুছিয়ে বলতে। যেন অভিযোগের সীমানা ছাড়িয়ে এই অসহায় লোকগুলো অসীমার কাছে সান্ত্বনা খোঁজে। ওদের ঐ অন্ধকার ঘুপচী ঘরের দোরে বসে অসীমা দু'চোখ ভ'রে দেখে বেঁচে থাকার জন্য কি প্রাণান্তকর চেষ্টাই না এরা করছে! কিন্তু সত্যিকারের বাঁচা কি এদের জীবনে আছে? তবু ঐ লোকগুলো দিনের পর দিন খেটে যাচ্ছে মালিকের হুমকী খেয়ে। অথচ লাভের অংশ কিছুই পাবেনা এই লোকগুলো! কিন্তু অসীমা এতবড় অন্যায় কখনও সইতে পারেনা বলেই, তাদের মিলের বহু পরিবর্ত্তন সে করে ফেলেছে। এর জন্য স্যার হরিনাথ তাঁর মেয়েকে কখনও বাধা দেননি, বরং উৎসাহই দিয়েছেন, তবু

মাঝে মাঝে মেয়ের খেয়াল মেটাতে টাকার অঙ্কটা যখন কষতেন তখন হেসে বলতেন, "ভাগ্যিস আমার একটাই মেয়ে, নইলে বুড়োকে গাছতলা সার করতে হ'ত!" অসীমা রেগে বলত, "সেই ভাল হ'ত, এত টাকা দিয়ে কি হবে! ওরা যদি না বাঁচে তবে তোমার মিল চালাবে কে?"

আজও তাদের জন্য সে অনেক কিছু জিনিস বোঝাই করে মিল পরিদর্শনের জন্য বেরুচ্ছে। ছোট ছোট শিশুদের জন্য বিস্কুট, লজেন্স, পুতুল, খেলনা,—যারা স্কুলে পড়ে তাদের জন্য শ্লেট, বই এইসব নানারকম খুচরো বহু জিনিসপত্রে কাঠের বড় বাক্সটা বোঝাই করে নিলে। তারপর রামুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে শচীন লাহিড়ীর অপেক্ষমান মোটরখানায় গিয়ে উঠে বসল।

শচীন লাহিড়ীর মূল্যবান মোটরখানা হাল্‌কা গতিতে পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে চন্দননগরের দিকে। অসীমা একটু সময় নিঃশব্দে বসে গাড়ীখানার এই পাখীর মত উড়ে-চলা ভঙ্গী, আর পথের অস্বাভাবিক নির্জ্জনতা মনে মনে অনুভব করে। দুরন্ত বাতাসে অসীমার চুলগুলো উড়ছে, শাড়ীর বাঁধন কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে নেমে এসে পড়ছে বাঁ হাতের উপর। কানের দুল দুটোর উপর মাঝে মাঝে আলো এসে চিক্‌চিক্ করে উঠ্‌ছে। একসময় হঠাৎ সে বললে, "এখানে আমাকে ড্রাইভ করতে দিলে এর চেয়ে বেশী স্পীডে চালাতে পারতাম। মোটে রাস্ নেই!"

শচীন লাহিড়ী মুহূর্ত্তের জন্য ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের সিটে বসে-থাকা অসীমার দিকে তাকায়। তারপর দক্ষ দু'খানি হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরুতে ঘুরুতে সামনের ঐ অফুরন্ত জনশূন্য একটানা পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে, "লাইসেন্সটা নতুন করান হয়েছে বুঝি!"

খিলখিল করে হেসে অসীমা জবাব দেয়, "লাইসেন্স নেই বলেই ত' স্পীডে চালাতে পারি। সত্যি, বেশ লাগে এসব রাস্তায় ড্রাইভ করতে।"

রাসু ভ্রু কুঁচকে ধমকে উঠল, "এখন তোমাকে মোটর চালাতে হবে না! মানে মানে গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই হয়।"

"কেন গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে কি গুণ্ডারা তোমার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে?"

অসীমার দুষ্টুমিভরা পরিহাস শুনে রাসু কিছু বলার আগেই, মিলের সীমানায় এসে পড়ল সবাই। লোহার ফটকের উপর দু'পাশ থেকে দুটি নিস্পন্দ পরী-শিশু আকাশের দিকে মুখ তুলে তূর্য্যনিনাদ করছে। যেন তারা যন্ত্রযুগের জয়ধ্বনি তুলছে! বহুদূর থেকে তাদের বিরাট মূর্ত্তিটি চোখে পড়ে। শচীন লাহিড়ী গাড়ীর গতি ক্রমশঃ মন্থর করতে করতে এগিয়ে চলল লাল সুরকী-ঢালা পথ ধরে মিলের দিকে।

হরিনাথ মিলের অফিসের কাছে গাড়ী থামল। শচীন লাহিড়ী গাড়ী থেকে নেমে অসীমাকে দরজা খুলে দেবার আগেই অসীমা নিজেই ছাঁটা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আঁচলটা ডান কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে নিয়ে হাসি মুখে বললে, "এখানকার দৃশ্যটি ভারী মিষ্টি লাগছে।"

শচীন লাহিড়ী সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বললে, "হ্যাঁ, সবুজের ছোঁয়াটা পাওয়া যায় কি না।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে লোহার ফটকের কাছে আরও দু'খানা মোটর এগিয়ে আসতে দেখে অসীমার দিকে ফিরে বললে, "এতক্ষণে ওরা এসে পৌঁছুল! যাক্ আমরা চলি জিনিসপত্তরগুলো ওরা ততক্ষণ সরাক।" কিন্তু অসীমাকে আর এগুতে হয় না। দলে দলে লোক মুহূর্ত্তে তাদের কর্ত্রীকে ঘিরে ফেলল আনন্দের কলরব তুলে।

অসীমা যখন এদের প্রীতি-সম্ভাষণের পর অফিস-রুমে এসে ঢুকল তখন বেলা প্রায় এগারটা বেজে গেছে। অফিসের কাজের যাতে ক্ষতি না হয় সেইজন্য, সে তার শ্রমিকদের বিশ্রামাগারে এসে দাঁড়াল, মিল সংক্রান্ত কিছু কথাবার্ত্তা বলতে। শচীন লাহিড়ী ইতোমধ্যে চলে গেছে মাইল দেড়েক দূরে যে রাইস মিলটা হঠাৎ স্ট্রাইক

করে বসেছে, তারই খোঁজ খবর নিতে। অসীমাকে বসার জন্য মিলের হেড্ মিস্ত্রী তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এনে দিল। তারপর বিনত হাসি হেসে বললে, "দিদিমণি অনেকদিন আসেননি, শরীর ভাল ছিল ত' ?"

অসীমা এই স্নেহশীল বৃদ্ধ মিস্ত্রীকে ছোটবেলা থেকেই দেখছে। একটু হেসে বললে, "হ্যাঁ ভালই ছিলাম, কিন্তু তোমরা যদি প্রায়ই স্ট্রাইক সুরু করে দাও, তবে আমাকে মিল উঠিয়ে দিতে হবে দেখছি।"

একে একে ঘরের ভিতর অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা সকলেই একে অপরের দিকে তাকায়। সত্যিই কাজটা ভাল হয়নি, এমনি যেন ভাবটা! শেষে সকলের হয়ে নিবারণ বাগ্দী বলে ফেললে, "তা দিদিমণি প্রাণের ভয়টা ত' সকলেরই আছে, কি করা! তবে আপনি স্টারাইক যা বলছেন আমরা তা করিনি ছুটি চেয়েছি মাত্র! কিন্তু তাতে আমাদের ওপর লাঠি চালাবার হুকুম পাঠিয়েছেন হেড্ অফিস থেকে। মায়ের কাছে নালিশ-করা অভিমানী ছেলের মত গলাটা ভারী হয়ে আসে নিবারণের। অসীমা এই বৃদ্ধের বলিষ্ঠ বাহু পেশীর দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে সস্নেহ সুরে বলে, তোমাদের মত লোক থাকতে আমার মিল বন্ধ থাকবে, এ কেমন কথা বল ত' ? বেশ ত' এক বেলা করে কাজ করলেই পারতে! দিনে দুপুরে ভয় কিসের ? আর এখানে হিন্দুর সংখ্যাই ত' বেশী! যে কয়টি মুসলমান শ্রমিক, তারা রীতিমত নজরের ভিতর রয়েছে। তবে এসব হাঙ্গামা করে কি লাভ হ'ল বল ? কাজ যখন তোমাদের করতেই হবে তখন সসম্মানে যাতে কাজ করে দুটো পয়সা তোমরা পাও সেটাই কি উচিত নয় ?"

অসীমার যুক্তির কাছে সত্যিই হেরে যায় হাজার হাজার শ্রমিক। সত্যিই সম্মানটা তাদের রইল কোথায় ? মাইনে কাটার ভয়, লাঠির

ভয়, তাদের আবার মিলের মধ্যে বন্দী করেছে। তবু শেষ চেষ্টা করে নিবারণ, বলে, "উচিত হয়নি ঠিকই কিন্তু প্রাণ ভয়টা কি করে যে কাটাই বলুন দিদিমণি?—তিন নম্বর কুলী লাইনের দিকেই যেতে ভয় হচ্ছে।"

অসীমার দু'চোখ ফেটে জল আসতে চায় নিবারণের মত একজন শক্তিমান পুরুষের মুখে এই ভাবে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে হাহুতাস করতে শুনে। সত্যি এজাতের আর বাঁচার ক্ষমতা নেই। তবু যেন নিজের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ওদের বুকের ভিতরে ঢেলে দেবার জন্যই একটা আগ্রহাকুল স্বরে অসীমা জোরে বলে ফেলে, "আমি ভাবতেই পারিনি তোমরা আমাকে তোমাদের ভয়ের কথা বলবে!"

অসীমার অক্ষেপটা মুহূর্ত্তে যেন নিবারণের সুপ্ত শক্তিকে খোঁচা-খাওয়া সিংহের মত ক্রুদ্ধ করে তুললে। সে মাথাটা সোজা করে বললে, "ভয় আমরা পাই না, তবে বাবুরাই আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন।"

কটনমিলের সর্দ্দার নিবারণ বাগ্দীর কথাটায় যেন জোর দেবার জন্য দল থেকে ছিটকে এসে নিবারণের পাশে দাঁড়িয়ে বললে রতনা, "ভয় আমরা এখন আর করি না! রাত দিন আমি আমার দল নিয়ে মেসিন চালাব, দেখি কেমন না কাজ হয়!" কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ এক সাহসের সমুদ্রে কেউ ঢেউ তুলছে এমনিভাবে রতনা ঐ কাল মিশ্‌মিশে চ্যাটাল তেলা শরীরটা টান করে অসীমার দৃষ্টি-পথে আর একটু এগিয়ে দাঁড়ায় উত্তেজিত ভঙ্গীতে।

অসীমা একটু সময় রতনার সাহস-বিস্তৃত চওড়া কাঁধ আর লোহার মত দৃঢ় লম্বা দেহটার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি বুলিয়ে মুখে মিষ্টি হাসি হেসে বলে "তোমাদের কাছে এইটুকু শুনব বলেই অতদূর থেকে আমি ছুটে এসেছি রতন।" হঠাৎ আত্মসম্বরণ করে গম্ভীর স্বরে অসীমা বলে, "আমরা এখানে আর একটা পৃথিবী গড়ে তুলেছি। এখানে কোন রাগ

হিংসা বা ভয় কিছুই নেই। এখানে আছে সকলে এক হয়ে সুখে না হোক, অন্ততঃ স্বস্তিতে জীবন কাটান। সুতরাং মিলে তোমরা সবাই যোগ দাও কালীপূজো আসছে।"

এতক্ষণ পাকান লাঠি হাতে যে লোকটি অসীমার কাছে বহু অভিযোগ নিয়ে রাইস মিল থেকে এসেছিল, সেই বৃদ্ধ হঠাৎ ভিড় ঠেলে অসীমার একেবারে পায়ের কাছে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে বললে, "দিদিমণি, আমরা আপনার কাছে আমাদের নালিশ জানাতে এসেছিলাম কিন্তু"—

"কিন্তুটা কি লক্ষ্মণ! স্ট্রাইক করা আর হ'ল না এই ত'?" হাসতে হাসতে লক্ষ্মণের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে অসীমা বলল।

তোমাদের দোষ কিছু নয়, মাইনে এবার থেকে কটন্ মিলের মতই ঠিক ঠিক পাবে। জানই ত' নতুন কেনা হয়েছে হিসেব-পত্তর না দেখে কি করে সব করি? তবে প্রসাদদাসের হাত থেকে তোমরা আপাততঃ আমার হাতেই এলে, এখন দেখা যাক্ কি সুবিধে করা যেতে পারে।

"লক্ষ্মণ আর কিছুই চায় না দিদিমণি!" কৃতজ্ঞতায় লক্ষ্মণের চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে। তারপর গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলে, "তা'হলে চললাম!" অসীমা একটু দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "যাও, ভবিষ্যতে এসব করলে শাস্তি পাবে। জানবে আমি যে শাস্তি দিই, সে শাস্তি খুব কঠিন।" শেষের দিকের কথাটা অসীমা এমনভাবে বললে যাতে, প্রত্যেকটি লোক স্তম্ভিত হয়ে যায় অসীমার মুখভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল দেখে। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র! আবার একটা হর্ষধ্বনি ওঠে, আবার একটা আনন্দের কলরব ওঠে! সকলেই খুশি আসন্ন কালীপুজোর কথাটা ভেবে! মাইনে একমাসের, কাপড়, খাওয়া, কত আনন্দ!

অসীমা যখন খোয়া বিছান পথের উপর দিয়ে হেঁটে, অফিসে যারা কাজ করে, সেই সব কেরানী বাবুদের প্রত্যেকটি বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, সেইখানেও সেই আনন্দ সেই কলরব সুরু হয়ে গেল। যেন ওরা সবাই অসীমার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে এমনি একটা আগ্রহ নিয়ে, সবাই ঘিরে ধরে মিলের এই মালিক নামে তাদের পরমাত্মীয়াকে। সব শেষে অসীমা সুরেন চক্রবর্ত্তীর দরজায় এসে দাঁড়াল। এখানে এলেই সে আটকে পড়ে, সুতরাং সব শেষে কমলার সঙ্গে দেখা করে অসীমা আবার মোটরে গিয়ে উঠবে।

দরজার কড়াটা নাড়তেই কমলা এক মুখ হাসি নিয়ে ছুটে এল। বললে, "যাক্, দিদি তবে খোঁজ নিতে এলো! আমি ত' ভাবলাম দিদি আর আস্‌বেই না গরীব বোনের কাছে!"

অসীমা হেসে বললে, "অভিযোগ রেখে বলো কেমন আছ?" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কমলার অসুস্থ দেহের উপর দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কমলা চোখ মুখ লাল করে বললে, "আগে ঘরে বসবে চলো, তারপর সব কথা।" ব'লে সে অসীমার হাত ধরে একেবারে ঘরে নিয়ে গিয়ে আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা চেয়ারখানায় বসিয়ে, নিজে খাটের উপর জুত হয়ে বসে। অসীমা ঘরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলতে বুলতে বললে, "তোমার হাসপাতাল যেতে আপত্তিটা কেন খুলে বলো দিকি, তারপর গল্প করা যাবে। কেননা এটাই হ'ল প্রধান কাজ, যার জন্যে আমাকে এই সময় ছুটে আসতে বাধ্য করালে।" অসীমা কমলার মুখের দিকে বেশ বিচক্ষণ চিকিৎসকের মত চেয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করে তারপর বললে, "শরীরটা একেবারে গুলে খেয়েছ দেখছি!"

কমলা কথার জবাব দেয় না, হাসে। পরে হালকা একটা অজুহাত দিয়ে বলে: "এখন ত' তিনমাস দেরি আছে, হাসপাতালে গিয়ে

বসে থেকে কি হবে!—যাক সে কথা, আচ্ছা দিদি, ধ্রুবর বাবাকে যে দাঙ্গায় মুসলমানেরা কেটে ফেললে সেকি ওঁর স্ত্রীর সামনেই?"

অসীমা মাথা দুলিয়ে বললে, "হ্যাঁ, একেবারে সামনেই কেটে ফেলেছিল গুণ্ডাগুলো!"

কমলা শিউরে উঠে বললে, "উঃ, কি ভীষণ অবস্থা! কিন্তু ঐ অবস্থায় বৌটা ছেলে নিয়ে পালাল কি করে?—মানে, স্বামীকে হারিয়ে ওর বেঁচে কি লাভ হ'ল বলো ত' দিদি? আমি হলে কিন্তু পারতাম না! এই যে উনি—একটু যদি ফিরতে দেরি করেন, আমি যেন ভাবনা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ি! আরে বাপু, যাকে নিয়ে পৃথিবীতে বাঁচার সুখ, সেই স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে বাঁচার কি সার্থকতা আছে নাকি?"

কমলার এই দীর্ঘ ভাষণে বোধ হয় অসীমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। সে হঠাৎ একটু যেন রুক্ষ স্বরেই কমলার কথার প্রতিবাদ করে ওঠে: "এইসব মনোবিকারে ভুগছ বলেই শরীরটা পর্য্যন্ত নষ্ট করতে বসেছ। জানবে, বাঁচার সার্থকতা মেয়েদের, শুধু, প্রতি পদে স্বামী দেবতাটির মনোরঞ্জন করা—আঁতুড় ঘরের শোভা দেখা নয়। বাজে কথা রেখে; কবে হাসপাতালে যাবে পরিষ্কার বলো?"

অসীমার রুক্ষ কথায় কমলার চোখে জল আসে। মাথাটা নিচু করে শাঁখার পাশে বাটনা বাটার জন্য যে হলুদটুকু লেগেছিল, সেটা নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে সে নিচু গলায় বললে, "সংসার ফেলে যাই কি করে! শরীরটা এবার সত্যিই ভাল নেই।"

অসীমার মায়া হয় এই অসহায় মেয়েটির অবস্থা দেখে। চতুর্থ সন্তানের দাবী মেটাতে এবারে কমলা তার স্বাস্থ্যটা পর্য্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছে। এই হ'ল বাঙ্গালী, গরীব, মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের বধূর শেষ অবস্থা! আজ কমলা যে সংসারের জন্য হাসপাতালে যেতে

পারছেনা, একদিন তাকে বাদ দিয়েই এই সংসার চালাবে আর একটি মেয়ে হয়ত'। একটা শ্বাস হঠাৎ বুকের ভিতর যেন পাক খেয়ে উঠতে চাইল! কিন্তু নিজেকে অসীমা সামলে নিয়ে শান্তভাবে বললে, "আমার এখানের নিয়মই হ'ল যাদের এই সময় শরীর খারাপ হয়, তাদের হাসপাতালে যেতেই হবে। তবে সংসারের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। মেস্ আছে, খাওয়ার কোন কষ্টই কারুর হয় না বলেই ত' জানি।"

কমলা অপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, "কষ্ট কেন হবে বরং ভাল ভালই খাওয়া হয় শুনেছি, তবে—"

কমলার কথার উপরেই অসীমা বলে ওঠে, "ওসব তবে-টবে আমার কাছে চলবে না। তুমি আসছে হপ্তায় হাসপাতালে বেড্ পাচ্ছ! আমি এই কথাই তোমাকে জানাতে এলাম। নীরজা দি কে সব বলে যাচ্ছি, নিজে এসে তিনি তোমাকে নিয়ে যাবেন।"

সভয়ে কমলা বললে, "তবেই হয়েছে—ঐ মেয়ে ডাক্তারটিকে আমার বড় ভয় করে!"

অসীমা বললে, "আমিও ত' মেয়ে ডাক্তার, ভয় করা ত' উচিত!" কমলা হেসে অসীমার কোলের উপর মুখটা লুকিয়ে, স্নেহের আব্দারে যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে এমনি করে বললে, "বারে, তুমি যে আমার দিদি!" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, চোখ মুখ আরক্ত করে ছুটতে ছুটতে, ঘরে ঢুকলো খোকন। কমলার বড় আদরের ফুটফুটে, ছেলে খোকন! চোখে মুখে মায়ের স্বপ্ন, মায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন প্রাণের অফুরন্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে ছিট্‌কে উঠছে! আজকের দুরন্ত শিশু, কালকে সে হবে সমাজের মধ্যে ধনে, মানে, যশে উজ্জ্বল। কমলার এই স্বপ্ন নিয়েই তিল তিল করে খোকনের জীবন স্পন্দন!

খোকন তার ঝাঁকড়া চুল-ভর্ত্তি মাথাটা দুলিয়ে, ডাগর চোখ দুটো বড় বড় করে অসীমার কোলের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে। হেসে অসীমা খোকনবাবুকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "লজেন্স খেয়েছ? এই ভাখো তোমার জন্যে আর একটা কি এনেছি।" ব'লে সে তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা একটি রঙ্গীন ফার্ষ্ট-বুক বার করে খোকনের হাতে দিলো। বইখানা খুলতেই রং-বেরঙয়ের জন্তু নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দেখে উল্লাসে খোকন চেঁচিয়ে বলে উঠল: "মাসীমা, এটা কি বেরাল? আর এটা কুকুর নয়? ঠিক আমার ভেলুর মত দেখতে কিন্তু!" অসীমা হেসে ফেলে বললে, "পণ্ডিত ছেলে! ভেলুর মত হলেই বুঝি ওটা কুকুর হ'ল, নিচে কি লেখা আছে আগে পড়, তবে ঠিক বুঝতে পারবে। স্কুলে যখন পড়ছ, ভাল করে ভাখো, তবেই বুঝতে পারবে ওটা কুকুর কি অন্য কিছু।"

স্কুলের নামে খোকন যেন হঠাৎ, দপ্‌ করে নিভে যাওয়া প্রদীপের মত ম্লান হয়ে যায়। তারপর বিষণ্ণ স্বরে বলে: "কি করে আমি আর স্কুলে যাব? রোজ রোজ মার জ্বর আসছে, তাই খুকুকে যে আমায় রাখতে হয়।"

এই কথার উপর অসীমা কি যে বলবে কিছুই যেন ভেবে পায় না। এমনি ভাবে, হাঁ করে চেয়ে থাকে কমলার ঐ শুভ্র সুন্দর কপালের উপর টক্‌টকে লাল সিঁদুরের ফোঁটার দিকে। যেন জীবনের আলো নিবে আসছে বলেই লাল ফোঁটাটা রক্তশূন্য শাদাটে মুখের উপর এত বেশী জ্বল জ্বল করছে।

কমলার স্বামীর, কমলার প্রতি এত ঔদাসীন্য এবং অমানুষিক ব্যবহার সম্বন্ধে, হয়ত' বেশ কিছু তিক্ত উক্তি অসীমার মনের ভিতর পাক দিয়ে কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত ঠেলে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু কেন জানি, ঠোঁটটা

কামড়ে নিজেকে পরের জন্য অহেতুক দরদ দেখাতে, কমলাকে আর তিক্ত কথাগুলো শোনাল না, বরং চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে, কাপড়ের পাট-গুলো দ্রুত হাতে ঠিক করে, দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললে, "আজ চললাম, তুমি হাসপাতালে কালই খোকনকে পাঠিয়ে দিও, আমি নার্স চপলার কাছে তোমার ফর্মটা ফিলআপ্ করে রাখতে বলে দিচ্ছি।" অসীমা তাড়াতাড়ি চলে যায় কমলার উঠান পেরিয়ে, একেবারে খোয়া বিছান পথের দিকে।

"আর বেশী দেরি করবেন না, শেষে অন্ধকার হয়ে যাবে"। শচীন লাহিড়ী মোটরের দরজাটা খুলে দেয়।

অসীমা মিলের বিরাট হাসপাতালটার চত্বর ঘুরে, সিঁড়ি নামতে নামতে অপেক্ষমান মোটরের ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে, সবিস্ময়ে বললে, "আবার ঐ বাহাদুর সিংকে কেন ?"

"সে বুদ্ধিই যদি থাকবে তা'হলে আর দেরি করতে না। এখানে এলেই মেয়ের একেবারে জ্ঞানগম্যি চলে যায় ! দিনকালটা খেয়াল আছে, না নেই ? শেষে একটা কিছু ত' হতে পারে !" রাস্থ, অসীমার উপর একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে মোটরে উঠে বসে, কেষ্টকে নিজের কোলের কাছে টেনে। যদিও, এই নোংরা নেপালীটার সঙ্গে এক আসনে বসে যেতে রাস্থর যে খুব ভাল লাগছে না, তার ঐ বসার ভঙ্গিটা দেখেই অসীমা বুঝতে পারে। যেন বাহাদুর সিংকে একটা দেওয়াল দিয়ে আড়াল করার মতই মাঝখানে কাঠের খালি বাক্স, খাবারের বাসকেট, এটা-ওটা যা কিছু সঙ্গে এনেছিল চাপিয়ে, কেষ্টকে বসিয়ে, তারপর নিজে দরজার কাছে নাকে কাপড় চেপে বেশ যেন রাগ হয়েছে, এমনিভাবে গোঁজ হয়ে বসল। অগত্যা অসীমা শচীন লাহিড়ীর পাশেই হাসতে হাসতে উঠে বসে, রাস্থকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে।

শচীন লাহিড়ী মৃদু হেসে বলে : "এর জন্যে দায়ী আপনি।" কথার শেষে,

সে তার হাতের প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসা সিগারেটটায় ক'টা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর মোটরে স্টার্ট দেয় ইঞ্জিন গর্জ্জে।
অসীমা নিজের কাপড়-চোপড়টা ঠিকঠাক করে নিতে নিতে বললে, "কিন্তু, কি করি বলুন! এত দিন পরে এসেছি, সবার সঙ্গে ডেকে যদি কথা না বলি ওরা মনে দুঃখ পাবে যে! মানে, মিলের হোল স্টাফ্ই যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক, তখন তাদের সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত, তাই প্রত্যেকের সঙ্গে ডেকে-হেঁকে খোঁজ খবর করতে করতে বেলা গড়িয়ে এল।" অসীমা মিলের দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, তার সম্বর্দ্ধনার্থে যারা এখনও মিলের স্বামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের ঐ স্মিত মুখগুলো। তারপর, অদূরে ঐ যে মিলের বিরাট ফটক সেই দিকে চেয়ে গাঢ় স্বরে বলতে থাকে: "ওরা আমার কাছে নিঃসঙ্কোচে কথা বলার সুবিধে পেয়েছে বলেই, আজ ওদের অভাব অভিযোগটা আমি বুঝতে পারি। ওরা যদি আমাকে ভাল না বাসত, তবে আমার মিলে স্ট্রাইক প্রায়ই হ'ত। কিন্তু ওরা আমার কাছে কখন জুলুম পায় না বলেই আজ আমার কথা মেনে নিলে, আপনি শত লাঠি চার্জ্জ করলেও পারতেন না মিলে যোগ দেওয়াতে। সত্যি আমাকেই যদি আপন বলে ওরা কাছে না পায়, কার কাছে দুঃখ জানাবে বলুন ত'?"
শচীন লাহিড়ী স্টিয়ারিং ঘুরুতে ঘুরুতে বললে, "সবই স্বীকার করছি, কিন্তু একটা কথা আমি ঠিক বুঝি না!"
অসীমা ডান দিকে ফিরে মোটর চালকের মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, "কোন জিনিসটা বোঝেন না?" হঠাৎ যেন অসীমা থতমত খেয়ে যায় এই বিচক্ষণ স্থির-বুদ্ধি কর্ম্মদক্ষ লোকটির কথা শুনে।
শচীন লাহিড়ী অসীমার মনোভাবটা বোধহয় বোঝে না, কিংবা তা খেয়ালের মধ্যে আনে না তাই, মোটর চালাতে চালাতে বলে, "আপনার

কথা শুনলে, আপনার কাজ দেখলে, সবাই খুব অবাক হয়ে যায়। কেননা সাধারণতঃ এই সব শ্রমিকদের প্রতি মিলের কোন প্রপ্রাইটারই তেমন নজর দেন না। সে ক্ষেত্রে আপনি যেভাবে তাদের উন্নতির চেষ্টা করেন তাতে ক'রে ভবিষ্যতে হয়ত' একদিন, এই দীন দরিদ্র মানুষ-গুলো নিজের দাবীতে নূতন করে আবার বাঁচতে শিখবে। কিন্তু, আমি ভাবি ওদের দুঃখ-কষ্টটা আপনি কি করে বুঝলেন! আমরা না হয় পুরুষ মানুষ, অনেক দেখছি—অনেক ঘুরছি, গরীব বড়লোক তফাৎটা বুঝতে পারা অসম্ভব নয়। অথচ যারা আশৈশব সুখে লালিতা-পালিতা, সেই রকম আদরিণী মেয়ে হয়ে, কি করে মানুষগুলোর দুঃখ বুঝতে পারেন, বলুন ত'? আপনি যেন দল ছাড়া একটি মানুষ। অর্থাৎ ভিন্ন পৃথিবী থেকে গরীবদের জন্যে এগিয়ে এসেছেন।"

শচীন লাহিড়ী কথার শেষে একটু হেসে যখন অসীমার দিকে তাকাল, অসীমা তখন বিহ্বল চোখে সামনের দিকে চেয়ে ছিল।

শচীন লাহিড়ীকে রাসু পিছু থেকে জিজ্ঞাসা করে: "আর কত দূর? রাত হয়ে এল যে!" ভয়ে রাসুর স্বরটা যেন কাঁপা শোনায়।

শচীন লাহিড়ী স্টিয়ারিং ঘুরুতে ঘুরুতে রাস্তার দিকে চেয়ে বললে, "বেশী নেই, হাওড়ায় এসে গেছি।"

অসীমা কোন কথাই বলে না। বুঝি কিছুই কানে যাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না এমনিভাবে অন্ধকার-আবছা পথের দিকে চেয়ে থাকে। যেন চোখের সামনে থেকে সব আলো মুছে দিয়ে ভুলে-যাওয়া একটা কালো ছায়া সামনে দুলছে কেবল।

অসীমা কখন যে টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে পড়েছে নিজেই ভেবে পায় না! কিন্তু শচীন লাহিড়ীর একটা কথা অসীমা যেন ভুলতে পারছে না কোন রকমেই। মনে হয় এতদিন যে সত্যটা অসীমা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিল, আজ তাকেই তার অতি প্রিয় লোকটি যেন

চুপি চুপি স্মরণ করিয়ে দিলে যে, সত্যিই ভিন্ন জগৎ থেকে এখানে সে এসেছে। অসীমা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। যে বীভৎস কঙ্কালটা প্রাণপণে সে দূরে ঠেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে এতদিন, আজ যেন সে দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে, অতীতের অন্ধকারের মহাসমুদ্র থেকে গাত্রোত্থান ক'রে। উর্ব্বশীর মতন নয়. চামুণ্ডার মতন ভয়াবহ সেই কঙ্কাল। স্মৃতির মুণ্ডমালা তার গলায় ঝুলছে যেন। দম বন্ধ হয়ে আসছে অসীমার। ভয়ে আর হতাশায় মুখটা দু'হাতে ঢেকে কিছু যেন আড়াল করার চেষ্টা অসীমা করল। কিন্তু পারল না। ছোট্ট মেয়ের মত ভয়ে আতঙ্কে রাসুকে আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকল

চার

পূর্ব্ববঙ্গের ছোট্ট একটি গ্রাম। নিস্তব্ধ দুপুর রোদের তাতে ক্লান্ত হয়ে ঝিমুচ্ছে। চারিদিক সূর্য্যের প্রখর আলোয় ঘষা কাচের মত ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। যেন রোদের ঝাঁঝাল স্পর্শে সমগ্র পৃথিবীর সবুজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গাছের পাতায় আর বাতাসের দোলায় চৈতালী-ঘূর্ণি পাক খেয়ে খেয়ে বিদায় জানাচ্ছে। বুড়ো বটগাছটার ডালে একটা ঘুঘু ডেকে ডেকে দুপুরের ক্লান্তিকে যেন বাড়িয়ে তুলেছে অব্যক্ত কাতরতা মিশিয়ে। তারই পাশে নারকেল গাছটার উপর একটা কাক উড়তে উড়তে হঠাৎ যেন শ্রান্তভাবে অবসন্ন ভঙ্গিতে, বসে পড়েছে। চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে যেন। ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা আমগাছটা, তার আমের গুটি আর মুকুলে ভরা শাখা-প্রশাখা নেড়ে বাতাসের দোলায় যেন শিউরে শিউরে উঠছে। নতুন মাতৃত্বের সলজ্জ আনন্দ আর গর্ব্বের শিহরণ!

সরসী খিড়কীর দরজাটা খুলে চারা আমগাছটার দিকে চেয়ে থাকে একটু সময়। তারপর এক পাঁজা এঁটো বাসন নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে পুকুরঘাটের দিকে। টলটলে স্বচ্ছ জল দুপুরের ঝাঁঝাল রোদে চোখকে যেন স্নিগ্ধ করে তোলে। সরসী এদিক ওদিক চেয়ে, চারা আমগাছটার একটা গুটি টপ করে তুলে নেয় ঘন পাতার ভিতর থেকে। ভারি ভাল লাগে আমের গন্ধটা! এক হাতে এঁটো বাসনের পাঁজা অপর হাতে আমের গুটি নখ দিয়ে খুঁটে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ধীর পায়ে সরসী স্নানের ঘাটের সিঁড়ি নামতে থাকে। বাঁধান সুন্দর ঘাট, চত্বরের দুই পাশে রামবাবুদের বাড়ীর কবে কোন এক বৃদ্ধা বট-অশ্বথের বিয়ে

দিয়ে চিরদিনের জন্যে গাছ দুটিকে কাছা-কাছির এক নিবিড় বন্ধনে বেঁধে গিয়েছিলেন, যার জন্য ঘাটের চত্বরে প্রাণ-জুড়ান চমৎকার একটি স্নিগ্ধতা এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে। স্বচ্ছ জলে গাছের ছায়া বাতাসের দোলায় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে যেন অতীতের কথা নিয়ে হাস্য-পরিহাস করছে। বহুকালের ভাঙ্গা শিব মন্দিরটা পুকুরের দক্ষিণ কোণে ছায়া ফেলে চুপিচুপি, কালের ঝাপটাখাওয়া তার জীর্ণ রূপটা দেখছিল। সরসী আলতা পরা ফর্সা ফর্সা পা আলত' ভাবে সিঁড়ির ধাপে ফেলে ক্রমশঃ জলের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল। তারপর সিঁড়ির একটা ধাপে বাসনের পাঁজাটা নামিয়ে, জলে কিছু আগে ভিজিয়ে রাখা পোড়া কড়াইখানা তুলে, বাসন মাজার জন্যে জুত হয়ে শেওলা-ধরা সিঁড়ির ওপর বসল। বাসন ক'খানা মাজতে সরসীর বেশী সময় লাগে না। কিন্তু, পোড়া কড়াইটা যেন হয়রান করে তোলে। ঘেমে গেছে কড়াইখানার উপর সজোরে ঝামা ঘষতে ঘষতে। কাজের ক্ষিপ্রতায় মাথার ঘোমটাটা সরসীর ঘাড়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে একরাশ চুলের মস্তবড় খোঁপাটা দেখা যাচ্ছে। কপালের উপর, গালের পাশে, ছোট ছোট চুলগুলো বাতাসে দুলছে। কিন্তু, কোন দিকেই সরসীর খেয়াল নেই, সে কড়াইখানা মাজতেই ব্যস্ত। সুন্দরী বলে সরসীর নাম আছে গাঁয়ের মধ্যে। অর্থাৎ রূপের জন্যেই মাতাপিতৃহীনা, পরাণ পুরুতের ভাগনী, চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে আসতে পেরেছে। যদিও আজ চক্রবর্ত্তীদের সেই অবস্থা আর নেই, তবু, একদিন যে বাংলার নবাবের দরবারে চক্রবর্ত্তীরা যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়ে, আজও সেই সম্মানার্থেই নাজিরবাড়ী ব'লে গাঁয়ের মধ্যে চক্রবর্ত্তীরা খ্যাত। সেই খ্যাতনামা বংশের বধূ হবার মত একমাত্র রূপের পণ দিয়েই সরসী বছর দেড়েক হ'ল মামারবাড়ীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বন্ধন ছেদ করে, চক্রবর্ত্তীদের ছোট ছেলে সুরেন চক্রবর্ত্তীর চাদরে গাঁটছড়া বেঁধে, নাজিরবাড়ীতে ঢুকেছে।

মাথার উপর বিরাট এক ঘোমটা টেনে দিয়ে সরসী জলের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে কান পেতে কি যেন শোনে। হ্যাঁ. স্টীমারটা তবে চলেই গেল! যদি আসত, তবে এতক্ষণ ঠিক এসে যেত। সরসী আনমনা হয়ে আমবাগানের ভিতর দিয়ে সরু পথটার দিকে চেয়ে একটা শ্বাস ফেলে, আবার বাসনে হাত দেয়।

সংসারে চক্রবর্ত্তীরা এখন মাত্র দুটি ভাই। পরপর ক'টি ভাই মারা গেছে বলেই, যোগেন, ছোট ভাই সুরেনকে বোধ হয় নিজের প্রাণ অপেক্ষাও বেশী ভালবাসে। যদিও ভালবাসাটা অর্থের ভিতর দিয়ে কখন সে প্রকাশ করতে পারেনি তবু, ঢাকায় একটা কাপড়ের দোকানে খাতা লিখে আর ছেলে পড়িয়ে যোগেন যা রোজগার করত তাইতেই সে ভাইকে কলেজে পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে ছিল। কিন্তু. অদৃষ্টে বোধ হয় সুরেনের বিদ্যাটা ছিল না! আই. এ. পরীক্ষায় যখন সে আর উত্তীর্ণ হতে পারলে না, তখন স্টীমারঘাটে টিকিট-চেকারের কাজে ঢুকে পড়ল। অবশ্য যোগেনের খুবই আকাঙ্ক্ষা ছিল ভাইকে সে পাশ করিয়ে উকিল করে, কিন্তু সুরেনের ইচ্ছার উপর কখন সে কোন কথা বলেনি তাই, কিছুই আর বললে না।

যোগেনের সংসারে আয় তেমন না থাকলেও, কষ্ট ছিল বলা যায় না। নিজের বাড়ীতে ক্ষেত জমি যা আছে তা'তে নিঃসন্তান যোগেন ছোট ভাইকে নিয়ে বেশ ভালভাবেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ গত বছর যখন যোগেন চক্রবর্ত্তীর মা, সংসারের শোক আর জ্বালা মেটাতে কাশীতেই দেহ রাখলেন, তখন সত্যই বিপন্ন হয়ে পড়ল যোগেন। কেননা অতি কষ্টে ধারকর্জ করে মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে তাঁকে কাশী পাঠিয়েছিল রামবাবুদের পিসীমার সঙ্গে। কিন্তু, ফেরার পথে এই বিপদ! রোগের চিকিৎসা করা, তার যাওয়ার খরচ অবশেষে দাহ .সব কিছু মিটিয়ে সে যখন দেশে ফিরল মাতৃদায় অবস্থায়,

তখন পৈতৃক ভিটেটুকু বাঁধা দিতে যারা পরামর্শ দিলেন, তাদের মধ্যে যাদব সরকারের কাছেই শেষ পর্য্যন্ত যোগেনকে ভিটেটুকু বাঁধা দিয়ে দায় থেকে উদ্ধার পেতে হ'ল !

মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ করে সুরেন একমাস দেশে ছুটি নিয়ে রইল। যোগেন তার কাজে ঢাকা চলে গেছে। দোকানের ভার যোগেন ছাড়া চলে না। সুতরাং দেশে থাকার উপায় নেই। সুবর্ণ চোখের জল ফেলে স্বামীকে বোঝায় এখন থেকে আরও টেনে যাতে চলা যায় তার ব্যবস্থা করতে। সুরেন সায় দেয় মাথা নেড়ে, কিন্তু আর টানে কোথা থেকে ! যোগেনের আয়, দোকানে ত্রিশ আর ক'টি ছেলেকে পড়িয়ে প্রায় পনের। এই থেকে নিজের জন্য দশটা টাকা যা এ'বছর রেখেছে, তাকেও কাটতে হবে। সত্যই ত', খাওয়া যখন দোকানের মালিকই দেন, তবে নিজের হাতে অত টাকা রেখে কি করবে সে ? দুধ, তামাক, দু'চারটে এটা ওটা বাজে জিনিস কিনে কি হবে, তার চেয়ে দেশে পাঠালেই ভাল। আর সুরেন যা মাসে মাসে পাবে সেটা দিয়ে যদু সরকারের ঋণ শোধ হবে। এই মাসের পরেই সুরেনের মাইনে বাড়বে, স্টিমার ঘাটের সে ছোটবাবু হবে। তখন আর কোন কষ্টই তাদের থাকবে না ! মুহূর্ত্তে সব দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট, ভবিষ্যতের আলোয় যেন ঝকঝকে হয়ে যোগেনকে উৎফুল্ল করে তোলে। সে আর কোন কথা বলে না, এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বুঁজে হাত জোড় করে তাদের শিব মন্দিরের দিকে ফিরে একটা প্রণাম জানায়। তারপর পোঁটলা-পুঁটলী হাতে ব্যস্ত হয়ে পারঘাটের নৌকোতে গিয়ে বসে।

যোগেন আবার দেশে ফিরে এল দিন পনের পরেই। দোকানের মালিক তার লোক দিয়ে, প্রবল জ্বরে অঘোর অচৈতন্য যোগেনকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন পনের দিনের এক বেলা কম মাইনে হিসেব

করে। ব্যবসায়ী-হৃদয় এরচেয়ে আর কি করুণা দেখাতে পারে দরিদ্র সৎ ব্রাহ্মণের প্রতি! সুতরাং তাঁর মুহুরী যখন যোগেনকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে গেল, সুরেন একটু সময় বোকার মত চেয়ে রইল। তারপরই নিজের মনটা ঠিক করে নিলে। অন্ততঃ যে দাদার স্নেহ-ছায়ার তলায় এতদিন নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়েছে, তাকে সুস্থ করে তুলতে এখন যা প্রয়োজন সেটার জন্যই যাদব সরকারের কাছে তখনি সে ছুটে গেল।

প্রায় পঁচিশ দিন পরে যোগেন যে দিন অন্নপথ্য করলে সেদিন সুরেন ঋণের জালে জড়িয়ে গিয়ে এত দিনের পৈতৃক ফলের বাগানটা একেবারে সামান্য টাকায় হাত ছাড়া-করার দুঃখটাকে সম্পূর্ণ যেন ভুলে গেল। সে দাদার বিছানার কাছে এগিয়ে সাগ্রহ দৃষ্টিতে দাদার ভাত খাওয়া দেখে। যোগেন সুস্থ হ'ল ঠিকই কিন্তু পায়ের দিকটা তার পড়ে গেল। বংশে পক্ষাঘাত ছিল বলে যোগেন কখন শোনেনি। কিন্তু তার জন্য আকস্মিক এই ব্যাধিটা যে কোথা থেকে এল, যোগেন ভেবে পায় না। প্রৌঢ় বয়সে সামান্য চাকরি-টুকুও গেল! যোগেন জল-ভরা ছলছলে চোখে চেয়ে থাকে কোমর থেকে মরা অংশটার দিকে। কোন সাড় নেই ঐ অঙ্গটার। চিকিৎসা অনেক রকমেই হ'ল, নারায়ণগঞ্জ থেকেও ডাক্তার এনেছে সুরেন, কিন্তু জ্বরের ঘোরে দোকানে কেমন করে যে পড়ে গেল কাপড়ের গাঁটটা সরাতে, সেই দুমড়ে যাওয়া কোমরটা আর উঠে দাঁড়াতে দিলে না যোগেনকে। সুরেন যদিও দাদাকে অনেকরকম সান্ত্বনাই দেয় কিন্তু যোগেনের ঐ এক কথা: "এর চেয়ে মরা অনেক গুণে ভাল ছিলরে!" সুরেন রাগ করে উঠে যায় সুবর্ণর কাছে। যোগেন জল-ভরা হাসি হেসে বলে, "আয়, মহাভারতটা পড়ে শোনা।"

চক্রবর্ত্তী বাড়ীর দিন এই ভাবেই কেটে চলেছে। সুরেন যা মাইনে পায়

তাই দিয়ে কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসার চালাচ্ছে সুবর্ণ। সরসী আয়-ব্যয় কিছুই বোঝে না, সুবর্ণ যা যা বলে, সেইটুকুই সে করে দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটির মত, খুশির ঢেউ দু'পায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে।

সুবর্ণ ভিতরের উঠানটায় কিছু শাকসব্জি লাগিয়েছে। লাউ, কুমড়া, পুঁই ডাঁটা, যে সময়ের যেটা সবগুলোই রুয়ে দিয়েছে এই বর্ষায়। কুমড়ার গাছটা বাঁশের মাচা ছাড়িয়ে গোয়ালের চালে সহস্র সহস্র বাহু বিস্তার করে এগিয়ে গিয়েছে নিজেকে যেন আরও প্রচুর করে ছড়িয়ে দিতে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে কুমড়ার ফুল আর জালি এসে গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ার তলাতেই বেগুন আর লঙ্কা চারাগুলো সজীব হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাতার আড়ালে ফুল আর ফলের শোভায় সরু সরু ডালগুলো সুসজ্জিত করে। লেবুগাছটারও লেবু হবার সময় এসে গেছে। সবুজ পাতার মধ্যে মধ্যে সুগন্ধি শাদা শাদা বহু ফুলই ফুটতে আরম্ভ করেছে। সুবর্ণ বাগানের দিকে চেয়ে মনে মনে একটা আন্দাজ করে কিছুটা স্বস্তি পায়। কিন্তু মঙ্গলা গাইটা নিয়েই হয়েছে মহা মুশকিল! উপযুক্ত আহার তার জোটে না। সুতরাং সে কোন অভিযোগই সুবর্ণর কাছে জানায় না, যা সামনে পায় যেন জোর-জুলুম করেই সে আদায় করে নেয়। এইত' সেদিন লকলকে লাউ গাছটা কেমন বেপরোয়া ভাবে খেয়ে নিজের ঘরে চুপ করে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুরন্ত দুষ্টু মেয়েটির মত, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। কিন্তু এসব অত্যাচার অপরে সইবে কেন? এত মার খায় সুবর্ণর হাতে তবু দুষ্টু গাইটাকে এঁটে উঠতে পারে না! রোজই গরুটা দড়ির খুঁটো সবলে তুলে নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে যায় সুবর্ণ ভেবেই পায় না। প্রতিবেশীদের গালমন্দ খেয়ে দৌড়োদৌড়ি করেও গরুর খোঁজ পাওয়া সুবর্ণর ভাগ্যে হয় না। এর জন্যে সুবর্ণ কত রকম কথাই যে শোনে, তার হিসাব নেই। লোকে বলে সে ইচ্ছা করেই গরুটা রাতে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার যতটা সাধ্য সে যে তাই দিয়েই মঙ্গলাকে

বেঁধে রেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়, সেটা কেউ বোঝে না বলেই রাগে দুঃখে এক এক সময় সুবর্ণ মঙ্গলাকে ভাঙ্গা গোয়ালের মধ্যে আটকে ধরে পাগলের মত এলোপাথাড়ি লাঠি পিটতে থাকে। সরসী এসে যখন দিদির উপর রাগ করে মঙ্গলাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, "যা, দূর হয়ে যা, অশান্তির ঘর!" তখন সুবর্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে গোয়ালে ধপ্ করে বসে পড়ে। অভাবের সংসারে মা যেমন সন্তানকে খেতে দিতে না পারায় ক্ষুধার্ত্ত চোর সন্তানের দিকে চেয়ে থাকে, দুঃখ আর অপমানের জ্বালায় জ্বল্‌জ্বলে চোখে, সুবর্ণ তেমনি ভাবেই চোর মঙ্গলার রোমন্থনটা চেয়ে চেয়ে দেখে। এই দৃশ্য মাসের মধ্যে প্রায়ই অবশ্য ঘটছে! সুতরাং সময় বুঝে হাসতে হাসতে সরসীও পিতলের বালতিটা দৌড়ে রান্নাঘর থেকে এনে সুবর্ণর হাতে এগিয়ে দেয় দুধ দুয়ে নেবার জন্য। সুবর্ণ একটা শ্বাস ফেলে মঙ্গলার কাছে এগিয়ে যায়। দুধ মঙ্গলা কোন দিনই বেশী দেয় না, তবে নিয়মিত ঠিকই দেয়। আগে দু'বেলা মিলিয়ে পাঁচ পোয়া দিত, এখন সেখানে আধসের হয়েছে। সকালে কোন দিন দেয়, কোন দিন দেয় না। তবে, বিকেলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেড় পোয়াটাক দুধ ঠিকই দেয়। ঐটুকুই এখন যোগেনের খাদ্য। বাছুর অনেকদিন আগেই চাষের কাজের জন্য চাষী নিয়ে গেছে, কিন্তু আজও দুষ্টু চোর মঙ্গলার দুধের ভাণ্ডটা যেন শুকিয়ে যায়নি বলেই, সুবর্ণ মঙ্গলাকে লোকের কথায় মার-ধোর করলেও সন্তানের মতই স্নেহ করে, যত্ন করে যতটুকু তার সাধ্যে আছে তাই সাজিয়ে।

সরসী হঠাৎ চম্‌কে ওঠে সুবর্ণর চীৎকারে। সে মাথাটা একটু উঁচু করে দেখে, চোর মঙ্গলাকে তাড়া করে সুবর্ণ বাড়ী ফেরাচ্ছে। আজই সকালে শশীকান্তরা খুব গাল-মন্দ করেছে, তাদের উঠানে ছড়ান ডালগুলো খেয়ে গেছে বলে। হাসি আসে সরসীর মঙ্গলার এই শয়তানীতে! সে বাসনগুলো ক্ষিপ্র হাতে জলে ধুয়ে ধুয়ে সিঁড়ির উপর রাখছে, এমন সময় একটা ঢিল

জলের মধ্যে টুপ্ শব্দে পড়েই মিলিয়ে গেল। সরসী ভাবলে তার পাশের বাড়ীর জ্ঞাতি ভাশুরের দুষ্টু ছেলে মণ্টা বুঝি। হেসে মাথা না তুলেই সরসী বলে, "জলে ইঁট ফেলার মজাটা দেখাচ্ছি! এক্ষুণি দিদির কাছে বলে দেব মণ্টা আবার জলের ধারে এসেছে বলে। জানিস ত' জলে কে থাকে? মস্ত বড় এক জুজুবুড়ী!" বলে সে জুজুবুড়ীর আয়তনটা পাঁচবছরের শিশুকে ভয় দেখাবার জন্য মুখটা উঁচু করে দু'টো হাত দু'দিক দিয়ে প্রসারিত করতেই হঠাৎ একেবারে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। আম বাগানের আবছা আলোর ভিতর দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে যাদব সরকারের একমাত্র ছেলে মানিক। কলকাতার কলেজে পড়ে, আজ প্রায় তিন চার বছর ধরে, কি যে পড়ে একমাত্র সেই জানে! তবে কলকাতার খরচ যোগাতে মাঝে মাঝে কুসীদজীবী যাদব সরকার যখন স্ত্রীর উপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি সুরু করে দিত, তখন কিছুকিছু তার বিষয়ে সংবাদ গ্রামবাসীরা যে শুনতে পেত না, তা নয়; তবে প্রকাশ্যে এত বড় ধনী পাটের ব্যবসায়ী কুসীদ-জীবী যাদব সরকারের একমাত্র সন্তানের বিষয় কিছুই বলতে পারত না। সুতরাং মানিক যে কেমন শ্রেণীর ছেলে সরসী নতুন বৌ হয়ে না বুঝলেও, সুবর্ণ তাকে যথেষ্টই সাবধান করে দিয়েছে, মানিক দেশে আসার পরেই। অবশ্য এর মধ্যে বার তিনেক তাদের বাড়ী মানিক গিয়েছিল বৌদি বৌদি করে। কিন্তু তেমন সুবিধা হয়নি সেখানে, কেননা সুবর্ণ সরসীকে বলতে গেলে একবারমাত্র পান দিতে যাওয়া ছাড়া, রান্নাঘর থেকে বারই হতে দেয় নি। আর সরসীও যেন কেমন ভয় পায় মানিকের চোখের দৃষ্টিটা দেখলে।

সরসী ভীষণ ভয় পেলে মানিককে নিরালা ঘাটে দেখতে পেয়ে। তাড়াতাড়ি সে মাথার কাপড়টা তুলে দিলে মাথায়। তারপর বাসনের গোছাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মানিক একেবারে সামনে এসে পড়ল।

হাসতে হাসতে বললে, "এত ভয় পাবার কারণটা জানতে পারি কি আমি আপনার গ্রাম সম্পর্কে দেওর হই, কিন্তু আপনি আমাকে যে ভাশুরের চেয়েও এড়িয়ে চলতে চান এটা আমি কখনই মানব না এবার সুরেনদা আসুক আপনার নামে কেমন নালিশটা করি দেখবেন।" মানিক তার বড় বড় রুক্ষ একমাথা চুল হাসির ধাক্কায় দুলিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। সরসী আড়ষ্ট হয়ে যায় ঐ হাসির শব্দে। গ্রামের বৌ সে, এ ভাবে দেখলে লোকে কি ভাববে! সে মোড় ঘুরে মাথার কাপড় গায়ের কাপড়টা ঠিক করে, পালাবার চেষ্টা করতেই মানিক পথটা আটকে বললে, "আরে বাপু সুন্দর বলে কি অতটাই অহঙ্কার করতে হয় বৌদি! আমরা না হয় অধম জন, কিন্তু কথা বললে দোষ কি বলুন ত'? এই ত' কলকাতায় এত মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়, তারা ত' আপনার মত এমন শিউরে ওঠেনা আমাকে দেখলে! বরং রীতিমত আমাকে তোয়াজ করে কত কি খাওয়ায়! সত্যি, আপনার মত এমন ভীতু মেয়ে আমি দুনিয়ায় দেখিনি।"

অখ্যাত এক পল্লীগ্রামের মেয়ে সরসী, এপর্যান্ত নারায়ণগঞ্জ বা ঢাকা শহর যে দেখেনি, তার কাছে কলকাতা নামটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য মনকে বিহ্বল করে দেয়। কত দিন সে সুরেনের কাছে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করেছে কলকাতার কথা, কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনা শহর জিনিসটা কেমন হতে পারে বা পারা সম্ভব! এক একবার ইচ্ছা হয় মানিককে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কথা বলতে গিয়েও স্বরটা আর ফোটে না মানিকের চূড়ান্ত বেহায়া দৃষ্টির উপর চোখে পড়ায়। সরসীর ব্যস্ততায় ভিজে কাপড়ের যেখানটায় ডান দিকের বুকের কিছুটা অংশ জলছবির মত উপরে ভেসে উঠেছে, সেই দিকে অপলকে চেয়ে আছে দুশ্চরিত্র মানিক। একটা দীর্ঘ ঝোল টানার মত শব্দ করে জিবটা হঠাৎ যেন চুকিয়ে

নিয়ে মানিক হাসতে হাসতে বললে, "বুঝলেন বৌদি—, একেই বলে 'ডগ্ ইন দি মেন্‌জার।' গরীব পুরুত বামুনের কি অধিকার আছে আপনার মত একটি রূপসী মেয়েকে এমনভাবে আটকে রাখার? সত্যি, মাঝে মাঝে এই ভাগ্যবান লোকটির ওপর আমার ভীষণ হিংসে হয়। ত' ছিরি আমার সুরেন দাদাটির, কিন্তু কি করে যে এমন পদ্মটি পদ্মা'র পাড় থেকে কুড়িয়ে নিলেন ভাবলে মাথা গরম হয়ে ওঠে।" মানিক আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, "আচ্ছা বৌদি, ঐ কালো কুচ্ছিত ঢ্যাঙা ত লোকটাকে দেখলে ঘেন্না করে না আপনার? আমার কিন্তু লোকটাকে দেখলেই ভীষণ রিপালশান আসে। মানে, এমন রিপালসিভ চেহারা সহ্য হয় না, আপনারও ত' হবেই!"...মুহূর্তে সরসী যেন রাগে অন্ধ হয়ে যায়! নিজে সুশ্রী নামে গ্রামে পরিচিত বলে সুরেনকে এসব বলা, স্ত্রী হয়ে কখনই সে সহ্য করবে না। দিশেহারা সরসী অপমানে ক্রোধে যেন জ্বলে ওঠে শুকনো পাতার মত, হঠাৎ একেবারে দপ্ করে। বলে, "কোন স্ত্রীই স্বামীকে ঘেন্না করে না; ঘেন্না করে এই সব লোকগুলোকে—ছিঃ, আপনি!—" সরসীর কথা রাগে, দুঃখে, অপমানে জড়িয়ে যায় একেবারে। সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। বাতাসে উড়ে-যাওয়া আগুন-লাগা শুকনো পাতার মতই দ্রুত অথচ হাল্কা পায়ে বাসনের গোছাটা নিয়ে সিঁড়ি তরতরিয়ে উঠে যায়।

পিছনে দাঁড়িয়ে মানিক হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে, "সাধ্বী স্ত্রী বটে! যাক্ সন্ধ্যেবেলায় যাচ্ছি চা-টা ঠিক থাকে যেন।"

মানিক শিস দিতে দিতে আমবাগানের দিকে এগিয়ে যেতেই যাকে গাছের আড়ালে দেখতে পেলে, সেই মানুষটি প্রথমটা থতমত খেয়ে যায়, তারপর নিজেকে একটু যেন সহজ করে নিয়ে মানিকের পক্ষেই বলে, "হ্যাঁরে, সুরেনের বৌ গেল না?—তা অত রাগের কারণটা কি?"

মানিক এই মহিলাটিকে বেশ ভাল ভাবেই চিনত। তাই ভ্রূটা একটু

কুঁচকে বললে, "হ্যাখো ঠান্‌দি, পরের কথা শোনার মত এখন আর তোমার বয়েস নেই! শেষে কোন দিন অপঘাতে মরবে দেখ্‌ছি।" মানিক মুচকে হেসে কথাটাকে বেশ একটু যেন রসাল করে আম বাগানের স্নিগ্ধ ছায়ায় মাতঙ্গিনী ঠাকুরুণের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। বেচারী বুড়ী হলেও কেউ যদি বয়সের কথা বলে ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। সংসারে সন্তান নেই, বন্ধন নেই, যা সামান্য আছে তাই দিয়েই স্বামী স্ত্রীর জীবন চলে যায়। সুতরাং বয়সের কোন প্রসঙ্গই তাদের বেলা খাটে না এমনি একটা ভাব নিয়েই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঠান্‌দির দুপুরটা কেটে যায়। এ হেন ঠান্‌দিকে বয়সের কথা তুলে অপমান মাতঙ্গিনী ঠাকুরুণ সইতে পারে না। পানের পিচটা ফেলে মাথা দুলিয়ে বিড়্‌বিড় করে বললে, "এত দূর গড়িয়েছে! তাই বলি চাঁদ আমার দেশের মাটিতে গেড়ে বসল কেন! এতদিনে বুঝলাম ব্যাপারটা!" মাতঙ্গিনী ঠাকুরুণ দ্রুত পায়ে চলল সংবাদটা দুপুরের বৈঠকে দেওয়ার আগে স্বামীকে জানাতে।

এদিকে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ করে বাসনগুলো পড়ে যাওয়ায় যোগেন শুয়ে শুয়েই চেঁচায় "ও—বড় বৌ—বড় বৌ হ্যাখো ত'—বৌমা বুঝি পড়ে গেল!" দুপুরের ঘুমটা ভেঙে যোগেন ব্যস্তভাবে চেঁচামেচি করছে শুনে সুবর্ণ ঘুঁটে দিতে দিতে নোংরা হাতেই ছুটে আসে ঘরে। বলে, "আরে অমন চেঁচাচ্ছ কেন বল ত'?" কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাপড়টা বাঁ হাতের দু' আঙুলে তুলে মাথায় দেয়। যোগেন স্ত্রীর রুক্ষমূর্ত্তির দিকে চেয়ে অপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, "অক্ষমের গলাই যে সার হয়! যাক্ বৌমা পড়ে গেছে বৌমাকে একটু দেখ।" হেসে ফেলে সুবর্ণ বললে, "পঙ্গু হলে দিব্যদৃষ্টি হয় দেখছি! তোমার আহ্লাদি বৌমা পড়েনি, মাত্র হোঁচট খেয়েই এই! কত বলি সাবধানে চল্ সেকি শোনে, মাঝ থেকে কাঁসিখানা ভেঙ্গে ফেললে।"

কাসি—! যাকগে—ওর কোনখানে না লাগলেই হ'ল। বৌমা আমার রের লক্ষ্মী, ওকে আঘাত লাগলে আমার সংসার থাকবে না। যাও কে তুমি বলগে আমায় মহাভারত পড়ে শোনাতে। মেয়েটার মাথা াছে এই ক'দিনে দিব্বি পড়তে শিখেছে।" যোগেন ছোট ভাইয়ের া, মেয়ের চেয়েও বয়সে ছোট, সরসীর প্রতিঃস্নেহে আকুল হয়ে তার দ্ধির প্রশংসা করে। সুবর্ণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাপা-গলায় রসীকে ধমকায়: "ছিঃ ছিঃ, এসব নিয়ে কি আন্দোলন করে নাকি, বাকা! বলেই দিয়েছি ত' ছোঁড়াটা মন্দ, সাবধানে চলা ফেরা করিস, কন্তু কথা ত' তুই শুনবি না, একা একা ঘাটে যাবি আমাকে ফাঁকি দিয়ে াসন মাজার জন্যে। না এসব আর করিসনে, আমিই মাজব সব।" বারে—আমি বুঝি বসে বসে শুধু ভাত খাব! সব কাজই ত' তুমি করছ—সে হবে না।" সরসী চোখ মুছতে মুছতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, "এটা আমাদের পাড়া, ও আসে কেন? ঘরের বৌ-ঝি বুঝি ওর জন্যে কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকবে?" সুবর্ণ একটু চুপ করে থেকে হাসতে হাসতে বললে, "সবার এসব হয় না, কিন্তু তোর রূপটা ত' আর সাধারণ নয়! —মানিক কেন, অনেকেরই লোভ হতে পারে!"

"তুমিও এসব বিচ্ছিরি কথা বলছ?" সরসী অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে রান্নাঘরে গোঁজ হয়ে বসে রইল দেখে সুবর্ণ বাঁ হাত দিয়ে সরসীর মাথায় একটা গুতো মেরে বললে, "মুখপুড়ী! ওঠ্ তোর ভাশুরকে মহাভারত পড়ে শোনাগে।" অগত্যা সরসীকে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াতেই হয়। ভাশুর তাকে এত স্নেহ করেন যে, সে কল্পনা করে, যে বাবাকে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে হারিয়েছে, তাঁর স্নেহের সঙ্গে ভাসুরের স্নেহের তফাৎটা কত হতে পারে।

সরসী মহাভারতখানা খুলে বসে চৌকির নীচে একখানা পাটি বিছিয়ে। সুবর্ণ নিশ্চিন্ত মনে তার ঘুঁটে দেওয়ার কাজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পাঁচ

সন্ধ্যার সময় মানিক যখন হঠাৎ যোগেনের ঘরে ঢুকল, যোগেন খুবই খুশি হ'ল। নিঃসঙ্গ জীবন, বিছানায় পড়ে পড়ে শুধু কাতরানো আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া বেচারীর কিছুই নেই। এত দিন যে লোকটি কাজ আর লোকের ভিড়ের মধ্যে কাটিয়েছে, সেই লোক এমন করে চুপচাপ থাকতে পারেনা বলেই, বয়সের সামঞ্জস্য থাক্ বা না থাক্ তবু একটা জীবন্ত মানুষ যে কাছে পেয়েছে এইটুকু ভেবেই সকলের সঙ্গে সে কথা বলতে চাইত। কিন্তু কেউই কাছে আসত না—এক নিজের ভাই, স্ত্রী আর ছাত্রী হিসাবে চোদ্দবছরের কচি মেয়ে সরসী ছাড়া। পাড়ার মধ্যে বেঁচে থেকেও সকলের কাছে যোগেন যেন বছরখানেক হ'ল মরে গেছে এমনি একটা ভুলে যাওয়ার আবহাওয়া শুয়ে শুয়েই যোগেন অনুভব করত। তাই মানিককে আসতে দেখে খুশির আতিশয্যে যোগেন ভুলেই যায় যে, সে পঙ্গু, হাতের বইখানা রেখে জীবন্ত দিকটা তার বিছানা ছাড়ার জন্য ব্যস্তভাবে নড়ে চড়ে ওঠে। মানিক পরমাত্মীয়ের মত যোগেনকে বিছানায় শুইয়ে দিতে দিতে বললে, "অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন যোগেন দা! আমি এইখানে বসছি।" বলে সে একটা টুল টেনে একেবারে যোগেনের মুখোমুখী হয়ে বসল। সুবর্ণ প্রদীপটা উস্কে ঠিক করতে করতে বললে, "মানিক ঠাকুরপো এবার বুঝি দেশেই থাকা ঠিক করলে।"

মানিক সুবর্ণর কথার মধ্যে ধারাল সুচটা বোধ হয় বুঝতে পারে বলেই বললে, "সে আর হ'ল কই—দেখছি পাসটা এবারে করতে হবেই।" কথার শেষে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে অন্ধকার উঠানের দিকে কিছু দেখে হাসতে

হাসতে মানিক বললে, "বুঝলেন যোগেন দা, সুরেনদার বৌ সরসী বৌদি কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলে না। এটা আমার কিন্তু ভাল লাগে না!"
যোগেন তার কাঁচা-পাকা খোঁচাখোঁচা দাড়ি-ভর্ত্তি মুখখানায় হাত বুলুতে বুলুতে প্রসন্নস্বরে বলে: "তা আমিও পছন্দ করি না। আমাদের সময় আমরা পাড়ার ছোট্ট ছোট্ট বৌদিদের নিয়ে কত মজাই না করতাম। না না বৌমা তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে বইকি! পাড়াপড়শীকেই যদি আপন করে না ভাবতে পার তবে আর মিশবে কার সঙ্গে?"
সুবর্ণ একটু বিরক্ত হয় স্বামীর বোকামীতে। সে কথার কাটান দিতে বললে, "তোমাদের সময় কি ছিল জানি না, তবে পাড়ার গুরুজনেরা যখন নিষেধ করেন কথা বলতে, নাই বা বললে। একটু বড় হোক্ তখন কথা বললে কোন নিন্দের হবে না। এই ত' আমি সবার সঙ্গেই কথা বলি! কিন্তু কনে বৌ অবস্থায় কথা ত' বলিনি।" সুবর্ণ যোগেনের বিছানাটা ঝেড়ে দেয় কথার সঙ্গে সঙ্গে।
যোগেন স্ত্রীর কথায় ক্ষুন্ন হয়ে মানিককে বললে, "মেয়েদের এই কুণো স্বভাবটা কখনো যাবে না ভাই!"
মানিক কথায় রেশ টেনে বললে, "এসব কলকাতায়, ঢাকায় দেখা যায় না। মানে শত হলেও শিক্ষা পাচ্ছে ত' মেয়েরা।"
যোগেন মাথা দুলিয়ে বললে, "শহর জিনিসটাই একটা আলাদা! সেই জন্যেই ত' এখানে আমার মন টেঁকে না। আগে দোকানের হিসেব যা করার করতাম, তারপর ছেলে পড়াতে যেতাম। দিনরাত বেশ ভাল ভাবেই কেটে যেত। পরের নিন্দে আর কুৎসা নিয়ে গজ্‌লা আমার সত্যি ভাল লাগে না।"
সুবর্ণ বললে, "এটাই বা কম যাচ্ছে কিসে?" সুবর্ণ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে যোগেন হাসবার চেষ্টা করে বললে, "একটু আজ চা কর না! গল্প করতে করতে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মানিক হেসে ফেলে বললে, "বৌদির মুখখানা এমন কালবৈশাখী মেঘের মত হয়ে আছে যে, তাতে ভরসাই হচ্ছিল না চায়ের কথা বলতে বাড়ীতে আজ চা খাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাবা হঠাৎ এমনি আমার ওপর রাগারাগী সুরু করলেন যে, এখান থেকে না পালালে চলবে না। আচ্ছা দাদা, আপনিই বলুন পাসটা কি কেউ ইচ্ছে ক'রে করে না ?"

যোগেন একটা শ্বাস ফেলে বললে, "এটা অদৃষ্ট ভাই, নইলে আমি কেন এনট্রেন্সে ফেল করলাম! অথচ পড়ায় লেখায় আমি খুব খারাপ ছিলাম বলে ত' শুনিনি।" যোগেনের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে আসে বাল্যের কথা মনে করে।

—"সে ত' বুঝতেই পারি আপনার লেখাপড়ার জ্ঞান কতটা বেশী আমাদের থেকে। কেননা তখনকার দিনে আপনারা যতটুকু পড়েছেন আমরা তার কিছুই জানিনা। অথচ পড়ছি ত' বি. এ.। উচ্চারণ আর লেখা আপনারা শিক্ষা করেছিলেন বটে! আর এখন, একটা ইংরেজী লিখতে দশবার চেষ্টা করে যদি গুছিয়ে লিখতে পারি।" মানিক টুল-খানার উপর জুত হয়ে বসে আড় চোখে সুবর্ণর মুখের উপর দৃষ্টি বুলোয়। একটু যেন প্রসন্নভাবে স্বামীর খ্যাতি শোনে সে। সত্যিই একদিন এই গ্রামে যোগেনের সুনাম ছিল লেখাপড়ার জন্যে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর পাস করতে পারলে না সংসারের দায়িত্বে জড়িয়ে গেল মেধাবী ছাত্রটি। মানিক হাল ছাড়ে না যেন, ডোবা-নৌকাকে টেনে তোলার মত করেই বলে : "সেই জন্যেই ত' সরসী বৌদিকে ঘাটে দেখে চায়ের কথা বললাম। কিন্তু বৌদি আমার ভুলেই গেলেন সে কথা। অথচ মাথা ধরে রয়েছে এদিকে, সেটা কি বৌদিদের কারুর খেয়াল আছে! না, এবারে আর বি. এ. পাস না করে আসছি না। পরশু যাব ঠিক করেছি।"

মানিকের কথায় সুবর্ণ হেসে ফেলে বললে, "অত বৈরাগ্যের প্রয়োজন

নেই, বেচারী কাকীমা কান্নাকাটি করবেন শেষে ত'। যাক, বসে তোমার দাদার সঙ্গে গল্প কর আমি চা আনছি।"

মাণিক সুবর্ণর কথায় বেশ টেনে বললে, "মা কান্নাকাটি করবেনা হাতী করবে! আমার চেয়ে যখন পাসের মূল্যটাই ওঁদের কাছে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন সরে যাওয়াই আমার ভাল। মানে পাস না করে আমি সত্যি আর দেশে ফিরব না।"

যোগেন ম্লান হেসে মানিকের চাপা অভিমানটা সস্নেহে যেন সরিয়ে দেবার জন্যই বললে, "পাগ্‌লা ছেলে! মা বাবা সাধে কি রাগ করেন সন্তানের ওপর? তাঁরা চান ছেলে লেখাপড়া শিখুক সকলের কাছে সম্মান পাক্ সেই আশা নিয়েই এই সব বকাবকি, রাগ ঝঞ্ঝাট! তাই বলে ছেলেকে কি কেউ দূর করে দেয়! বেশ ত' মন দিয়ে চেষ্টা কর নিশ্চয়ই পারবে পাস করতে।"

মানিক হেসে ফেলে বলে, "মন দিইনা কি, কিন্তু মনে কি কিছু ঢোকে? বোঝেনই ত' আজ সিনেমা, কাল থিয়েটার, পরশু অমুক মিটিং, কলকাতায় এত' লেগেই আছে! পড়ি কোন সময়!"

যোগেন সবই বোঝে। ধনীর সন্তানের যে রোগগুলো হয়ে থাকে সবই মানিকের মধ্যে এসে গেছে। তবু ছেলেটির সরল সত্য কথায় যোগেন খুশি না হয়ে যেন পারে না। বললে, "বেশ ত' একটা বছর এসব নাই বা দেখলে শুনলে, পাসটা করে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দাও, তারপর আছেই ত' এসব।"

সুবর্ণ দু কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকে ওদের কথার মাঝে কথা বলে, "আচ্ছা তোমরা যে কলকাতার থিয়েটার থিয়েটার বলো, সে জিনিসটা কেমন?"

মানিক হেসে যোগেনের দিকে চেয়ে বললে, "নিন্ এখন বোঝান কেমন জিনিসটা।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে সুবর্ণর হাত থেকে চায়ের

কাপটা তুলে নেয়। যোগেন চায়ের কাপটা স্বর্ণর হাতে রেখেই একটু কাত হয়ে চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, "বোঝান সহজ নয় ঠিকই। কেননা রিভলভিং ষ্টেজ, ওদের ড্রেস, এ্যাকটিং, এ সব বোঝান সহজ নয়। তবে, এইটুকু বললে বুঝবে বোধ হয়, সেবার আমার দোকানের মালিকের ছেলের অন্নপ্রাশনে যারা থিয়েটার করেছিল, তেমনি সব মেয়ে ছেলেরা থিয়েটার করে। তবে এটা ঢাকার দল, ওরা কলকাতার আরও একটু মার্জিত শিক্ষিত সম্প্রদায়।"

স্বর্ণ স্বামীর বিছানার কোণ ঘেঁষে বসে মাথার কাপড়টা আরও একটু টেনে কাপড়ের ঐ ছেঁড়া অংশটা যেন মানিকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে করতে বললে, "বুঝলাম, তবে আরও কেমন সুন্দর সেটা ঠিক ধরতে পারি কি করে।" স্বর্ণ নিজের অজ্ঞতায় ক্ষুন্ন হয় না বরং হেসে ফেলে বললে, "গাঁয়ের বৌ, ওসব কি আমরা বুঝি, না জানি! তবে তোমার দাদা আমাকে এর মধ্যে অনেক কিছুই দেখিয়েছেন। থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখাতে ক্রুটি করেননি। আজই সব হাত-পা ভাঙ্গা অবস্থা।"

স্ত্রীর কথায় একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে যোগেন বললে, "ও কথা থাক্ বড় বৌ, যা গেছে আজ তাকে নাড়াচাড়া করে আমাকে ব্যথা দিওনা।" কথার শেষে যোগেন প্রদীপের ক্ষীণ শিখার দিকে চেয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়।

মানিক কথার মোড় ঘোরাতে বললে, "বৌদির হাতের চায়ে কিন্তু বেজায় চিনি বলতে হচ্ছে। আমি মোটে বেশী চিনি খেতে পারি না চায়ে।"

স্বর্ণ বললে, "তোমার এই বৌদি চা করেনি ভাই। সরসী করেছে কিনা একটু বেশী বোধহয় দিয়ে ফেলছে। ছেলে মানুষ ত' চা বানাতে এখন শেখেনি।" স্বর্ণ স্বামীর নিঃশেষিত কাপটা সরিয়ে নেয় যোগেনের

মুখের কাছ থেকে। তারপর গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে হাঁক দেয় "সরি—পান দিয়ে যা—আমি ততক্ষণ কাপ দুটো ধুয়ে তুলে রাখি।"

"হাঁা সরিয়ে রাখো ভাঙ্গলে সুরেন এসে চা খেতে অসুবিধে পাবে। এখন ত' আমার সেদিন নেই!" যোগেন ঠোঁটের কোনে নিজের অক্ষমতার প্রতি একটা উপেক্ষার ঢেউ তোলা হাসি ফুটিয়ে তোলে।

মানিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সরসীর জন্য আর একবার অন্ধকারে বুলিয়ে যায়। পানের ডিবে হাতে সরসী ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে মাথায় দীর্ঘ এক ঘোমটা টেনে। হাসতে হাসতে মানিক চট্ করে প্রদীপটা পিলসুজ থেকে তুলে নিয়ে বললে, "যা একটা ঘোমটা টেনেছেন সাবধান আমি আলো ধরছি!"

সুবর্ণ কাপ ধুয়ে ঘরের কোণে কেরোসিন কাঠের বাক্সটার উপর সযত্নে গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, "এত যদি ওর সঙ্গে ফাজলামি কর' তবে বেচারী কি করে কথা বলে বল ত' ?" সুবর্ণ যেন ভুলেই যায় মানিকের দোষত্রুটি সব কিছু এম্নি হাস্য পরিহাসে সেও এগিয়ে আসে দরজার কাছে সহজ মনে। পিছন থেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যোগেন বলে, "আমার ক্ষেপা মা কখন দেখবে দুষ্টু মেয়ের মত উঠোনে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, কখন দেখবে ঘোমটা টেনে লক্ষ্মী মায়ের মত ঘুরছে। সত্যি মেয়েটা একটা গরীবের ঘরের রত্ন! সাধে কি সুরেনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে আটক করেছি—ওযে আমার লক্ষ্মী!" যোগেন উচ্ছ্বাসে অনেক কিছুই হয়ত বলত' কিন্তু মানিক আর বসেনা। সরসীর হাতের ডিবে থেকে পানটা নেবার সময় দুষ্টুমী করে বললে, "পানে বেশী চুন পড়েনিত'? কেননা, চায়ে যখন বেশী চিনি, পানে বেশী চুন হওয়া স্বাভাবিক।" কথার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল মানিক, সরসীর ঘোমটাটা ফস্ করে মাথা থেকে উল্টে দিয়ে।

খিলখিল করে সুবর্ণ হেসে উঠে বললে, "দস্যি ছেলে! ছেলে মানুষকে কি এমনি করে লজ্জা দেয়!"

মানিক হাসতে হাসতে উঠানে নেমে যায় দ্রুত পায়ে।

গ্রাম দেশ, সন্ধ্যার মধ্যেই সবাই দোর দেয়। তবে নিতান্তই যারা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে পারেনা, তারা লণ্ঠন জ্বেলে জটলা পাকায় শিব মন্দিরে কিংবা চণ্ডী মণ্ডপে। একদিন যোগেনও তাদের দলেই ছিল, কিন্তু বছর খানেক ধরে কথা বলা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল। আজ মানিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা বোধ হয় পঙ্গু দেহের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠল বলেই চেঁচিয়ে বললে, "মাঝে মাঝে এস গল্প করা যাবে।"

মানিক রান্নাঘরের আবছা আলোর দিকে একটা সতর্কদৃষ্টি হেনে বললে, "আসব বইকি—।" মানিক রান্না ঘরের আড়ালে চলে যায়।

সরসী উনানে কাঠ গুঁজে ভাত চাপিয়ে দিয়েছে। সকালে তাদের রান্না হয় নি, যা দুটি ভিজে ভাত ছিল তাই খেয়েছে। যোগেনের একাদশী, সে দুধ আর কলা খেয়েছে। রাতে খৈ খাবে কিংবা শুধু দুধ। সরসী উনানের জ্বালের দিকে চেয়ে একটি একটি করে শুক্‌না পাতা উনানে গুঁজে দেয়। বেশী কাঠ পোড়ানর প্রয়োজন নেই—ফুট এসে গেছে, এখন পাতার জ্বালেই ভাতটা নেবে যাবে।

সুবর্ণ একটা ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকে বিকেলের রান্নাটা ঠিক করে দিয়ে গেছে এখন দু'জনে খেয়ে শুয়ে পড়বে। অবশ্য অন্যদিন বিকেলে রান্না এরা করেনা তবে সুরেন যেদিন আসবে বলে কথা থাকে, সেদিনই সুবর্ণ সকালের দিকে এটা ওটা করে চালিয়ে নেয়। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন সে আজ আর এল না। বেলা তিনটের মধ্যেই স্টিমার এসে পৌছায় এখানে।

সরসী উনানের হাঁড়িটা সন্তর্পনে নামিয়ে ফেন গালতে থাকে আগুনের

দিকে চেয়ে। সুবর্ণ স্বামীর জন্য দুধটা গরম করতে রান্না ঘরে ঢুকল দেখে সরসী বললে, "এতগুলো রান্না না করলেই হত।"
সুবর্ণ দুধটা কড়াই সমেত উনানে বসিয়ে দিতে দিতে বললে, "কিন্তু রাতেও ত' আসতে পারে!"
"দিদির যেমন কথা! রাত দুপুরে লোক আবার আসে নাকি!" সরসী ভাতের হাঁড়িটা আস্তে পিঁড়ের উপর বসিয়ে রাখে কথার শেষে।
সুবর্ণ সরসীর অভিমান ভরা মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে, "আমার বোনটির বুঝি অভিমান হয়েছে! তা কাজেও ত' আটকে যায় মানুষ!"
সরসী দিদির কথায় লজ্জা পেয়ে বললে, "আমি তার জন্যে কিছু বলেছি বুঝি! বলছিলাম আলুটা বেগুনটা খরচ না করলেও চলত আজকে।"
মাথা দুলিয়ে কথায় সায় দিয়ে সুবর্ণ বললে, "রোজই ত' আমরা ডাল ভাতে কিংবা কিছু পুড়িয়ে খাই আজ না হয় আলু দিয়ে পুঁটি মাছের ঝোলটা খেলামই। কি বলিস্, ভাগ্যে যখন মিলেই গেছে মাছ।" সুবর্ণ কথাটা সহজ করে হাসতে হাসতে স্বামীর জন্য দুধ নিয়ে চলে যায় বড়ঘরে। সরসী একটা থালে দু'জনের ভাত নিয়ে হাঁড়িতে হড় হড় করে খানিকটা জল ঢেলে ঠাঁই করে জল পিঁড়ি গুছিয়ে।
রাতের পাট চুকিয়ে সরসী বিছনায় শুয়ে খানিকটা এপাশ ওপাশ করে। একে প্রচণ্ড গরম, তার উপর দু'হপ্তা ধরে যে লোকটি আসবে বলে আসছেনা সেই লোকটির উপর দারুণ অভিমানে মনটা তার খুবই ভার হয়ে উঠেছে। ওপাশের ঘরে সুবর্ণ সারাদিনের ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। যোগেন ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে উঃ—আঃ সূচক শব্দ করছে শুধু, সরসীর চোখেই ঘুম নেই। দরজা খুলে বাইরে বসতে ইচ্ছা হয় কিন্তু, ভয়ে দরজার দিকে ও যায় না। খোলা জানালাটার উপর মাথাটা এগিয়ে দিয়ে চুপ করে একটু ক্ষণ বসে থাকার পর, বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে সারাটা দিনের পরিশ্রমে নেতিয়ে একেবারে শরীর এলিয়ে।

ছয়

ভোরের আলো তখনও তেমন ভাবে ফোটে নি। সরসী ব্যস্ত ভাবে উঠে বসে সুবর্ণর দরজা ধাক্কায়। পাশাপাশি দু'খানা ঘর দু' ভাইয়ের। পুরান আমলের ভারি দরজা টিনের চালে যেন ধাক্কা খাচ্ছে। ওদিক থেকে যোগেন বললে, "সুরেন এল কি?" এঘর থেকে সরসী দৌড়ে যায় দরজার আগড়টা খুলে দিতে। মুহূর্ত্তে যেন সারা বাড়ীতে সাড়া পড়ে গেল একটি লোকের আগমনে।

সুবর্ণ হাসি মুখে সুরেনের হাত থেকে ইলিশমাছটা কেড়ে নেওয়ার মত করে বলে ওঠে: "ঈশ কত বড় মাছ! আমার জন্যেই এনেছত'? সরির এখনত' মেজাজ গরম! আমিই যাই কুটে কেটে ব্যবস্থা করি।"

যোগেন ঘাড়টা একটু তুলে মাছটাকে দেখে, ঘুম ভাঙ্গা থম্‌থমে ভারি গলায় খুশির সুরে বললে, "একাদশীর পারনটা আমার ভালই হবে দেখছি।"

সুরেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, "এই মাছটা আজ বরাত গুণেই জুটে গেল বলতে হবে। যাক্, আসতে যে পারব ভাবিনি। ছুটি পাওয়া কি যায়?" কথার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন গায়ের জামাটা খুলে বেড়ার গায়ে আটকে রাখে।

সুবর্ণ সরসীর উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বললে, "শিগ্‌গীর উনুনে আঁচ দে, চা করতে হবে।" তারপর নিচু গলায় দেওরকে ঠাট্টা করে, "সুন্দর মুখ না দেখে এই দিনপনের কাটালে কি করে! এদিকে সরি ত' অভিমানে কাল গলেই যাচ্ছিল আর কি!"

সুরেন বৌদির পরিহাসে একটু হেসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে, "সেই জন্যেইত' রাত করে ডিঙ্গীনোকো চেপে চলে এলাম।" সুরেন হাত মুখটা ধুতে উঠানে নামে কথার সঙ্গে সঙ্গে।

সুবর্ণ হঠাৎ রেগে গিয়ে বললে, "ফের তুমি ডিঙ্গীতে চেপেছিলে? সেবার কি বিপদটা হতে হতে হয়নি এর মধ্যেই ভুলে গেছ! না তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি আর পারি না।" সুবর্ণ রাগে হাতের মাছটা দুম করে ফেলে খিড়কির দিকে চলে যায় দেখে সহাস্তে সুরেন বললে, "আরে মাছটা তাই বলে মার খায় কেন। বেশ আমিই না হয় কানমলা খাচ্ছি তোমার ছোট্ট ছোট্ট হাতের। এক সময় অভ্যস্ত ত' ছিলাম এই শাস্তি-টার। নাও রাগ না করে শিগ্গীর আমায় চা আর পাউরুটি দাও।"

'এটা তোমার নারানগঞ্জ নয়, নেহাত একেবারে পাড়া গাঁ, রাজাবাড়ী নামেই রাজাবাড়ী, পাউরুটি এখানে কোথায়?"

সুবর্ণর পরিহাসে সুরেন কৌতুকোৎভাসিত স্বরে বললে, "রাজাবাড়ীর রানীরা না হয় দীন গরীব লোকটার পোঁটলা পুঁটলীটা একটু দয়া করে খুলেই দেখুন।"

সরসী দৌড়ে সুরেনের জিনিস-পত্রগুলো ব্যস্ত হাতে খুলে বেতের বাস্কেটটা থেকে চারটে পাউরুটি এক টিন মাখন, একটা ছুরি, এক টিন জেলি বার করে। সুবর্ণ খুশিতে ঝলমলে হয়ে বললে, "এযে একেবারে সাহেবী ব্যাপার!" যোগেন শুয়ে শুয়ে বারান্দার কথা বোধ হয় কান পেতে শোনে, বললে "বিদেশে থাকতে গেলে এসব একটু করতে হয়ত'। তার ওপর কাজটা ওর আমাদের মত দোকানের খাতা লেখা নয়, এটা ভুলে যাও কেন?" ছোট ভাইয়ের পদমর্য্যাদা দাদাকে রাশ ভারি করে তোলে। যোগেন হাঁক দেয় "বৌমা আমার স্টোভটা আজ ধরাও, এইখানে বসে তুমি চা কর সুরেন পাউরুটি কাটুক।"

সুবর্ণ স্বামীর ছেলেমীতে বাধা দেয় না। হেসে বললে, "সেই ভাল, ততক্ষণ আমি চট্ করে ডুবটা দিয়ে এসে রান্না চাপাই গে। রাত জেগে বেচারী এসেছে একটু শুয়ে বিশ্রাম না করলে, শরীর খারাপ হবে।" সুবর্ণ কাপড় গামছা নিয়ে নাইতে চলে যায় ভোর রাতে।

গ্রাম দেশে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎটা এখনও রাতের অপেক্ষাতেই থাকে সারাটা দিন সরসী সংসারের খুটিনাটি কাজ সম্পূর্ণ সেরে রেখে সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে বসে বললে, "আমার সব কাজ সারা হয়ে গেছে। এখন খাওয়া হলেই বাসন মাজা।"

সুবর্ণ চোখ মিটকে বললে, "আর, তার পরেই সরীরানীর অভিমানের পালা কীর্ত্তন, কেমন এইত' ?"

সরসী মুখ চোখ লাল করে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলে উঠল "ভাল হচ্ছে না কিন্তু" বলেই হাতের কাছে একটা কাঁচা লঙ্কা তরকারীর ডালা থেকে তুলে নিয়ে সুবর্ণর দিকে ছুঁড়ে মারে।

সুবর্ণ হাসতে হাসতে ইলিস মাছের ঝোলে খুন্তিটা একটা নাড়া দিয়ে কড়াই নামায়। বড়ঘর থেকে যোগেন ডাকে—"কৈ গো, সুরেন যে এসে গেল, এখনও তোমার ঝোল ভাত রান্না হ'ল না ?"

ব্যস্ত ভাবে সুবর্ণ বললে, "যা রা সরি, চটকরে পিঁড়ি পেতে ঠাঁইটা করে ফেল। আমি ততক্ষণ ভাত বাড়ি।"

সরসী মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে যোগেনের ঘরের সামনে বারান্দায় একটা পিঁড়ি ফেলে জলের ছিটে দিয়ে সুরেনের জন্য ঠাঁই করে দিলে। সুবর্ণ এক থালা ভাত এনে সামনে এগিয়ে দিয়ে ডাকলে, "এস ঠাকুরপো, বসে বসে খাও আমি তোমার জন্য ভাজা ভেজে আান।" সুবর্ণ রান্নাঘরে চলে যায়, সুরেন দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিঁড়িতে এসে বসল।

যোগেন শুয়ে শুয়েই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করে, সংসারের আয় ব্যয় নিয়ে ব্যবস্থা করে। গল্প করে খেতে সুরেনের যথেষ্ট সময় লাগলেও এদিকের কাজ সেরে নিয়ে যখন সরসী ঘরে ঢুকল তখন দশটা প্রায় বাজে।

সরসী হাতের জল ভরা গ্লাসটা টুলের উপর ঢাকা দিয়ে রাখল। পরে দরজায় খিলটা ভাল করে দিয়ে, বিছানার কাছে এগিয়ে যেই গেছে

অমনি সুরেন খপ্ করে সরসীর হাতটা ধরে ফেলে ঘুমজড়ানো সুরে বললে, "সময় বুঝি আর হয়ই না!" সরসী দুষ্টুমী করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বললে, "কেন সময় হবে ? যে আসে না তাকে—" সরসীর কথা শেষ হয়না, সুরেন চট্ করে উঠে সরসীকে একেবারে কোল-পাঁজা করে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিতে দিতে বললে, "তাকে এম্নি করে মান ভাঙ্গাতে হয়, না ? আজকাল দেখি খুব দুষ্টু বুদ্ধি হয়েছে।" সুরেন হাসতে হাসতে পাখীর মত হাল্কা, ফুলের মত নরম সরসীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করলে। তারপর বিছানার তলা থেকে এককোটো পাউডার, এক শিশি স্নো, একটা সুগন্ধি সাবান, আর চুলের কাঁটা ফিতে বার করে বললে, "তোমার জন্যে এনেছি।" সরসী খুশিতে সুরেনের কোলের উপর মুখটা লুকিয়ে হাসে। সুরেন সরসীর খোঁপায় রবারের রঙীন কাঁটাগুলো গুঁজে দিয়ে টক্‌টকে লাল রেশমী ফিতেটার একটা ফুল বানিয়ে, সরসীর খোঁপার পাশে কাঁটা দিয়ে এঁটে দিতে দিতে সহাস্যে বললে, "একেবারে স্কুল গার্ল চেহারা হয়ে গেল কিন্তু!"

সরসী আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, "গার্ল মানে আমি জানি।"

সুরেন সরসীর গালটা টিপে আদর করে বললে, "তাহলে দাদার মেধাবী ছাত্রীর সত্যিই গুণ আছে দেখছি। বেশ বেশ, লেখাপড়া শেখো, দাদারও সময়টা কাটবে, তুমিও আরামে সময় কাটাবে। আমার জন্যে তখন মন কেমন করছে বলে বৌদির কাছে কান্নাকাটির সময় পাবেনা"।

সরসী ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "হঁ্যা তাই আর কি ! একে দাদার কাছে একটু-আধটু পড়ি বলে পাড়ায় কত কথা বলে। সারাদিন বই নিয়ে থাকলে ত' রক্ষেই ছিলনা!"

সুরেন সরসীর মাথায় পিঠে আদর করে হাত বুলুতে বুলুতে বললে, "শিক্ষার খুবই অভাব গ্রামে তাই ওসব ওরা বলবেই। সেই জন্যেই ত'

ভেবেছি তোমাদের এবার নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যাব। আমার থাকতে খরচ হয়, তার ওপর কিছু বেশী দিলে দিব্বি ভাল ভাবেই চলে যাবে দেশের পাট চুকিয়ে দেওয়াই উচিত, কি বলো তুমি ?"

সরসী মিটমিটে হ্যারিকেনের আলোটার দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে বলে "আমি কি বলব, দিদি যা বলবেন তাই হবে।" সরসী কি যেন ভা স্নো, পাউডারগুলো নাড়তে নাড়তে। তারপর বললে, "শহরের মেয়ে বুঝি এসব মাখে ?"

সুরেন স্ত্রীর অনভিজ্ঞতায় হেসে ফেলে রসিকতা করে বলে, "তারা তোমার মত সুন্দরী নয়, সুতরাং কিছুটা সাজসজ্জার ওপর থাকে হয় ত'! সত্যি তোমার জন্যে আমার কিন্তু রীতিমত ভাবনা হয়। কি জানি আমার সুন্দরী বৌটিকে যদি কেউ ছোঁ মারে! মানিক ত আজ তাসের আড্ডায় বলেই বসল যে, এমন একটি সুন্দরী বৌ পেলে সে নাকি রোজ রোজ তার কাছে কত কাব্যই যে করত তার ইয়ত্তা নেই।" সুরেন হাসতে থাকে সরসীর কানের বটফল দুলটা নাড়তে নাড়তে। রূপের প্রশংসায় সরসী কিন্তু মোটেই খুশি হয়না। উপরন্তু মানিকের নাম শুনে যেন আগুন লেগে যায় তার সারা শরীরে। রাগে বিদ্বেষে, সরসী মুখ চোখ আরক্ত করে সুরেনের কোলের উপর থেকে একেবারে যেন ছিটকে উঠল বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত। বলে, "ঐ পাজি বদ ছেলেটার সঙ্গে তুমি কথা বল ?—জান, সেদিন আমাকে ও কি বলেছে ?" সরসী খুলে-পড়া আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বিছানা থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় কথার শেষ রেশটার সঙ্গে।

সুরেন এই মেয়েটিকে আজও বুঝে উঠতে পারেনা, কখন সে কি করে তাই সবিস্ময়ে বলে, "ওকি—চললে কোথায় ?"

সরসী স্বামীর দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে ফিরে বললে, "দিদিকে ডেকে আনছি তাঁর মুখেই শুনবে শয়তানটা কি বলেছে।"

পাগল, না ক্ষেপা তুমি ?" সুরেন স্ত্রীর হাতধরে হিড়হিড় করে টেনে ানতে আনতে বললে, "কি বলেছে আর, তোমার দিদিকে বলতে বে না। বেশ বুঝতে পারছি, ফাজিল ছেলেটা আমার সুন্দরী কচি বৌটিকে, ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে রাঁচীর টিকিট কাটার ব্যবস্থা করেছে। াচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। দেওর-ভাজে কত কি ঠাট্টা করে, চাই নিয়ে মাথা গরম করলে আমি বেচারী মরব দেখছি।"

রসী কিন্তু স্বামীর আদর সোহাগে মোটেই শান্ত হয় না। উদ্বেলিত াভিমান আর রাগ মেশান কাঁপা গলায় বললে, "তুমি ঠাট্টা করছ, কিন্তু ত্যি বলছি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। লোকটা আমাকে যা-তা বলে, দেখা লেই।"

রেনের দিক থেকে কোন উত্তর আসেনা। সারা দিনের ক্লান্তি ার রাত জেগে ডিঙ্গী চেপে আসার দরুণ সে অঘোরে ঘুমিয়ে াড়েছে।

রসী একটু সময় গুম্ হয়ে শুয়ে থাকে। তারপর নানা অদ্ভুত অদ্ভুত র কল্পনা ভাবতে ভাবতে, সেও যে কখন ঘুমিয়ে পড়ে বোঝেনা।

দিন দুই দেশে থাকার পর সুরেন আবার চলে গেল। এর মধ্যে ানিক পড়ার জন্য কলকাতায় চলে গেছে। সুবর্ণ আর সরসী আবার াদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে জড়িয়ে যায়। সরসী বাসন মাজে রান্না করে, সুবর্ণ সংসারের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে। দিন এক রকমে চলে যাচ্ছে। যাদব সরকার মাঝে মাঝে ঋণের তাগিদ দিয়ে যায়, যোগেন চুপ করে থাকে। বলার কি-বা আছে! দেটা কোন রকমে মাস মাস দিতে পারলেই, যাদব সরকারের তাগিদ থেকে কিছুটা অন্ততঃ বাঁচা। কিন্তু, প্রতি মাসে সেটা সব সময় পারা যায় না। সুবর্ণ আড়ালে চোখ মোছে। সরসী স্বামীর কাছে আঁকাবাঁকা অক্ষরে খবর পাঠায়। সুরেন আশা দেয়, আসছে পূজায় দেশের পাট

সম্পূর্ণ মুছে দিয়েই, তারা শহরে বাসা বাঁধবে। যোগেন সুবর্ণ মারফ
কথাটা শোনে, মনে আশা হয় সুরেন থাকতে দুঃখ কি! যাক্ দেশের
ভিটে-মাটি, সুরেন ত' আছে! যোগেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আবার
নতুন করে সুখের স্বপ্ন দেখে প্রৌঢ় বয়সে পঙ্গু অথর্ব্ব দেহে।

মানিক কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে যোগেনের কাছে চিঠি পাঠায়
নতুন করে পড়াশুনা সুরুর খুঁটিনাটি খবর সাগ্রহে জানাচ্ছে। যোগেন
হাসে, বলে, "ক্ষেপা ছেলেটা!"

দুঃখের ভিতরেও বুঝি সুখের মিষ্টি একটা হাওয়া সংসারটার চতুর্দ্দিকে
বইছে। অর্থের প্রাচুর্য্য নেই, বরং অভাবই বেশী, তবু প্রত্যেকে
প্রত্যেকের সঙ্গে যেন নিবিড় বন্ধনে বদ্ধ হয়ে, দুঃখকে সবলে, দলে
মুচড়ে এগিয়ে চলতে চাইছে। সুরেন এর মধ্যে বার চারেক এসেছে
এবং দুই ভায়ে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে দেশের জমি বাড়ী যা আছে, স
যাদব সরকারের হাতে দিয়ে, তারা নারায়ণগঞ্জে বাসা করবে। যোগেন
চোখের জল ফেলে নিশঃব্দে। সুরেন দাদাকে সহজ হবার জন্য কথা
রেশ টেনে বলে, "গ্রামে থাকাটা আমার আর ইচ্ছে নেই। ভবিষ্যতে
যারা আসবে তারাও যে এই অজ পাড়াগাঁয় মানুষ হবে, এটা আমি পছন্দ
করি না। আমাদের সংসার বেশ চলে যাবে।"

যোগেন অথর্ব্ব পঙ্গু শরীরটার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করে বলে, "বেশ
যা ভাল হয় কর।" কথার শেষে সে সুবর্ণর দিকে ফিরে ঠাট্টা করে,
"আর কি, এবার তাহলে শহুরে হলে! আগে ত' তোমার জন্যে একটা
জুতো কিনতে হবে নইলে, বড় চাকুরে দেওরের সঙ্গে বেড়াতে যাবে কি
করে?" হাসতে থাকে শিশুর মত যোগেন।

স্বামী-স্ত্রীতে আজও এই সব কথাই চলছে। তারা চলে যাবে গ্রাম
ছেড়ে শহরে।

সাত

"এবার পূজোটা আশ্বিনের শেষ দিকে পড়ছে না ?"

সুবর্ণ স্বামীর কথার উত্তরে কাঁথার উপর রঙিন সুতোর টানা দিতে দিতে বলে, "হ্যাঁ বাইশে ষষ্ঠী। তা বাপু শেষ দিকে হ'লে একটু সুবিধে, বিষ্টির হাত থেকে বাঁচা যায়। গত বছর বড় জ্বালাতন করেছে বিষ্টিতে।" সুবর্ণ কাথার সুঁচটা কাঁথার গায়েই গেঁথে রেখে উঠে দাঁড়ায় আলসেমি ভেঙ্গে।

যোগেন শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ আঙ্গুলের কর গুণে কিসের যেন হিসাব করছিল, এখন স্ত্রীর দিকে ফিরে সহাস্যে বললে, "এই পনের দিনে তোমার কাঁথা হবে বলে মনে হচ্ছে না! সুরেন যেন লেপটা নিয়ে যায়, আমার ত' তেমন দরকার হয় না! কি বলো!"

সুবর্ণ মৃদু হেসে জবাব করে, "কিন্তু পনের দিন তুমি কোথা থেকে পেলে? সবে ত' আজ মাত্র মাসের পাঁচ তারিখ। এদিকে সতের দিন, আর ঐ দিকে আসছে সে নবমীর সন্দেতে। তবে পনের দিনটা তুমি কোথা থেকে পেলে বল ত' ?"

মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে যোগেন অপ্রস্তুত ভাবে বলে, "ঐ একই কথা। বাদ-ছাদ দিয়ে হিসেব করলে পনের দিনই গিয়ে দাঁড়ায়।"

সুবর্ণ চোখ দুটোয় কৌতুক নাচিয়ে বলে উঠল, "ভাই আসবে বলে হিসেবটা গোলমাল করলে চলবে না মশাই! রীতিমত দিনগুলো গুণে গুণে পার হবে তবে ঠাকুরপো আসবে।"

যোগেন বাইরের দিকে ম্লান দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলে, "ওকে হাতে করে মানুষ করেছি ত' তাই বোধ হয় হিসেবপত্তরে গোলমাল হয়। আচ্ছা, নিজের সন্তানকে কি লোকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসে ?"

"ঠিক মানুষকেই কথাটা বলেছ বটে!" সুবর্ণ হঠাৎ যেন কথাটা চাপা দিতেই ব্যস্তভাবে ঘরের থেকে বেরিয়ে ডাকতে থাকে: "সরী, সরী, বিষ্টি এসে গেল! ধানের হোগ্‌লাটা ধর্‌, ধর্‌! একটু যদি স্বস্তি থাকে! রোদ দেখে ধান ক'টা মেলে দিলাম, ছাখো পোড়া মেঘ কোথা থেকে যে এল! খৈ, মুড়ি ও এবার করতে দেবে না!"

সরসী বারান্দা থেকে দৌড়ে নামতে নামতে বলে, "এবার বর্ষাটা সত্যিই জ্বালালে। যেতে চায়না যেন! দিনের মধ্যে হাজার বার যদি গা মাথা ভিজে যায়, মানুষ কি ক'রে বাঁচে!"

ধানের হোগ্‌লাটা দু'জনে ধরাধরি করে বারান্দায় তুলে চট্‌পট্‌ ধান গুলো উল্টে-পাল্টে ছড়িয়ে দেয়।

হঠাৎ সুবর্ণ সরসীর ভিজে মাথার দিকে চেয়ে বললে, "সেই থেকে বুঝি চুলটা মুছতেও পারিসনি? বেলা পড়ে এসেছে এখন পর্য্যন্ত মাথা না শুকুলে বাঁধবি কখন?"

সরসী হাসতে হাসতে আঁচল দিয়েই মাথাটা মুছে বললে, "ঐ শয়তান মঙ্গলাটার জন্মেই মাথা ভিজে গেছে। জান দিদি ও মুখপুড়ি কোথায় গিয়েছিল আজ? ভাগ্যিস আমি দেখেছি নইলে বিপদ ঘটত। একে-বারে নয়া পাড়ায় যাদব কাকার কলুই ক্ষেতে।"

"শুধু যায়নি, বেশ ক'খাবল মেরেই এসেছে।"

"ওমা—তুমি,—তুমি কোত্থেকে? সুবর্ণ মাথার কাপড়টা অল্প টেনে সহাস্যে বারান্দার নিচে সিঁড়ির উপর দাঁড়ান মানিককে দেখে উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে আসে অভ্যর্থনা করতে। সরসী মানিককে আকস্মিক ভিতরের উঠানে দেখে কোনদিকে যাবে ভেবে না পেয়ে, তাড়াতাড়ি সিন্দুকটার পাশে টপ্‌ করে বসে পড়ে।"

মানিক চতুর্দ্দিকে একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, "ইঁদুরের গর্ত্ত থাকে ত' তার মধ্যে ঢুকে পড়। আচ্ছা সর বৌদি তুমিই বলো,

মি কি বাঘ না ভাল্লুক যে, সিন্দুকের পাশে গিয়ে লুকুতে হয়! রে বাবা এসেছি তোমাকেই একটা সুসংবাদ দিতে, ঢুকতেই কিনা ই সম্বর্দ্ধনা! বেশ আমিও বলছিনা সুরেনদা কি বলেছে।"

রের ভিতর থেকে যোগেন পঙ্গু দেহটার সমস্ত সজীবতা যেন স্বরের ভতর ঢেলে দিয়ে ডাকে: "এদিকে এসো মানিক, সুরেন কি বলে াঠিয়েছে? তুমি নারাণগঞ্জে গিয়েছিলে?"

ানিকের দিকে চেয়ে সুবর্ণ হেসে বললে, "তোমার দাদার কাছে যাও ইলে উনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।"

তোমধ্যে মানিক বারান্দায় মোড়াটার উপর দিব্বি জেঁকে বসেছিল, এখন ুবর্ণর কথায় বাধ্য হয়েই তাকে উঠতে হ'ল ব'লে সরসীর উদ্দেশ্যে াসিয়ে গেল, "নিতান্ত যোগেনদা ডাকছেন বলেই উঠলাম, নইলে আজ রী বৌদিকে এইখানেই আটকে রাখতাম। দাঁড়াওনা সুরেনদা আসুক কি করি তোমার।"

ুবর্ণ মানিকের শাসানিতে হেসে ফেলে বলে, "আগে সুসংবাদটা দাও তারপর বেচারাকে শাসিয়ে যা করার করো। এখন বলো, ঠাকুরপো কি বলে পাঠিয়েছে।"

মানিক সহাস্য মুখে যোগেনের বিছানার একপাশে বসে বললে, "আগে আমাকে সুসংবাদের জন্যে কিছু খাওয়াও তবে বলব।"

যোগেন মনে মনে অনেক কিছু অনুমান করে খুশির সুরে বললে, "নিশ্চয়ই খাবে। তোমার বৌদি খাওয়াতে বাধ্য।"

"বিশেষ করে সরী বৌদি। কারণ, ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই যখন সুরেনদা জানাতে বলেছেন, আমাকে না খাওয়ালে বলছিনা।"

মুহূর্তে যোগেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে বলেই, গুরুজন হিসাবে একটু যেন এড়িয়ে গিয়ে মৃদু হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

সুবর্ণ বলে, "আসবে জানিয়েছে ত'? কবে আসছে?"

"তোমার ঐ বিষয়ে কি দরকার!" মানিক হাসি চেপে কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে সবসীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে থাকে : "তিন জনের বিষয়ে তিনটি সংবাদ নিয়ে এসেছি, প্রথমে যোগেনদা, পরে সন্ন বৌদি, তারপরে যদি কেউ কাছে এসে জিগ্যেস করে তবে, শেষ সংবাদটি চুপি চুপি জানাতে হবে।"

মানিকের ছেলেমিতে যোগেন হাসতে হাসতে বললে, "আমারটা হয়ে যাক্ তারপর তুমি তোমার বৌদিদের কাছ থেকে যা আদায় করতে পার, ভাগটা দিও। জানই ত' তোমার সন্ন বৌদি কেমন হিসেবী! বাতাসার ছায়া দেখিয়ে সরবৎ করে।"

সুবর্ণ রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে। আসন্ন একটা সুসংবাদ মনটাকে যেন সংসারের সমস্ত রূঢ়তা থেকে হঠাৎ আলগা করে তুলে ধরেছে, চারিদিকে মিষ্টি একটা প্রলেপ ছড়িয়ে।

মানিক মাথা দুলিয়ে কথায় জোর দিয়ে বলে : "ছায়া দেখে সন্তুষ্ট হবার ছেলে নই! রীতিমত খসাতে হবে। মানে ঘুষ না দিলে বলছিনা।"

"বেশ ত' বলো কি খাবে? গরীব বৌদির সাধ্যমত হলে কেন খাওয়াব না? সুসংবাদটা আমিও খালি মুখে শুনতে চাইনা।"

যোগেন, সুবর্ণর খুশিতে ঝলমলে মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, "তবে আমাদের জন্য চা আর মোহনভোগ কর, কি বলো হে মানিক মন্দ হবেনা টিফিনটা! অনেকদিন তোমার বৌদি মোহনভোগ খাওয়াচ্ছে না।"

মানিক যোগেনের, মোহনভোগ নামে সুজির ঘাঁটটি, খাবার ভয়ে মনে মনে যেন শিউরে উঠল। যদিও সে গ্রামেই থাকে কিন্তু, অন্যান্য বাড়ী থেকে তাদের বাড়ীর খাওয়া দাওয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। এক তারা ধনী এই হিসাবে, দ্বিতীয় হ'ল মানিকের মা তখনকার দিনে ঢাকা শহরের মধ্যে রীতিমত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। তিনি নিজের হাতে দু'বেলা চা, খাবার তৈরী করেন। সুতরাং সুবর্ণর মোহন-

ভাগটি কতদূর অমৃত যে হবে, সেটা ইতোপূর্ব্বে একবার মানিক জনেছিল যদিও, তবু একটি রুগ্ন মানুষকে খুশি করতে, এবং কিছুক্ষণ এইখানে বসে সরসীকে নিয়ে কৌতুক করার উদ্দেশ্যেই বললে, "চায়ের সঙ্গে ছোলা ভাজা মুড়ি হ'লেও আপত্তি আমার নেই। মোটকথা ন বৌদির ঘাড় মটকান।" হো হো করে মানিক হেসে উঠল শির একটা প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে। তারপর উঠানের দিকে চেয়ে রসীর উদ্দেশ্যে বললে, "কেমন জব্দ! তোমাকে বলব না কিছু! া, যোগেনদা শুনুন, আসছে মাস থেকে সুরেনদার মাইনে বাড়ছে। পর সন্ন বৌদি তুমি শোন, সুরেনদা ফর্দ্দ চেয়েছে মাসের জিনিস-পত্তর নারায়ণগঞ্জ থেকেই আনবে। মানে, জাহাজ ঘাটায় ওদেরই কে বলে দোকান দিয়েছে; সস্তায় ভাল ভাল জিনিস পাবে বলেই, ফর্দ্দ করে পাঠাতে বলেছে। যাক্, তৃতীয় সংবাদটি আমার কাছে জমা থাক্ সরী বৌদি ত' আর জিগোস করবেনা, এখন ত' বেচারী ইঁদুরের গর্ত্ত খুঁজছে।"

স্বর্ণ সুরেনের মাইনে বাড়ার আনন্দে দিশেহারার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কি যে বলবে কিছুই যেন মনে আসছেনা, হঠাৎ সরসীকে রান্না ঘরের দিকে যেতে দেখে উল্লাসে বলে ওঠে, "মানিক ঠাকুরপো কি বললে শুনেছিস্? মাইনে বাড়ছে। এবার কিন্তু মাইনে পেলেই পুজো দিতে হবে আগে। কি বলগো?" সুবর্ণ স্বামীর দিকে সাগ্রহে তাকায়।

যোগেন এতক্ষণ স্থির নিশ্চলভাবে চেয়ে ছিল বেড়ার গায়ে টাঙ্গান কালীঘাটের পটখানার দিকে। আশা, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, সব কিছু মিলিয়ে দৃষ্টিটা যেন সজল হয়ে উঠেছে আর ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। বুঝি এত দিনের পঙ্গু অথর্ব্ব দেহের সমস্ত সক্রিয়তা আজ ঠোঁট দুটোর উপরই নির্ভর করছে। সুবর্ণ স্বামীর এই ধ্যানস্থ ভাবটা

কাটিয়ে দেবার জন্যেই সহাস্যে তাকে একটা নাড়া দিয়ে বলে, "ভাবছ কি? মানক ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলো, আমি তোমাদের চা খাবারটা করে আনি।"

যোগেন নিজের এই দুর্ব্বলতাটা ঢাকতে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে, "তুমি জেঁকে বসলে কি আমার কথা বলার সুবিধে থাকে? যাও চা আর মোহনভোগ চট্‌পট্‌ করে নিয়ে এস। তারপর মানিক, তুমি কবে কলকাতা থেকে এলে?"

মানিক ঘরের চারিদিকে একটা নিরুপায় বিপন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে জবাব করে: "ছোট মাসীর কাছে টেলিগ্রাম যাওয়া মাত্রই ঢাকা মেল ধরতে হ'ল। দাদুর শরীরটা তেমন ভাল নেই দেখে আমিও মাসীমাকে পৌঁছে দিয়েই এখানে চলে এলাম, কাল মা যাচ্ছেন দেখতে। বুড়ো এ যাত্রা টিঁকবে কিনা কে জানে!"

"তা বয়সটা হয়েছে ত'!"

"হ্যাঁ বয়েস হয়েছে বই কি—," মানিক কথার মোড় ঘুরিয়ে হাঁক দেয়, "কি গো সন্ন বৌদি, তৃতীয় সংবাদটা কি ফেরত নিয়ে যাব? না, কিছু ঘুষ মিলবে?"

যোগেন হাসতে হাসতে বলে, "তোমরা দেখছি আমার বৌমাকে অস্থির করে তুলবে। বেশ বৌমা তুমি বল ত', দাদা দিদি থাকতে আমি আবার কি দেব? সংবাদ বলতে হয় বলো।"

মানিক বিছানা চাপড়ে প্রতিবাদ করে: "এখানে দাদা দিদির হাল ধরে কিছু লাভ হবে না। রীতিমত আমাকে খোশামোদ করে কথাটি শুনতে হবে। নইলে এই চল্লাম।"

স্বর্ণ উঠান পেরিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে সহাস্যে বললে, "চা না খেয়ে উঠে গ্যাখো একবার! আমার কাছে ওসব চালাকী খাটবেনা।"

"আমি ত' দাদার বিছানায় রীতিমত গ্যাঁট হয়েই বসে আছি। কিন্তু

কথাটা কি, কেউ জিগ্যেস করছেনা বলেই ত' অসুবিধে হচ্ছে। কৈ সরী বৌদি গেল কোথায়?" মানিক বিছানার উপর থেকে নামে হাসতে হাসতে।

যোগেন হাসি চেপে বললে, "পাগলাটা দেখছি আজ বৌমাকে ক্ষেপিয়ে মারবে। ও বড় বৌ—একটা কিছু বিহিত না করলে যে হচ্ছে না! দু'পক্ষে রফা কর। আর আমরাও সুসংবাদটা শুনে খুশি হই।"

মানিক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, "সর বৌদি রফা করার লোক নয়। নইলে এতক্ষণ কি কথাটা আমাকে বয়ে বেড়াতে হয়?"

সুবর্ণ রান্না ঘরের দরজা থেকে মুখটা বার করে সহাস্যে বললে, "বেশ দু'পক্ষের মাঝখানে আমি রইলাম। কিরে সরী, কি খাওয়াবি বল? ওমা, ঘট্ ঘট্ করে মাথা নেড়ে দিচ্ছিস? খাওয়াবি না?"

"তা খাওয়াবে কেন? হাত দিয়ে জল গলে না। আর ক'দিন পরে এ বাড়ীতে আমরা ঢুকতেই পারবনা।" মানিক কথার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান মাত্র, সরসী একটা টাল খেয়ে যেন গড়িয়ে রান্নাঘরের কোণে গিয়ে দেওয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুবর্ণ তোলা উনানে পাট কাঠি জেলে, বর্ষার পোকো ধরা দুর্গন্ধ সুজি, একছিটে ঘি, কড়াইয়ে ফেলে তখন পোড়া পোড়া করে ভাজছিল। আকস্মিক কাঁচের কাপগুলো ঝন্ ঝন্ করে ওঠায় সুবর্ণ পিছু ফিরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হেসে উঠল: "আর একটু হলেই দিতিস দফা শেষ করে! অমন হুটপাটু করিস কেন?" বলে যে কাপটা প্লেটের উপর থেকে কাত হয়ে মাটিতে পড়েছিল সেটাকে সে সন্তর্পণে তুলে রাখতে রাখতে মানিকের দিকে ফিরে বললে, "তোমার জ্বালায় আমার কাপ যেত আজ!"

মুখে চোখে হতাশ ভাব এনে মানিক বলে, "আমি কি করে জানবো

বলো, নাজির বাড়ীতে যে ব্যাধ-ভীতা একটি হরিণী আছে? সরল মনে, সোজা আগের মতই রান্নাঘরে এসে দাঁড়িয়েছি। যাক্ গায়ে পড়ে যে কথাটা বলতে এলাম, বলেই যাই। বার্ত্তা-বাহককে কেউ চায়না বার্ত্তাটাই চায় সবাই। কি বলো সন্ন বৌদি?" মানিক রান্না ঘরের কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সরসীকে আড়-চোখে একবার দেখে নেয়। মাথার উপর দীর্ঘ ঘোমটা টেনে পাশ কেটে জড়ো-সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুরেন চক্রবর্ত্তীর সুন্দরী কিশোরী বৌটি। সরসীর পায়ের পাতা থেকে কাঁধ অবধি যৌবনের রেখায় রেখায় ভরে ওঠা ভাঁজগুলো মানিকের দৃষ্টি এড়ায় না। সামান্য একখানা লালপাড় শাড়ীর আড়াল থেকে কৈশোর আর তারুণ্যের মাঝখানে আকর্ষণকারী যে একটি রূপ সৃষ্টি হয়েছে, তার দিকে লুব্ধদৃষ্টি হেনে সকৌতুকে মানিক বলে ওঠে, "সুরেনদার স্ত্রী-ভাগ্যটা লোভনীয়। বরযাত্রীর মধ্যে আমি যদি যেতাম তখন, নিশ্চয়ই হাতাহাতি সুরু হয়ে যেত। কিন্তু কি করা, একেবারে যেন চিলের মত কোথা থেকে যে ছোঁ মেরে দাদা আমার সরসী সুন্দরীকে তুলে নিয়ে এল জানতেই পারলাম না!" মানিক কৃত্রিম শ্বাস ফেলে শব্দ করে।

সুবর্ণ সহাস্যে পাল্টা জবাব দেয়: "জানবে কি করে, বাবু যে তখন কলকাতায় হাওয়া খাচ্ছেন! কলকাতা যে ভারী মিষ্টি লাগে আমাদের মানিকবাবুর কাছে।"

"মিষ্টি লাগে কেন সেটা কি বৌদিদের খোঁজ করা উচিত নয়?"

"সেই জন্যেই কাকীমাকে সেদিন বলছিলাম একটি সুন্দর বৌ এনে দুষ্টু ছেলেটিকে আটকে রাখুন।"

সুবর্ণর কথার জবাবে মানিক হাসতে হাসতে বলে, "সরী বৌদির বোন যদি থাকে রাজি আছি। কিগো কলাবৌ ভরসা কিছু আছে?" কথার সঙ্গে সঙ্গে মানিক হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সরসীর পিঠের দিক থেকে

ঘোমটা ফস্ করে টেনে বলে, "হাসি মুখটি দেখতে বেশ ড়-এর দফা হ'ল শেষ! সুরেনদা পরশু আসছে!—এখন খাওয়াও।" বলে, হো হো করে হাসতে হাসতে একেবারে বড় ঘরে চলে যায়।

ব্যাপার এমন আকস্মিক ভাবে হয়ে গেল যে সরসী থতমত খেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে। তারপর গায়ের মাথার কাপড় ঠিক করতে করতে চাপা ক্রুদ্ধ গলায় ফুঁসে ওঠে, "দেখলে দেখলে কাণ্ডটা! আজ দাদাকে সব আমি বলব দেখি, হতভাগা এ বাড়ী ঢোকে কেমন করে। ইতরোমীর আর জায়গা পাওনা তুমি!"

সুবর্ণ এতক্ষণ, মানিকের দুষ্টু ছেলের মত পা টিপে রান্নাঘরের ভিতর ঢুকে, সরসীর ঘোমটা টেনে ছড়া বলার ভঙ্গিটা দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। এখন সরসীকে ক্রুদ্ধ স্বরে মানিকের উদ্দেশ্যে গালাগাল দিতে শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় যেন। সরসী খুলে পড়া চুলের রাশ জড়াতে জড়াতে রাগে অপমানে কাঁপা গলায় বলে: "তুমি বসে বসে দেখলে ব্যাপারটা? উনুনে কাঠ ছিল না?"

সুবর্ণ উনুন থেকে কড়াইটা দুম করে নামিয়ে রেখে রান্নাঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। তারপর যেন একটু ইতস্ততঃ করেই বলে, "ওকে উনুনের কাঠের ব্যবস্থা করতে হলে পথে বসতে হবে। জানিস আমাদের জন্যে এই পাজি মন্দ লোকটাই কতদূর ক্ষতি স্বীকার করে চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মান-সম্মান বাঁচিয়ে রেখেছে? আজ যদি মানিক আমাদের সহায় হয়ে না দাঁড়াত, এ বাড়ী ছেড়ে সত্যিই পথে বসতাম। ভিটেটুকুও গতবছর বাঁধা পড়েছে যাদব সরকারের কাছে। কিন্তু আজ মানিক আমাদের সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই ভিটেটুকু বাঁচাতে পেরেছি। বাগানের সুদ এখন পর্য্যন্ত নিজের হাত-খরচের টাকা ঠাকুরপোর কাছে দিয়ে আসার জন্যেই বাড়ী চড়াও হয়ে চশমখোর বুড়ো যা-তা কথা বলে অপমান করতে আসেনা।" সুবর্ণর গলাটা অপমানের জ্বালায় একটু ভারী

হয়ে আসে, চোখ দুটোও সজল হয়ে ওঠে। তবু বলতে থাকে, "মানিক যদি সত্যি খারাপ ছেলেই হ'ত, ঠাকুরপো ওকে এতটা ভালবাসত' না। ঠাকুরপোর কাছেই সব শুনেছি, আমিও জানতাম না এত সরল মায়াবী ওর মনটা। টাকা নিজে থেকে ঠাকুরপোকে দিয়ে আমাদের ভিটেটা রক্ষে করেছে। যদিও ধার, তবে সেটা যখন শোধ করতে পারব, হবে। এমন করে অপমান হ্তে হবে না! উঃ সেই গত মাসের কিস্তিতে কি কথাটা না বললে বুড়ো! এই জন্যে, আমাদের কাছে কত লজ্জিত, অপ্রস্তুত, যদি পরিচয় হ'ত জানতে পারতিস। মন্দ ছেলের মন এত মিষ্টি হয় না, সত্যি, আমাদের মানিক আপন ভাবে বলেই ঠাট্টা-তামাসা করে। এতে দোষ কিছু থাকলে কি ঠাকুরপো আমাদের ছেড়ে দিত এভাবে? এই ত' ফর্দ চেয়ে পাঠিয়েছে ওর হাত দিয়েই, বুঝতে পারছিস নাকি টাকা কোথা থেকে আসবে?"

সরসী বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে সুবর্ণর দিকে চেয়ে থাকে। কিছু আগে যে মানুষটির ব্যবহারে সরসী আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে বলে সরোষে ফুঁসে উঠেছিল, আকস্মিক তারই আর একটা গোপন ব্যবহারের সংবাদ সরসীকে যেন স্তব্ধ করে ফেলেছে। বিচার বিবেচনা সব কিছু গোলমাল হয়ে যায় সুবর্ণর ছলছলে দুটো চোখের ভিতর দিয়ে। কৃতজ্ঞতার জালে ধীরে ধীরে সরসীর ক্রুদ্ধ মনটা যেন নুয়ে পড়ে।

সরল বিশ্বাসী মন আর যাচাই করে দেখে না। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর যে সম্মান রক্ষা করেছে, তাকে সরসীর শ্রদ্ধা না করে উপায় কোথায়? একটু সামান্য ঠাট্টা, গ্রাম সম্পর্কে বৌদি যখন, তাতে রাগ করার সত্যিই কিছু নেই ত'!

অপ্রস্তুত হাসি হেসে সরসী বলে, "আমি না জেনে এসব বলেছি, তুমি তোমার ঠাকুরপোকে বলো না। সত্যি, মানিক ঠাকুরপোকে আমি ঠিক চিনতে পারি নি।"

ম্লান হেসে সুবর্ণ বলে, "প্রথমে আমিও চিনতে পারিনি। ঠাকুরপো আমার চোখ খুলে দিয়েছে। উনি ত' মাটির মানুষ, সবাইকেই স্নেহ করেন। তবে এসব শুনে তিনি হেসে শুধু বলেছিলেন, "দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ দেখ্‌ছি। মামারবাড়ীর মনটা পেয়েছে'। যাক্, তুই চা ছাঁক, আমি মোহনভোগটা আর একটু নেড়ে নামাই।"

সরসী ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে বললে, "আমি করছি, তুমি গল্প করগে। হ্যাঁ, আর সিন্দুক থেকে ক'টা সুপুরী বার করে রেখে যেও, পান সাজতে হবে ত'।"

সুবর্ণ বলে, "একা পারবি কেন, আমি খাবারটা নিয়ে যাই তুই চা নিয়ে আয়।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ তুটো প্লেটে মোহনভোগ নামে সুজি সেদ্ধটা সাজিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বড়ঘর থেকে যোগেন হাঁক দেয়, "কৈ গো—মিষ্টিমুখ কি মুখ দেখিয়েই সারতে চাও নাকি?"

হো হো করে হেসে মানিক বলে, "শুনছ সন্ন বৌদি? যোগেনদার কথা?" সুবর্ণ হাসি চেপে জবাব করে: "বুড়ো বয়সে কথায় রং এসেছে।"

আট

মাস দুই পরের কথা। সরসীর চুল বাঁধতে বাঁধতে সুবর্ণ বললে, "এ
বড় মেলা এখানে আর হয় না। দেখবি রায় বাবুদের ঠাকুরবাড়ী
ঢাকায় কখন যাসনি ত'; এবারে ঘুরে সব দেখাব।"

সরসী মাথার কাঁটাগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে কি যেন ভাবে
তারপর ফিক্ করে হেসে বলে উঠল, "তোমার ঠাকুরপো কি বলছি
জান? রাসের মেলাতে ওখানের কে বলে এক জমিদার, মেয়ে-বে
চুরি করে। তাই, মানিক ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিচ্ছে।"

সুবর্ণ হেসে ফেললে সরসীর ছেলেমি কথায়। বললে, "দূর ঠাট্টা ক
বলেছে। তবে আগে, সত্যি বলে এরকম হ'ত। ওঁর মুখে শুনেছি
কিন্তু এখন এসব হবে কোত্থেকে?" কথার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ সরসী
খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে থাকে দ্রুত হাতে।

ও ঘর থেকে যোগেন বলে, "আর দেরি করোনা সকাল সকাল নৌকে
করে বেরিয়ে পড়লে ফিরতে সুবিধে হবে।"

"এই সাত-সকালে যাচ্ছে কে?" সুরেন এসে দাঁড়ায় স্নান সেরে ভি
কাপড় হাতে উঠানে।

সুবর্ণ নিজের মাথায় চিরুণী চালাতে চালাতে সহাস্যে বললে, "সা
সকালে যদি না যাই তবে শহরটা দেখব কেমন করে? তুমি চট্প
খেয়ে নাও। এই সরী, যা ভাত দে শীগ্গির।"

সুরেন হাতের ভিজে ধুতিখানা সরসীর হাতে দিতে দিতে বড় ভাইয়ে
কান এড়িয়ে বলে, "কি গো, বেশ যে সাজটা দেওয়া হয়েছে। মতলব
কিন্তু যাই কর আমাকে ডুবিয়ে দিও না। সাধে কি মানুকেটাকে

ঙ্গে নিচ্ছি।" সুরেন সহাস্যে সরসীর চুলটা টেনে দেয়। কৃত্রিম ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সরসী ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় শাসায়, "দিলে তো চুলটা নষ্ট করে? আমিও তোমার ফর্সা জামার কি করি দেখো।"

কপোত-কপোতীর কূজনটা একটু রয়ে-সয়ে করলে, আর দু'চারজনের মেলায় যাওয়ার সুবিধেটা হয়।"

এসে জুটেছ? কোথায় বললাম চল্ আমরা ক'জন দেখিগে, না, জুটিয়ে আনলে রাজ্যের লোক।" সুরেন মানিকের দিকে ফিরে বলে: "যা দাদার কাছে বস্ খেয়ে নিই।"

মানিক হাসতে হাসতে বললে, "চিঠি লিখে যদি কেউ রাস দেখাবার জন্যে কলকাতা থেকে টেনে আনে, হুকুম মানতেই হবে।"

ঝঙ্কার দিয়ে সুবর্ণ বলে: "কাকীমা বলেছেন বলেই ত' লিখেছি, নইলে তোমার মত দারোয়ান আমরা চাইনা।"

কি আর করা, তবে তোমরা যাও আমি দাদার সঙ্গে গল্প করি ততক্ষণ। কি সুরেনদা, পাড়ার অবলাগুলিকে একা নিয়ে যেতে তুমি পারবেনা?" মানিক কথার শেষে বারান্দায় উঠে দাঁড়োয়।

সুরেন রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, "আমার অত গোয়াল তাড়িয়ে এগুলোকে নিয়ে যাবার সময় নেই। তুই হুজুক তুলেছিস, নিয়ে যা তুই নিজে। মেয়ের পাল আর গরুর পাল একই, যত হাঙ্গাম!"

সুবর্ণ চোখ পাকিয়ে ধমকে ওঠে, হাসি চেপে বলে, "আসপর্দ্ধা বড্ড দেখছি যে! এই গরুরা না থাকলে সংসারের হাল-চাষ আর হ'ত না।"

যোগেন রহস্য করে ঘরের ভিতর থেকে বলে, "রাখালও আবার তেমনি পাকা না হ'লে গরু চরান যায়না।"

মানিক হেসে উঠল সুবর্ণর দিকে চেয়ে, বললে, "এখন কি করবে? সকলেই এক মত হচ্ছে কিন্তু। তা সুরেনদা মন্দ বলেনি, মেয়েদের কাজ মানেই একটা ঝঞ্ঝাট। সারাক্ষণ রাস্তায় হৈ হৈ করে তাড়িয়ে

সবকটাকে গুনে গুনে নৌকোতে তুলতে হবে, ট্রেনে তুলতে হবে। তার মধ্যেও হয় ত' একটা-আধটা হারিয়ে যাবে। মা গুলিতো আবার ছাগুলিকে সঙ্গে নেবেন দয়া করে। ঐ গুড়গুড়ে রেজিমেণ্টটিকে আমি ভীষণ ভয় পাই।"

সুবর্ণ বলে: "যাচ্ছি ত' ক'টা বড় মানুষ, গুড়গুড়ে পাচ্ছ কোথায়? কাকীমার সঙ্গে যাচ্ছেন, রাঙ্গা ঠানদি, নতুন খুড়ী আর এদিকে আমরা দু'জন, মাণ্টার মা আর মাতুঠাকরুণ।"

"আরে সব্বনাশ ওঁকে আবার কেন? জ্বালাবে সারা রাস্তায়!" যোগেন নিজের মনেই মাথা নাড়ে কথাও শেষে। তারপর মানিকের উদ্দেশ্যে সহাস্যে বলে, "একবার জন্মাষ্টমীর মিছিলে মাতঙ্গিনী ঠাকরুণ আমাকে আচ্ছা জ্বালা জ্বালিয়ে ছিল; আজ আছে তোমাদের কপালে।"

মানিক ঠোঁট বাঁকিয়ে ঔদাস্যের স্বরে বলে, নৌকো থেকে বুড়ীকে তাহলে পদ্মাতেই নামিয়ে রেখে যাবো। আমার কাছে টাঁ-ফোঁ চলবেনা।

সুবর্ণ তাড়া দেয় সুরেনকে, "আর গল্প করে ভাত খেতে হবেনা, ওঠ তাড়াতাড়ি। এরপরে আমরাও খাবতো!" খুশিতে হাল্কা পায়ে সুবর্ণ বহু দিনের জীর্ণ ঢাকাই শাড়ীখানা আজ পরে, রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সরসী ব্যস্তহাতে স্বামীর এঁটো পাতে নিজের জন্য ভাত বেড়ে বসতে বসতে সুবর্ণর উদ্দেশ্যে বলে, "তুমি এক গ্লাস জল নিয়ে বসো দিদি।"

সুবর্ণ পিঁড়িতে বসে ভাত-বাড়া থালাখানা টেনে নিতে নিতে হেসে বললে, "অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয়নি। বেশ লাগছে আজ, নয় রে?"

সরসী মুখের গ্রাসটা সামনে নিয়ে বললে, "কোন সকালে উঠেছি, কাল রাত্রে ঘুমই হয়নি মেলা দেখবো এই আনন্দে। কাকীমার বাপের বাড়ীতে সত্যি যাবে নাকি?"

সুবর্ণ একটু ভেবে বললে, "দেখি শেষ পর্য্যন্ত কি হয়। মানিক ত' জেদ করছে।

সরসী বড় বড় গ্রাসে ভাতগুলো কোনরকমে তাড়াতাড়ি খেয়ে, বাসনের পাঁজাটা হাতে তুলে উঠে দাঁড়ায়। বললে, "তুমি এঁটো তুলে নিও, আমি পুকুরে যাচ্ছি।"

সুবর্ণ বলে, অতদূরে না গিয়ে, খিড়কীর পুকুরে যা চট্ করে আসতে পারবি।"

সরসী নাকটা সিঁটকে বললে, "রক্ষে কর তোমার খিড়কীর পুকুর! সাধে কি বড় পুকুরে যাই, ওখানে বসলেই ব্যাং লাফিয়ে পড়ে গায়ে মাথায়। না না, আমি যাব, আর আসব।"

মানিক কোন ফাঁকে যে রান্না ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সরসী খেয়াল করেনি। এখন ফিরতেই মানিককে দেখে হেসে বললে, "দিদির কথা শোন, আমায় বলছে কি ঐ ব্যাং-সাগর থেকে বাসন মেজে আনতে। কিরকম জলটা, পচা গন্ধ না?"

মানিক রহস্য করে বলে, "এবারে সুরেনদাকে দেখছি পুকুর কাটতে হবে। গিন্নীর গন্ধ লাগে জলে।"

"পুকুরটা ত' আর চক্রবর্ত্তীদের নয় যে কাটান হবে! যাদের পুকুর তারা কাটালেই ত' পারে। তাহ'লে আর দূরে যেতে হয় না, কি বলো দিদি?" আনন্দে উচ্ছল ভঙ্গিতে সরসী মানিকের পাশ দিয়ে, বাসনের গোছা হাতে ঘাটের পথে এগিয়ে যায়।

সুবর্ণ পিছু ডেকে বলে, "বেশী দেরি করিসনে। ঠাকুরপো কিন্তু নৌকো ডাকতে গেছে।"

"দাঁড়াও ঘাড়ে চাড়া দিয়ে আমি দাঁড়াচ্ছি। পুকুরে নাবলে বৌটির আর ওঠার নাম নেই।"

"যা বলেছ! গতজন্মে সরী বোধহয় পানকৌড়ী ছিল। যাও ত' ভাই তাগাদ দাও গে, আমি ততক্ষণ এঁটো পরিষ্কার করি।"

মানিক ঘাটের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে সরসীকে একটু লক্ষ্য করে দেখে,

তারপর চেঁচিয়ে বলে, "নৌকো আসছে, শীগগির। দেরি হলে ফেলে যাব কিন্তু।" মানিক দু' সিঁড়ি নেমে দাঁড়ায় কথার শেষে।
"ইস্, ফেলে রেখে যায় সব!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সরসী এক ঝাপটা জল মানিকের চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।
"তবে রে, দেখাচ্ছি শয়তানি!" বলে, মানিক তড়বড়িয়ে সিঁড়ি নেমে একেবারে সরসীর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখটা নিচু করে জলগুলো সরসীর আঁচলেই মুছে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, "শোধ—।"
"উঃ ভারী ত' শোধ করলেন! আমি যেন কাপড়টা আর বদলাবনা ভেবেছে!" সরসী স্মিতমুখে বাসন ধুতে থাকে দ্রুত হাতে।
মানিক চট্‌করে চতুর্দ্দিকটা একবার দেখে নেয়। তারপর পকেট থেকে ক'টা টাকা বার করে সরসীর আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে, "তোমার খুশিমত কিছু কিনো, কেমন?"
সরসী টাকার ব্যাপারে কেমন একটু দ্বিধাবোধ করে। অপ্রতিভ গলায় বললে, "টাকা দিয়ে আমি কি করব? ও তুমি খুলে নাও ভাই আর দিদিই বা কি ভাববেন?"
"দিদি কি দেখতে আসছেন? আর ভাববারই বা কি আছে? আমার যদি তোমাকে দিতে ইচ্ছে করে, দিতে পারবনা নাকি?" মানিকের জোরাল যুক্তির উপর সরসী কিছু বলতে পারে না যদিও, কিন্তু কেমন যেন ম্লান হয়ে যায় তার মুখটা। মানিক আবার বলে, "বুঝেছি আমাকে তুমি পর ভাব, বেশ নিওনা তবে।" কথার শেষে মানিক সত্যিই সরসীর আঁচল থেকে টাকাটা খুলে নিচ্ছে দেখে, হঠাৎ সরসীর মনে হ'ল কথাটা বোধ হয় রূঢ় হয়ে গেছে এবং মানিক খুব দুঃখ পেয়েছে, কাজেই এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তার হাস্যোজ্জ্বল মুখটা। নিজের উপরই রাগ হয় সরসীর। তাদের জন্য যে এত টাকা ব্যয় করছে, তাকে একটু খুশি করা কি তার দিক থেকেও কর্ত্তব্য নয়? যদি পরের মতই সে তাদের ভাবত'

তবে এত টাকা কেন দেবে সে ? মানিকও যে চায়, তাকে সবাই স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরুক। একদিন এমনি কথাই যেন সে বলেছিল। নিজেকে আর সরসী সামলাতে পারে না। মানিকের মন থেকে নিজের ব্যবহারটা মুছে দিতে সরসী বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলে ওঠে, "তোমাকে পর ভেবে দূরে রাখার ক্ষমতা যে তুমিই কেড়ে নিয়েছ ভাই ! সত্যি, তুমি দুঃখ পাবে বুঝলে কক্ষনো ও কথা বলতাম না। যেমন বেঁধে দিয়েছিলে ঠিক তেমনি করে বেঁধে দাও খুলে নিতে হবে না।—বাবারে, কি অভিমান !" সরসী হাসতে থাকে মানিকের মুখের দিকে চেয়ে। তারপর বাসনগুলো দ্রুত হাতে আবার মাজতে মাজতে বলে, "তোমার ঠিকানা-লেখা খামগুলো বিছানার তলায় রেখেছিলে ত' ? নইলে উনি কিন্তু মেরে দেবেন। ওঁর চোখের আড়ালে না রাখলে সুবিধে হবে না।"

মানিক সহাস্যে বলে, "বুদ্ধিতে আমার সঙ্গে সুরেনদা পারবে না। তোমার বাক্সের ঢাকনার তলায় গুঁজে রেখে এসেছি। সেই সেদিন যেমন একটা জিনিস রেখেছিলাম !"

খুশির স্বরে সরসী বলে উঠল, "ভারী চমৎকার গন্ধটা ছিল কিন্তু, তোমাদের বাগানে ফোটে বুঝি ?"

"আজও একটা এনেছি এসো খোঁপায় পরিয়ে দিই।" মানিক সরসীর মাথার কাপড়টা খুলে একটা লাল গোলাপ ফুল পকেট থেকে সন্তর্পণে বার করে পরিয়ে দিতে দিতে বললে, "ঐ নৌকো আসছে, শীগগির !" হেসে সরসী বলে, "আরে, দ্যাখো ! দিদি, মাণ্টার মা, ঠানদি, বুড়ো বটতলার ভাঙ্গা মন্দিরে। একেবারে যেন লাফ্ মেরে নৌকোতে উঠবে এমনি করে সব দাঁড়িয়ে আছে।" কথার শেষে তাড়াতাড়ি সরসী বাসনের গোছা হাতে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় খোলা মাথায়। লাল টকটকে গোলাপ ফুলটা কাল চুলের মাঝখানে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন

সকালে কেমন যেন মরাটে দেখাচ্ছে। মানিক ঘাটের পথ ঘুরে নৌকার জন্য খালের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে সুরেনকে ডাকে, "ও সুরেনদা, মন্দিরের দিকে নৌকোটা ভিড়ুতে হবে, যাত্রীর ঐ দিকেই দল গেঁথেছে।"

নৌকা থেকে সুরেন চিৎকার করে বলে, "আমি কাকীমাকে ওখান থেকে ততক্ষণ তুলে নিই। তুই দাদাকে বলে আয়।" সুরেনের নৌকা কথার সঙ্গে সঙ্গে খালের পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায় মুহূর্তে মানিক হাস্য মুখে ভাঙ্গা মন্দিরের চত্বরে দাঁড়াল। তিনটি নারীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বললে, "তোমরা ঐখানেই থাকো, নৌকা এখুনি ফিরছে মাকে নিয়ে! আমি, সরী বৌদি ওদিক দিয়ে ঘুরে আসছি।" মানিক লম্বা লম্বা পা ফেলে আম বাগানের ভিতর দিয়ে নাপিত্র বাড়ীর উঠানে গিয়ে দাঁড়ায়, ব্যাপারটা ঘনিয়ে ওঠার অনেক আগেই।

নয়

মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা! এরই মধ্যে একটা পরিবারের আবহাওয়া যে এমন ভাবে কি করে বিষিয়ে যেতে পারে, আজও সরসী তা বুঝে পায়না। গ্রামে কান পাতা যাচ্ছেনা, বিশ্রী কদর্য্য একটা ইঙ্গিত সরসীকে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে। ঘরে ঘরে আজ মানিক আর সরসীর নাম জড়িয়ে যে কলঙ্কবার্ত্তা উঠেছে, তাকে রোধ করতে কেউই গিয়ে যাচ্ছেনা; বরং রসান দিয়ে কথাটাকে আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্বর্ণ গম্ভীর হয়ে গেছে, অমন যে স্নেহপ্রবণ যোগেন, সেও আর সরসীকে ডাকেনা। সুরেন তাদের মেলা দেখে ফিরে আসার পর থেকে আর বাড়ী আসছেনা, কিন্তু কি করেছে সরসী? প্রশ্নহীন একটা চাপা আন্দোলন, আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে। ঘরের বেড়াটা কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে বাইরে থেকে কে কেটেছে, তার দণ্ড নেবে সরসী! কিন্তু সত্যিই কি, সে মানিককে ঐ পথ দিয়ে আহ্বান করেছে? সারা মন ঘৃণায় ক্রোধে জ্বলে ওঠে। পরের হিত করার অপরাধে মানিকও এদের কাছে আজ অপরাধী। অথচ, এই মানিকের সঙ্গে অবাধে মেশার জন্য স্বর্ণ তাকে একদিন অনুরোধ করেছিল, মানিকের চরিত্র সম্বন্ধে জোরাল প্রশংসাপত্র রচনা করেছিল, আর আজ? তাকে চোরের সঙ্গে তুলনা করে মেলা দেখার দিন যতটুকু অপরাধে অপরাধী করেছিল, তাকে ঘোরাল রং টেনে গ্রামে গ্রামে কথাটাকে ছড়িয়ে দিল। সরসীর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে! কুৎসিৎ কদর্য্য রুচির মানুষগুলোকে ইচ্ছে হয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। যারা মানুষকে বিশ্বাস করেনা, যারা শুধু হীনতার দিকেই দৃষ্টি মেলে বসে থাকে, সরসী কি করে তাদের বোঝাবে?

দোষ দেবার আগে অন্ততঃ সুবর্ণও কি তাকে একবার বিচার করে দেখবেনা? এখনও যদি সে এসে সরসীকে বুকে টেনে সকলের মুখের উপর বলে, 'না কক্ষণ আমি বিশ্বাস করি না' তবে সুরেন কি তাকে ঘরে নেবেনা? কি, কি দেখেছে তারা? সরসী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাগে, দুঃখে, অপমানে অন্ধ হয়ে। সুবর্ণকে আজ সে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করবে, কি অপরাধে সে সমাজচ্যুতা হয়ে মামার কাছে ফিরে যাবে। এটা তারও শ্বশুরের ভিটে, অধিকারে একছিটে কারো থেকে সে কম নয়। রীতিমত সকলের কাছে বিচার করে দেখিয়ে দেবে একটা মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে অসহায় একটি বৌকে নির্য্যাতন করা, সহজ নয়।

সরসী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে উঠানের মাঝখানে পড়ার ক'টি মেয়ে বৌকে দেখে! একদিন যারা তার অন্তরঙ্গ ছিল, আজ তারাই এসেছে তার কলঙ্ক কাহিনীকে রং দিয়ে আরও বিচিত্র করে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিতে। সরসী স্পষ্ট শুনতে পেলে, "—মাধুরী বলছিল, মানিক বলে রোজই রাতে আসত। সেদিন উঠোনে আর একটু হলে ধাক্কা লাগত।"

"মাধুরী ছোট্ট মেয়ে, ও আর কি বলবে মাণ্টার মা, আমি অনেকদিন আগেই মাতঙ্গিনী ঠাকরুণের মুখে শুনেছি। এখন সত্যি হ'ল দেখছি!" মোহিনী ভচ্চাযের স্ত্রী কথার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

"মাগো মা, এমন কাণ্ডও যে হতে পারে ভাবিনি। ছোঁড়ার টাকা আছে, কেউ কিছু বলবেনা ভেবেছিল। কিন্তু সমাজ তো টাকায় বশ হবেনা।"

সরসী আর কিছু শুনতে পায়না। পাড়ার মধ্যে যার নিন্দার কথা বিয়ের রাত থেকে সে শুনেছে, সেই লাবণ্য, সরসীর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছে। ঘৃণায় অপমানে সারা দেহ মন বুঝি অবশ হয়ে আসছে। ওদের ঐ হাসির চাপা আওয়াজটা শিরশিরে বাতাসের

মত সরসীর গায়ে কাঁটা তুলে দিচ্ছে, স্নায়ুগুলো অসাড় হয়ে যাচ্ছে সরসী আর দাঁড়াতে পারছেনা। পা' দুটো চৌকাঠের ভিতরেই দুমড়ে ভেঙ্গে পড়ল যেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সরসী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সুবর্ণ এতক্ষণ রোদে পিঠ দিয়ে চুপ করে বসেছিল। সে নিজেও বোধ হয় ভেবে পাচ্ছে না, এমন করে সংসারটা ভেঙ্গে গেল কেন? মানিককে বিশ্বাস করেছে বলেই সরসীকে সে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই বিশ্বাস কে নষ্ট করলে! সরসী, না মানিক? দু'জনকেই সে ভালবাসে, বিশ্বাস করে, কিন্তু তার বিশ্বাস, ভালবাসা আজ যে ভাবে নাড়া খেয়েছে সেখানে কোন ভরসাই আর নেই। নিজের চোখে সে দেখেছে খোঁপায় ফুল পরিয়ে দেওয়া, আঁচল দিয়ে মুখ মোছা, এর উপর কি প্রতিবাদ সুবর্ণ করবে? গ্রামের ঘরে ঘরে এই কলঙ্ক-কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কাহিনীর শেষ! সরসীর মামাকে আনতে গেছে অনন্ত ঠাকুর। যদিও বেশ বোঝা যাচ্ছে সে সরসীকে ঘরে নেবে না, তবু চেষ্টা করে দেখবে। সুরেন এখন পর্য্যন্ত মাথায় হাত দিয়ে মণ্ডপে বসে আছে। হঠাৎ সুবর্ণ কেঁদে ফেললো, মাণ্টার মা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "কাঁদিসনে সন্ন, যা হবার হয়েই তো গেছে এখন ওর মামা এসে নিয়ে যাক্।"

"হ্যাঁ, তারপর যা হয় হোক, ছিঃ ছিঃ ঘরের বৌ এরকম কাণ্ডটা করে! মানিকের আর কলঙ্ক কি; গেলি তো তুই নিজে।" মোহিনী ভটচাযের স্ত্রী মন্তব্য করে বাঁধ কাটা বেড়াটার দিকে চেয়ে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বলে, "বেড়াটা যে কাটা, এটা হঠাৎ কে ধরতে পারবে?"

"আর বলো কেন, আমি ব্যাং-সাগরে গেছি ক'টা কলমী তুলতে, দেখিকি হাঁ হয়ে আছে বেড়াটা, আর 'রানী ভবানী' চুপ করে বসে আছে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে। আমাকে দেখতে পাচ্ছে, তবু নড়ছেনা, চেয়েই আছে।" ন'খুড়ী কথা শেষ করে দ্রুত হাতে মালা ঘুরুতে থাকে। এত বড়

একটা হট্টগোলে, আজ স্নান-আহ্নিকে পর্যান্ত দেরি হয়ে গেছে। এখন কাছাকাছি বৌকে দেখে বললে, "ভাতটা চাপিয়ে দিয়েছ বৌমা?"

মাণ্টার মা শাশুড়ীর কথার জবাব না করে সুবর্ণর দিকে চেয়ে বললে, "আচ্ছা মানিক না, কাকীকে নিয়ে কলকাতা চলে গেল মেলা দেখার পর দিনই। তবে আসে কি করে?"

লাবণ্য কথায় ফোড়ন কাটে, "চিঠিগুলো খুঁজে দেখলেই সন্ধান পাবে কি চিঠি লেখা! ডাক পিয়ন ভুবন বলছিল, ভুর ভুরে সুগন্ধি দেওয়া সব খাম আসত সরসী দেবীর নামে। এতও জানে।"

সুবর্ণ ধমকে ওঠে: "তুই থাম দিকি।"

ঠোঁট বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ হাসি হেসে, মোহিনী ভটচ্চাযের স্ত্রী বলে, "ধমকে থামালে এখন আর চলবেনা! ঘন ঘন আসা, চা খাবার খাওয়া, অথর্ব্ব পঙ্গুটার চিকিৎসা করা, যাদব সরকারের চোখে ধুলো মেরে ভিটে ছাড়ান অনেক কিছুই জেনেছি এখন, ধরা পড়ে গেছ হাতে-নাতে।"

"নোংরা কথা নিয়ে আর ঘাঁটতে হবে না। মামী তুমি চলে এসো।" লাবণ্য বেশ একটু গর্ব্বিত ভঙ্গিতে হেলে, দুলে চলে যায়।

"চলে কেন যাবে! এই ভাবে সব অন্যায় করবে আর চুপ করে যাব কিসের জন্যে। সমাজে বাস করে না?" ন'খুড়ী চোখ পাকিয়ে সমাজের হুমকী মারে, সুবর্ণর একমুহূর্ত্তের ভুলটাকে মুঠোতে পেয়ে।

যোগেনের আর সহ্য করার বোধ হয় ক্ষমতা থাকে না, চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "বড় বৌ দোরটা বন্ধ করে দাও আমার আর শোনার ক্ষমতা নেই।"

সুবর্ণ তবু বসে থাকে পাথরের মত। যেন কোন কথাই সে শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ মণ্ডপে জোরাল একটা তর্কাতর্কির শব্দ শুনে, সকলেই কুৎসার-রসাল ইন্ধন দিতে ছুটে যায় মণ্ডপের দিকে। শুধু বসে থাকে সুবর্ণ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। যা হয় হোক্ ওখানে আর সে দাঁড়াবেনা।

বিশ্বাসের বাঁধ ভেঙ্গে কেউ যদি দণ্ড পায়, তাতে সুবর্ণ বাধা দেবে না।

কিছুতেই যখন সরসীর মামা সমাজচ্যুতা ভাগনীকে নিতে সম্মত হ'ল না তখন, সুরেন একটু ভেবে বললে, "অন্ততঃ দিন কয়েক রাখুন, কথাটা চাপা পড়ুক, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।"

"বাবাজী অত বোকা আমি নই। তোমরা মেয়েটাকে টাকার জন্যে নষ্ট করলে এখন ওকে ঘরে নিয়ে আমি জাত দিতে পারি না। পুজো-আচ্চা করে খাই, শেষে কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে ভিক্ষে করব? তোমাদের কাছে অগ্নি সাক্ষী করে মেয়ে সম্প্রদান করে দিয়েছি, এখন যা ভাল হয় নিজেরা কর।"

সরসীর মামাকে সায় দিয়ে পাড়ার আরও ক'জন কথাটাকে সমর্থন করে। বিশেষ করে রায় বাবুদের ছোট তরফের জমিদার দক্ষিণ পাড়া থেকে পুরাণ পাড়ায় এসে যখন মাতব্বর হিসাবে দাঁড়ায়, তখন সুরেন ভড়কে যায় যেন। যদিও দক্ষিণ পাড়ার সঙ্গে পুরাণ পাড়ার কোন সম্পর্কই নেই, তবু একদিন তারা গ্রামের জমিদার হিসাবে সকলের কাছে সম্মান পেয়েছে এবং তাদেরই কথার উপর গ্রামবাসীদের বাঁচা-মরা নির্ভর করত। সেই দুর্দ্দমনীয় প্রতাপশালী জমিদারের প্রপৌত্র ছোট তরফের ক্ষিতীশ রায়ের দিকে চেয়ে সুরেন দুর্ব্বল গলায় বলে, "তবে কি করব?"

মুচকে হেসে উদার গলায় ক্ষিতীশ রায় মন্তব্য করলে, "করার আর কি আছে! হয় সমাজ ত্যাগ করতে হবে, নয় স্ত্রী ত্যাগ! গাঁয়ের ভেতর এসব বেলেল্লা কাণ্ড করা যায় না ত'।"

"সে ত' বটেই! কিন্তু মানকের বাপ কি বলে এ বিষয়?" পুরান পাড়ার পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সুরেনের জ্ঞাতি জ্যাঠা, লাঠি ঠুক-ঠুকিয়ে মণ্ডপের সামনে এসে দাড়ান বিরাশী বছরের নুয়ে পড়া শরীরটা টান করে।

মোহিনী ভটচ্চায কথায় রসান কাটে: "সে আবার কি বলবে! আগে থেকেই ছেলেটিকে তেজ্য করে বসে আছে।—উঃ, রক্ত জলকরা টাকা, তার কিনা এই ব্যবহার!"

এতক্ষণ ক্ষিতীশ রায়ের গোমস্তা গায়ের চাদরটা মুড়ি দিয়ে কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নাজীর বাড়ীর ভিতর দিকটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিল। এখন কথার সূত্র টেনে বলে উঠল, "টাকার চেয়ে কি ছেলে বেশী হয়! যক্ষী বুড়ো ঠিক কাজ করেছে। তেজ্য করাই উচিত।"

ক্ষিতীশ রায় গোমস্তার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, "এত জ্ঞান কবে থেকে হ'ল।" গোমস্তা কথাটার ইঙ্গিত বুঝেই মাথা চুলকে বলে, "এখানে ও ঐ টাকা নিয়েই ত' যা কিছু ঘটার ঘটল। মাঝ থেকে এত বড় সম্মানী ঘরের কলঙ্ক গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে গেল। সত্যি, সুরেন না হয় এখানে থাকত না, কিন্তু যোগেনের ত' একটু বোঝা উচিত ছিল।"

সরসীর মামা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, "আপনারাই বিচার করুন টাকার জন্যে আমার ভাগনীর এত বড় সর্ব্বনাশটা করে এখন কিনা আমার কাঁধে চাপাতে চায়। উচ্ছন্নে যাবে সব!" সরসীর মামা রাগতভাবে মণ্ডপ থেকে নেমে যায়।

একটা মুহূর্ত্ত মণ্ডপের ভিতরে যেন স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সরসীর দিকে। চুলগুলো পিঠের উপর খুলে পড়েছে, একটু উঁচু করে শাড়ীটা পরা, আঁচলটা মাথার উপর অল্প টানা। দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে, সে স্থির চোখে চেয়ে আছে ক্ষিতীশ রায়ের গোমস্তার দিকে। ক্রমাগত এই লোকটাকে তিন চার দিন ব্যাং-সাগরের কাছে ঘোরা-ফেরা করতে সে দেখেছে। সরসীর চোখের ভিতরটা জ্বলে উঠল যেন। কিন্তু আর প্রতিবাদের বোধ হয় ইচ্ছা থাকে না, তাই শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় সুরেনের সামনে। বেলা পড়ে এসেছে, অভুক্ত অস্নাত অবস্থায় সুরেন তখনও মাথায় হাত

দিয়ে বসেছিল। এই দিন কয়েক ধরে যে আন্দোলনটা সরসী এবং মানিককে নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে পাক খেয়েছে, দূর বিদেশে থেকেও সুরেন তাকে এড়িয়ে থাকতে পারে নি। শেষ পর্য্যন্ত আজ তাকে লোক দিয়ে ধরে এনে পাড়ার অভিভাবকেরা দেখিয়ে দিলে সরসীর হীন প্রবৃত্তিটা স্বামীর আড়ালে মানিককে নিয়ে গোপনে যে পাপ সে করে চলেছে, তারই যেন সাক্ষী স্বরূপ কাটা বেড়াটা এখনও সে দেখতে পাচ্ছে। পড়ন্ত রোদের আলো কাটা বেড়ার ফাঁকে বুঝি আটকে পড়েছে। সুরেন চোখ ফিরিয়ে নেয় সেদিক থেকে। তারপরেই হঠাৎ চমকে সোজা হয়ে তাকায় সরসীর দিকে। প্রশ্ন হারিয়ে গেছে, শুধু বিভ্রান্ত দুটো চোখ সরসীর মুখের উপর স্থির ভাবে এঁটে বসে।

সরসী স্বামীর দিকে এগিয়ে এসে অবিচলিত গলায় জমাটবাঁধা স্তব্ধতা ভেঙ্গে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "তুমিও কি এদের দলে?"

সুরেন থতমত খেয়ে প্রত্যেকের মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকাচ্ছে দেখে সরসী জোরে বলে উঠল, "ওদের কথা আমি শুনতে চাইনা, তোমার কি বিশ্বাস আমি—" সরসী কেঁদে ফেললে বলার সূত্র হারিয়ে। ঘরের ভিতর উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ, নিস্পন্দ নির্বাক মানুষগুলো অকস্মাৎ সজীব হয়ে ওঠে। যেন সরসীর চোখের জলে নতুন করে আবার প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছে। মাথা দুলিয়ে বৃদ্ধ জ্ঞাতি জ্যাঠা সুরেনকে বলে, "যা বলার বলে দে, এসব চোখে দেখলেও পাড়ার অমঙ্গল।"

ক্ষিতীশ রায় একটু পাশ কেটে বসে, সরসীর সজল মুখটার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে হারানের দিকে চেয়ে ফিস ফিসে গলায় বললে, "বাঁদরের গলায় কি মুক্তোর মালা সাজে? মানকের দোষ দেওয়া যায়না।"

হারাণ মনিবের রসাল উক্তির জবাবে শুধু হাসে, গোমস্তার দিকে চেয়ে। তারপর সুরেনকে লক্ষ্য করেই বললে, "এখানে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা উঠতে পারে না। একেবারে সাক্ষাৎ জিনিসকে কি করে অস্বীকার

করবেন চক্কোত্তি মশাই! আমরাও গাঁয়েরই লোক, পেটের দায়ে না হয় এখন জমিদারের চাকরী করছি। কিন্তু, তাই বলে এসব কাণ্ড কখন দেখিনি।"

"কাণ্ড বলে কাণ্ড! এখন এসেছে স্বামীকে ভুলিয়ে জাতে উঠতে! রূপ কি আর কোন মেয়ের নেই?"

ক্রুদ্ধভাবে সরসী ভ্রূকুঁচ্‌কে মোহিনী ভটচ্চাযের দিকে তাকায়। পরে দাঁতে দাঁত চেপে স্বামীকে বলে, "কি, চুপ করে আছ যে? বলো, স্পষ্ট করে বলো—এসব ইতরামী আমি সহ্য করতে পারছিনা।" উত্তেজনায় সরসী হাঁপাতে থাকে ঘরের একটা চুন বালি খসা থাম ধরে।

সুরেনের মুখ থেকে কোন কথা বার হচ্ছে না দেখে ক্ষিতীশ রায় নড়ে-চড়ে বসে বললে, "বুঝলে হে ভায়া, মেয়েটি পাকা ঘুঁটি-ছেড়ে দিলে চরে খেতে পারবে। মাঝ থেকে তুমি কেন জাতটা দাও! শত হলেও ব্রাহ্মণ, যবনের এঁটো জিনিসে লোভ করোনা।"

"যবন?" সুরেনের শুকিয়ে যাওয়া গলা দিয়ে কথাটা যেন ছিটকে পড়ে অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে আজও ভগ্ন দেহে দাঁড়িয়ে থাকা নাজির বাড়ীর বড় বড় খিলেন দেওয়া মণ্ডপ-ঘরের মেঝের উপর।

"তাই ত' শুনছি, কে বলে দেখেছে আবছা অন্ধকারে মুসলমান পাড়ার দিকে লোকটাকে দৌড়ে যেতে। কপালে শেষ অবধি এটাও দেখতে হ'ল।" সুরেনের জ্ঞাতি জ্যাঠার আক্ষেপের উপর টিপ্পনী কাটে মোহিনী ভটচ্চায, "বেঁচে থাকলে অনেক কিছুই দেখতে হয়।"

সুরেন আর চুপ করে না থেকে বলে, "জ্যাঠামশাই আমার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? যা করার বলে দিন। আমি এমন দুশ্চরিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারিনা। বংশ মর্য্যাদার চেয়ে একটা নারীর মূল্য আমার কাছে বেশী নয়। ছিঃ ভাবতেও ঘেন্না লাগছে!"

সরসীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে আবার। মিথ্যার উপর মিথ্যা দিয়ে কথায়

কথায় রং পড়ছে ক্রমাগত। সে কারো কথার প্রতিবাদ করেনা, শুধু সোজা হয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে অকম্পিত স্বরে বলে, "এই কি তোমার শেষ কথা?" সরসী স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে মানুষটাকে বুঝি চিনতে চেষ্টা করছে। এই সামান্য ক'দিন আগে যাকে সরসী দেখেছে, সেই মানুষটির সঙ্গে আজকের সুরেনের যেন কোন মিল পাচ্ছে না। কেমন একটা অচেনা অপরিচিতের মত মনে হচ্ছে। বুকের ভিতরে অভিমানের একটা ঝড় উঠে সরসীর জ্বলে-ওঠা দৃষ্টিটা ঝাপসা করে দিতে চাইছে। ঠোঁটটা সজোরে কামড়ে সরসী নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। যেন আসন্ন একটা প্রলয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ আশ্রয়টাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে।

সুরেনের দুর্ব্বলতার সুযোগ বুঝে আত্মীয়তার সুরে ক্ষিতীশ রায় বলে, "আর কিছু ভাবভাবির কাজ নেই, কাশীতে পাঠিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক্।"

সোৎসাহে জ্যাঠা বলে, "হ্যাঁ, সেই ভাল! ঘরের কলঙ্ক নিজেদেরই মুছতে হবে। ভাড়ার জন্যে ভেবনা, চাঁদা তুলে আমরাই না হয় টাকা যোগাড় করে দেব।"

সুরেন হাসবার চেষ্টা করে বললে, "আমাদের কিছু ব্যবস্থাই করতে হবেনা জ্যাঠামশাই, মানিক সন্ধ্যে নাগাত এসে হাজির হবে। এই দেখুন চিঠি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন ঘৃণায় বিরক্তিতে মুখটা কুঞ্চিত করে সরসীর গায়ে একটা খাম খোলা চিঠি ছুঁড়ে মারে।

যে চিঠিখানা সরসী সযত্নে নিজের বিছানার তলায় রেখে মানিকের জন্য পথ চেয়েছিল এই কিছু আগেও, সেই চিঠিটা হঠাৎ সুরেনের হাতে দেখে এক মুহূর্ত্ত চমকে উঠল। কিন্তু তারপরই নিজেকে সামলে নেয়। একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ভিতরে নিরপরাধ দুটি জীবনকে এভাবে জড়িয়ে যারা শাস্তি দিতে পারে, তাদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সে মুক্ত করে

ফেলবে এই মুহূর্ত্তে। মানিকের মধ্যস্থতায় ভাঙ্গা ঘর আর জোড়া লাগবেনা। এদের বাতাসে যেন সরসীর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে!
যাকে সরসী শ্রদ্ধা করেছে, ভাল বেসেছে, জীবন-মরণের সাথী, স্বামী বলে এই একটু আগেও মনে অনেকখানি সাহস নিয়ে এখানে দাঁড়াতে পেরেছে, সেই পরম আত্মীয় মানুষটিকে হঠাৎ সরসীর চোখে মনে হয় বুঝি মূর্ত্তিমান একটা শয়তান, চোখে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে লুকুতে চেষ্টা করছে। ঘৃণায় ক্রোধে সরসীর নাকের পাশ দুটো কুঁচকে উঠল, মুখে ধারাল একটা চাপা হাসি খেলে গেল। সরসীর বিশ্বাসের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়েছে।
তিক্ত মন্তব্য করে সরসী: "এখন মনে হচ্ছে সত্যি আমি অমানুষের হাতেই পড়েছি। স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে পাড়ার লোক এসে বিচার করবে? ছিঃ, ঘৃণা হচ্ছে তোমাকে স্বামী বলে মেনে নিতে।" মুহূর্ত্তে যেন সরসী মাটি কাদা দিয়ে গড়া প্রাণহীন কুৎসিৎ পুতুলটাকে দেবতার আসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত একটা উল্কা পিণ্ডের মত ছুটে আম বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেখানে বিশ্বাস নেই, যেখানে ভরসা নেই, সেখানে আর একটা মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারবেনা সরসী। এত দিনের আঁকড়ে-ধরা কল্পনার রং ঢালা এতবড় আশ্রয়টার ভিতরে ভিতরে যে ফাটল ধরেছে, আগে ভাবতেও যে পারেনি কখনো! মনে ভরসা ছিল গ্রামের সমাজ তাকে গ্রহণ না করুক, শ্বশুরের ভিটে থেকে সুবর্ণ সরিয়ে দিক, তবু সে বেঁচে থাকবে স্বামীকে আশ্রয় করে। সুরেন কখনো সরসীকে অবিশ্বাস করেনা, করতে পারেনা বলেই ত' সরসী এতবড় বিপদে ধৈর্য্য হারায়নি। অপমানে ফুঁসে উঠেছে, দুঃখে চোখে জল এসেছে তবু যে বিশ্বাসের পাকা গাঁথুনির উপর নির্ভর করে সরসী চোখে একরাশ ভরসা নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখেছে, আজ সেই গাঁথুনীর আশ্রয়টা হঠাৎ যেন ভূমিকম্পের দোলায় ভেঙ্গে পড়ল সরসীর

চোখের সামনে। আর কোন বিচার সে চায়না। হীন মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষগুলোর কাছে নিজেকে যাচাই করানও যে অপমান!

ঘৃণায় সারা মন বিষিয়ে উঠ্‌ছে। স্ত্রীকে যে স্বামী বিপদে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না সে দুর্বৃত্তের চেয়েও হীন, পশুর চেয়েও অধম। এখন মনে হচ্ছে সরসী বুঝি সত্যিই কোন দুর্বৃত্তের কাছে অপমানিত হয়েছে। প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত স্বামীর আসনে বসে ঐ মেরুদণ্ডহীন জড় মনের পশুটা সরসীর অপরূপ লাবণ্য-তারুণ্যে ভরে-ওঠা সৌন্দর্য্য ভোগ করছে, পশুটার ঐ কুৎসিৎ লালসার ছাপ সরসী তার দেহের ভাঁজে ভাঁজে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতই যে সরসীর কাছে নিরপরাধ, সেই মানিক আজ গ্রামের লোকের কাছে তার জন্য দুশ্চরিত্র নাম নিয়েছে। হতে পারে, সুরেনের মত মানিক নিষ্ঠাবান, নীতিবাগীশ, নির্ম্মল চরিত্রের যুবক নয়, তবু সে তাকে অপমান করেনি, যে অপমান সুরেন নামে ঐ ভীরু কাপুরুষ জঘন্য মনোবৃত্তির মানুষটা সকলের চোখে আত্মগোপন করে সরসীকে অপমান করেছে, প্রবঞ্চনা করেছে তার সরলতাকে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু আজ আর কান্না আসছে না। অপমানের তাপে চোখের জলটা শুকিয়ে, চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

আমবাগানের মাথায় সূর্য্য ডুবে গেছে। ঘন অন্ধকার বনে শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আরও জমাট বাঁধা অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সরসী কান পেতে ষ্টিমার ঘাটের জোর বাঁশীটা শোনে। কিছুক্ষণ আগেও মানিকের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে হয়ে পথ চেয়েছিল, কিন্তু আর প্রয়োজন নেই। সরসী বিশ্বাস হারিয়ে, স্ত্রীর মর্য্যাদা, ভিক্ষা করে অর্জন করবে না। যেখানে দৃষ্টিটাই বেঁকে গেছে সেখানে দাঁড়াতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার। একবার মনে হ'ল সত্যিই সে মানিকের সঙ্গে চলে যাবে। যা মিথ্যা, তাই সত্যে পরিণত হয়ে উঠুক। কিন্তু, তারপরেই হাসি আসে, নিজের ভুল সরসী বুঝতে পারে। মিথ্যাকে রং দিয়ে আজ যারা সরসীকে অপমান করছে,

তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে সেও কি নিজেকে অপমান করবে? অন্তঃ পৃথিবীতে মানিক আর সে ত' জান্‌ছে সরসী কোন অন্যায় করেনি। ভালবেসেছে, স্নেহ করেছে, তাই বলে হীন দৃষ্টি দিয়ে সরসী তাকে কখন দেখেনি ত'! মানিক যে আসছে গ্রামের সমাজ থেকে তাদের দু'জনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে সুরেন-সরসীর ঘর বেঁধে দিতে। কিন্তু, সরসীর ঘর-বাঁধার মূলধনটাই যে হারিয়ে গেছে!

মানিক গ্রামে পৌঁছুবার আগেই, সরসী আম বাগানের ভিতর দিয়ে পা টিপে টিপে সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢেকে, জেলে পাড়ার পাশ দিয়ে পদ্মার দিকে এগিয়ে চলেছে। ক্লান্তিতে পা ভেঙ্গে আসছে, কিন্তু বিশ্রামের স্থান কোথায়? গ্রামের সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন সরসীর কাছে বিষাক্ত, শ্বাসরুদ্ধকারী মনে হচ্ছে।

ধীরে ধীরে শীতের রাত গভীর হয়ে আসছে, ক্রমশঃ গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ল চারিদিক স্তব্ধতায় ভারী থমথমে হয়ে উঠেছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের রাত কাল পাখা মেলে ছড়িয়ে রয়েছে। বাঁশবনের মাথার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে শীতের বাতাস দু'একটা ঝাপটা দিয়ে গ্রামটাকে যেন আরও অসাড় নিস্তব্ধতায় জমাট করে তুলেছে। সরসী শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে শ্মশানের উপর এসে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্ত গাটা বু ভারী হয়ে ওঠে, তারপরেই হাসি আসে!—ভয় আজও আছে? একটা কুকুর, শেয়ালের পিছনে তাড়া করে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। সরসী অন্ধকারে চোখ দুটো উজ্জ্বল করে একটু সময় চেয়ে থাকে, ক'দিন আগে যে চিতাটা হঠাৎ জ্বলে ওঠায় গ্রামের সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল, যার ভয়ে সরসী দিন-দুপুর পর্য্যন্ত ঘাটের দিকে যেতে ভয় পেয়েছে, আজ সেখানে দাঁড়িয়ে ভয় করছেনা। যেন ভয়-ভাবনার সীমানা ছাড়িয়ে আজ সরসী অনেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। জীবনের বন্ধনই যেখানে ছিঁড়ে গেছে, সেখানে আর কিছুতেই মন দুর্ব্বল হয়ে ওঠে না। এখান থেকে

গ্রামটা আর চোখে পড়ে না। ধূধূ করছে মাঠ, পাটক্ষেত, ধানের জমি পেরিয়ে গ্রামখানা কুয়াশার জলে জড়িয়ে গেছে। সরসী মুখটা ফিরিয়ে নেয় ঘৃণায়; তারপর, আবার চলতে থাকে পদ্মার দিকে। আশৈশবের সঙ্গিনী তাদের পদ্মানদী।

নদীর কিনারা ঘেঁষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সরসী। গ্রামের কোল বেয়ে ছুটে চলেছে সর্ব্বগ্রাসী পদ্মানদী। ক্ষুধার তাড়নায় দু'কূল ভেঙ্গে পাড়ের উপর বিপুল বিক্রমে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। একদিন এইখানে একটি গ্রাম ছিল, আজ সে চিহ্ন পদ্মার জলে তলিয়ে গেছে, তবু ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে আসছে সর্ব্বগ্রাসী নদী! বুঝি তীর ও তরঙ্গে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক, তাই ভাঙ্গনেরও শেষ নেই, তরঙ্গেরও শেষ নেই!

জলের ঘূর্ণির দিকে সরসী শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ভোরের আলো এসে পড়েছে ঐ ঘোলা জলের বড় বড় ঢেউগুলোর উপর। যেন কাল-সাপিনীর মত তরঙ্গের কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে পদ্মা নদী মাথা খাড়া করে উঠছে। শান্ত অপলক চোখে একটু সময় জলের দিকে চেয়ে থাকার পর সরসী ঘাড় ফিরিয়ে দূরে ঐ মিলিয়ে-যাওয়া গ্রামটার দিকে তাকায়। ঘুমের জালে গ্রাম এখন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সরসী অতি সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকায়। ভোর হয়নি, উষার স্নিগ্ধতায় আকাশ ঝক্‌ঝক্ করছে। সরসীর ভাল লাগে এই শান্ত স্নিগ্ধতা। ধ্যান-মৌন এই স্তব্ধ পৃথিবীর সঙ্গে সরসী মুখরিত পৃথিবীর কোন ঐক্য খুঁজে পায়না। বুঝি যুগ যুগ ধরে দুটো রূপের অনৈক্য চলে আসছে, আজ হঠাৎ সরসীর চোখে তা' ধরা পড়েছে। বিশ্বাসের ধোঁয়াটে দৃষ্টি মুছে, বন্ধন-মুক্ত মন দিয়ে সরসী আজ পৃথিবীকে ভাল করে দেখছে, বুঝতে চেষ্টা করছে! যদিও একটু পরেই এই স্নিগ্ধতা মুছে দিয়ে পূর্ব্বগগনে চির ভাস্বর মূর্ত্তিতে জ্বলে উঠবে প্রভাতের তরুণ তপন,

স্তব্ধতা ভেঙ্গে পাখীরা মধুর কাকলী তুলে জেগে উঠবে পৃথিবীর ঘু
ভাঙ্গিয়ে। কিন্তু সেই পৃথিবীর সঙ্গে সরসীর আর সম্পর্ক নেই!
সরসী পাড়ের উপর পা ঝুলিয়ে আনমনা ভাবে বসে থাকে। জলকে
কোনদিনই সে ভয় করে না। এমনি ভাবে কত দিন পদ্মার পাড়ে
শিশু বয়সে বসে থেকেছে জলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে। আজও ভাল
লাগে জলের খেলা দেখতে। প্রভাতের বাতাসে পদ্মা যেন দুলে দুলে
উঠ্ছে উল্লাসের তরঙ্গ তুলে। কখনো ঢেউ তুলে ছুটে আস্ছে, কখনো
ভেঙ্গে গড়িয়ে আবার দূরে ছুটে চলে যাচ্ছে। যেন দুরন্ত ছোট্ট একটি
মেয়ে কৌতুকে উল্লাসে নেচে নেচে উঠ্ছে। যেন অভিমানিনী প্রিয়া
অন্তরের অব্যক্ত ব্যাকুলতায় সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ছুটে এগিয়ে যেতে
চাইছে কোন এক দূর দূরান্তরে। সরসী কান পেতে মাঝে মাঝে শোনে
ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় খসে পড়ার ছপ্ ছপ্ শব্দ। আজ আর ঐ সর্ব-
নাশা ভাঙ্গনের শব্দে সরসীর বুকটা কেঁপে ওঠে না, কেমন একটু মাদ-
কতাই লাগে ঢেউয়ের প্রচণ্ড আঘাতে ভিতরে ভিতরে গুঁড়িয়ে যাওয়া
পাড়টার এই আত্মসমর্পণ করার শব্দটায়। ক'টা পাক খেয়ে জলের
ধাক্কায় মাটির চাঙ্গড়টা মুহূর্ত্তে পদ্মার অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে, তারপর
আবার ঢেউ ছুটছে হাল্কা গতিতে খুশির ফেনা মেখে দুলতে দুলতে।
আরামের আবেশে সরসীর চোখ জুড়ে আসে যেন। জলের উপর হেলে
পড়া জাম গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে সরসী পায়ের পাতা ভিজিয়ে
আরও এগিয়ে বসে পদ্মার মুখো-মুখী হয়ে। এতদিন সরসী তার
ডাগর দুটো চোখ মেলে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যই দেখেছে, কিন্তু ভাঙ্গনের যে
একটা সৌন্দর্য্য আছে, আকর্ষণ আছে, বুঝি আজই প্রথম সে অনুভব
করল। সরসীর ঠোঁটের কোণে মিষ্টি একটা হাসি ফুটে উঠল, সে
আরও একটু ঝুঁকে পড়ে জলের ভিতরে নিজের ছায়া দেখে।

দশ

"এখন কেমন আছ মা?" সরসীর মুখের উপর ঝুঁকে একজন সৌম্য-কান্তি বৃদ্ধ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

সরসী তাঁর কথার জবাব করেনা, শুধু ঘরের চতুর্দ্দিকে একটা বিহ্বল দৃষ্টি বুলিয়ে বিড় বিড় করে আপন মনে: "পাতালপুরী! মানুষের দেশটা ভাল না। উঃ, কি জঘন্য হীন মন সবার! ছিঃ ছিঃ এমন করে আমার নামে নিন্দে তুললে!" সরসী প্রলাপের ঝোঁকে হঠাৎ কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে।

নার্স তাড়াতাড়ি আইস ব্যাগটা বদলে, নতুন ব্যাগ সরসীর মাথায় চাপায়।

দীর্ঘ উনিশ দিন পরে, সরসী জ্বর-বিকারের হাত থেকে আরোগ্যের পথে এল। আজ তিন দিন হ'ল জ্বর নেই, মাথার সেই অসহ্য যন্ত্রণাটাও ছেড়ে গেছে, আর শরীর বেশ সুস্থ লাগছে। সরসী ভাত খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু নার্স ভাতের বদলে যখন বার্লিই নিয়ে এল, একবারে রেগে সে বিছানায় উঠে বসে সোজা হয়ে। নার্স রোগিণীকে উত্তেজিত না করে, শান্তভাবে বোঝাবার জন্য, বার্লিটা হাতে নিয়েই দরজার পর্দ্দাটা সরিয়ে চলে গেল দেখে, সরসী একটু সময় দরজার দোদুল্যমান নীল পর্দ্দাটার দিকে চেয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে একটা নীল আলো জ্বলছে, জানালা দরজায় নীল পর্দ্দা আঁটা, টিপয়ের উপর রুপোর ধূপদান থেকে ধূপের মিষ্টি একটা সুগন্ধ ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। বিরাট খাটের উপর উঁচু গদি-ওয়ালা বিছানায় বালিশ ঠেস দিয়ে বসে বসে সরসী ঘরের চতুর্দ্দিকটা দেখে, কিন্তু চিনতে পারেনা ঘরটাকে।

যে আবহাওয়ার সঙ্গে সে পরিচিত তার সঙ্গে কোন মিলই বুঝি সে খুঁজে পাচ্ছে না! এতদিন বাদে সমাজচ্যুতা, আশ্রয়হীনা চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছোটবৌ, হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে এমনিভাবে, সে ঘরের প্রতিটি জিনিস ভাল করে দেখে, ভাবতে চেষ্টা করে, সে কোথায় আছে। ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একটা ডিসে নানারকম ফল সাজিয়ে ঘরে ঢুকে সরসীর একেবারে পাশে বসে সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, "ভাত খাবে বৈকি মা! এই সবে মাত্র জ্বর ছেড়েছে, দুটো দিন দেখে তবে খাবে ত'। এখন এই ফল ক'টা খাও।" সরসীর মুখের কাছে কাচের ডিসটা তিনি এগিয়ে ধরেন, কথার সঙ্গে সঙ্গে।

সরসী জীবনে এত ফল দেখেনি, এবং অনেক ফল সে চিনতেই পারেনি বলতে হয়! তবু কমলা, বেদানাটা চেনে বলেই আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "তোমাদের দেশে কমলা, বেদানা পাওয়া যায়?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হেসে বললেন, "এখানে সব পাওয়া যায়, তুমি আগে খাও ত'।"

খুশি হয়ে সরসী আঙ্গুরের থোকা থেকে একটা আঙ্গুর তুলে নিয়ে বলে, "তোমাদের পাতালপুরীটা খুব ভাল। আমি আর মানুষের দেশে যাবনা।"

সরসী বারে বারেই যে ভুলটা করছে আজ সেটা বাধ্য হয়েই ভেঙ্গে দিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে একটু হেসে বলতে হয়: "এটা পাতালপুরী নয় মা, এটা মানুষেরই দেশ। তবে আমার বজরাটা ওখান দিয়ে না গেলে পাতালপুরীতেই বোধহয় যেতে!"

পাতালপুরী থেকে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণাবর্ত্তে সরসী যেন পৃথিবীর উপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল। স্বপ্ন ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে, ঘরের স্নিগ্ধতা চোখ থেকে যেন মুছে গেল। এতদিন যে অনুভূতি জ্বরের ঘোরে মৌন নিথর হয়েছিল, আজ বর্ত্তমানের স্পর্শে আবার জ্বালাময় হচ্ছে

ওঠে। রাগে বিদ্বেষে সরসী ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল, "আমাকে বাঁচাতে কে বলেছিল? এতবড় অপমানের পরেও কি আমাকে তোমরা ছেড়ে দেবেনা? কি করেছি তোমাদের আমি?" সরসী বিছানার উপর কেঁদে লুটিয়ে পড়ল বেঁচে ওঠার অসহ্য যন্ত্রণায়। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যে মিষ্টি একটা আবহাওয়া এতদিন সরসীকে আনন্দ দিয়েছে, নিস্তেজ প্রাণটাকে বাঁচিয়ে তুলেছে, আজ সব ভেঙ্গে-চুরে সরসীর কাছে মিথ্যা অলীক বলে প্রমাণ হয়ে গেল। সে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সরসীর অকৃতজ্ঞতায় রাগ করেননা, শুধু বিষণ্ণ চোখে ওর ঐ কান্নাটা একটুক্ষণ দেখেন। তারপর সরসীর পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বলেন, "কাঁদেনা মা, কাঁদেনা, দুঃখ মানুষের জীবনে আসে, তাই বলে কি আত্মহত্যা করতে হয়! এতে যে ভগবান আরও দুঃখ দেন। জানিনা কতবড় জ্বালায় তুমি এই ভুল করেছিলে। তবে, আমি তোমার বাবার বয়সী, বললে বলতে পার, বিপদে লজ্জার কিছু নেই মা।" কথার শেষে তিনি সরসীর মাথার চুলে আঙ্গুল চালান আস্তে আস্তে, সরসী এই স্নেহের স্পর্শটুকু পেয়ে আরও যেন আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। নার্স ঘড়ির কাঁটা হিসেব করে সরসীর সামনে ওষুধের গ্লাস ধরতেই সরসী সবেগে মাথা সরিয়ে বলে, "না—না, ওষুধ খেয়ে আমি আর বাঁচতে চাইনা।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তখন নিরুপায় হয়ে নার্সের হাত থেকে ওষুধটা নিজে নিয়ে স্নেহমাখা স্বরে বলেন, "লক্ষ্মীটি মা আমার, ওষুধটা খেয়ে নাও, তারপর বল দেখি তোমার দুঃখের কারণটা? আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই, কেউ আর কিচ্ছুটি বলতে সাহস করবেনা। নাও খাও, তারপর শুনি।"

সরসীর দুর্ব্বল অসুস্থ মনটা স্নেহের উত্তাপে যেন গলে যায়। আশৈশব স্নেহবঞ্চিতা সরসী, বৃদ্ধ লোকটির মুখের দিকে জল-ভরা দৃষ্টি তুলে একটু

সময় চেয়ে থাকে, তারপর ওষুধটা খেয়ে জীবনের পাঁচ বছর বয়স থেকে পনের বছর পর্য্যন্ত একটির পর একটি ঘটনা গুছিয়ে বলে যায়।

সম্পূর্ণ ঘটনাটা শোনার পর একটা শ্বাস ফেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলেন, "যা হবার হয়ে গেছে মা, এখন এটাকে তুমি পুনর্জ্জন্ম বলেই ধরতে পার। তবে পাতালপুরীতে না পৌছুলেও যার কাছে এসে পড়েছ সে তোমাকে ঐ পশুগুলোর ভেতরে আর ঠেলে দেবেনা, বরং তোমাকে সে আড়াল করে রাখারই চেষ্টা করবে। আমার মা হতে রাজী আছ ত'? আজ থেকে তুমি আমার ছোট্ট মা, কেমন?" বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সরসীর জল-ভরা মুখটা আদর করে আলোয় তুলে ধরে বলেন, "এখন ফলগুলো খাও, শরীর না সারলে ছেলেকে দেখাশুনো করবে কেমন করে?" তিনি ফলের ডিসটা টিপয়ের উপর থেকে তুলে নেন সরসীর সামনে এগিয়ে দেবার জন্য।

সরসী জলে ভরে-ওঠা চোখ দুটো বার বার করে মুছে ফেলছে। ধনী এবং স্বনামধন্য স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জির গৃহের প্রতিটি জিনিস, দীন-দরিদ্র চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছোটবৌ সরসীর দৃষ্টিতে এখন যেন স্বপ্নের রং বুলিয়ে দিচ্ছে। এতদিন যাকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কল্পনার পাতালপুরী ভেবেছে, এখন সেই জিনিসপত্রগুলো কেমন যেন আশ্চর্য্য করে দেয় সরসীকে। মানুষের জীবনে এত বিলাস যে থাকতে পারে আজ সেটা সরসী বুঝি স্বপ্ন-মোছা দৃষ্টি দিয়ে দেখছে।

এই ঘর এই আসবাবপত্রের মধ্যেই সে থাকবে এটা যেন এখনও সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছেনা, তাই একবার বিছানার চাদরটা হাত বাড়িয়ে মুঠো করে চেপে ধরে, একবার ডিসের ফলগুলো নাড়াচাড়া করে, কখনো বা বালিশের বড় বড় ঝালরগুলো ধরে জোরে টান দেয়। স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়ে পনের বছরের বালিকা সরসী অস্থির হয়ে ওঠে একটা অস্বাভাবিক প্রাণ-চাঞ্চল্যে।

স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জি, ঘরের নীল আলোটার দিকে চেয়ে বহুদূর থেকে

ভেসে আসা সুরে বলতে থাকেন, "ঢাকাতে এসেছিলাম দেশের সঙ্গে একবার পরিচয় করতে। বিদেশেই আমার জন্ম-কর্ম্ম। মানে, বাবা মিরাটে এক বিরাট ধনীর মেয়েকে বিয়ে করেন। আমার দাদামশাই রসদের কারবার করে অনেক টাকা জমিয়ে ছিলেন। এদিকে রেঙ্গুনে কাঠের ব্যবসা করে বাবা যথেষ্টই অর্থ করেন। আমরা অবশ্যই মিরাটে থাকতাম দাদামশাই-এর কাছে। ঐ খানেই তিনি তাঁর আত্মীয়ের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ায়, আমরা বাংলা দেশের সঙ্গে বলতে গেলে সম্পর্ক একেবারেই তুলেই দিলাম। কিন্তু আমরা সম্পর্ক তুললে কি হবে! আমার মা-মরা মেয়ে, অনিমা হঠাৎ একদিন জেদ করে বসল বাংলা দেশ সে দেখবে। তখন আর কি করি বুড়ো বয়সে মেয়ে নিয়ে বেরুলাম রসদের কারবার ছেড়ে-ছুড়ে। ভাবলাম, অর্থ ত' অনেকই আছে, আর খাটি কেন! দেশেই ঘুরে আসি!" স্যার হরিনাথ একটু থামলেন, তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে যেন সহজ করার জন্যই, হাল্‌কা সুরে বলতে চেষ্টা করলেন, "কিন্তু, দেশ দেখা আর হ'ল না। অনু আমার বাংলা দেশে পা দিয়েই হঠাৎ বসন্ত রোগে মারা গেল। সেই থেকেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনটা যেন টি঳কছে না কোথাও মা!"

এমন সময় একটি বছর চল্লিশের দাসী কমলা নেবু দিয়ে বালির সরবৎ তৈরী করে গ্লাসটা হাতে করে ঢুকল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই স্যার হরিনাথ সহাস্যে বললেন, "বুঝলি রাসু এটি আমার ছোট মা। এবার থেকে বাড়ীর যা কিছু অভাব অভিযোগ ওর কাছে জানাবি আমায় আর জানাস্‌নি!"

"সে ত' বুঝলাম, কিন্তু দিদিমণি যে এখনও বালির সরবতটুকু খেলেনা! নাও লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেল দিকি।" রাসু সরসীর মুখের সামনে এগিয়ে ধরলে ফিকে গোলাপী রংয়ের বালির-সরবতসুদ্ধ কাচের গ্লাসটা।

সরসী রান্থকে কখন দেখেছে বলে মনে পড়েনা, তবু ওর ঐ কাল গোল-গাল চেহারাটার মধ্যে এমন একটি মিষ্টি ভাব ছিল যে, সরসীর মনে হ'ল বড্ড যেন পরিচিত। আর কথার সুরে এমন একটা আপন করে নেওয়ার ভঙ্গি, যে সরসী তাকে অস্বীকার করতে পারেনা। নার্স সারা দিনরাত শিয়রে বসে থেকেও যে কাজ করতে পারেনা, রান্থ এক মুহূর্ত্তে সে কাজ হাসির সঙ্গে সমাধা করে নেয়। হাসতে হাসতে রাঁন্থ বললে, "পরশুদিন ভাত খাবে কি দিয়ে বল দিকি? বালিটা খেয়ে চট্‌পট্‌ একটা ফর্দ্দ করো কি কি সেদিন রান্না হবে।"

স্যার হরিনাথ বলে উঠলেন, "ঠিক কথা ফর্দ্দটা ত' হয়নি! চট্‌পট্‌ বালি খেয়ে বল দিকি কি খেতে বেশী ইচ্ছে করছে, আমি নিজে বাজার করব।"

"তবেই হয়েছে, বাবা বাজার করলে তোর খাওয়া কিছুই হবেনা। সারা দিনের জন্যে বসে থাকো! নারে তুই বালিটা শেষ করে আমায় ফর্দ্দ দে কাল বাজার করিয়ে না রাখলে ভোরে ভাত দিবি কেমন করে।" রান্থ আত্মীয়তার গভীরতায় বালির গ্রাসটা একেবারে সরসীর ঠোঁটে ছুঁইয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, "বুঝলেন বাবা, নিজের চোখে যদি ওকে জল থেকে তুলতে না দেখতাম, আমি কখনই বিশ্বাস করতাম যে, ও অনু-নয়! আশ্চর্য্য চেহারার মিল! এমন কি এই যে খাবনা বলে শক্ত হয়ে বসে থাকাটা পর্য্যন্ত অনুকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।"

স্যার হরিনাথ ম্লান হেসে বলে উঠলেন, "তুই হাতে করে অনুকে মানুষ করেছিস তোর চোখে ত' ভুল হবেই, কিন্তু যে আমি দূরে থাকতাম সেই আমি পর্য্যন্ত জলের ওপর ওকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। সেই জন্যেই ওর অসুখে আমি এত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কেবলি মনে হয়েছে আবার বুঝি অনুকে আমি হারালাম।" স্যার হরিনাথের স্বরটা ভারী হয়ে আসে দু'বছর আগের সেই শোক-দৃশ্য স্মরণ করে।

রান্থ আঁচলে চোখটা মুছে সরসীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সস্নেহে।

তারপর বালির খালি গ্লাসটা হাতে করে চলে যেতে যেতে বলে, "তুই ফলগুলো ততক্ষণ খা, আমি বাবার জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করিগে।"

সরসী পদ্মার জলে সত্যিই বুঝি তলিয়ে গিয়েছে! ব্যস্ত চঞ্চলভাবে "সীমা—সীমা আমি কালই কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা করছি।" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন হরিনাথ চ্যাটার্জ্জি।

সীমা নামে এখানে কে আছে এটা বুঝতে না পেরে সরসী ঈজিচেয়ারে বসে এদিক-ওদিক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দেখে, রাসু বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে রহস্য করে বলে, "কর্ত্তাবাবু যে সরসীর নামটা পর্য্যন্ত বদলে দিয়েছেন বেচারী জানেনা ত'। সাড়া দেবে কে!"

হরিনাথ চ্যাটার্জ্জি একটা চিঠি হাতে সরসীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, "ও বলা হয়নি বুঝি। তা আর বলার কি আছে! অনিমার ছায়া অসীমা। অতএব সীমা বলে ডাকব আমি। যাক, আমি একটা কটন মিল কিনছি, আবার ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করতে হচ্ছে। কি বলিসরে রাসু আর বসে থাকা উচিত নয়! এখন সীমাকে গড়ে তুলতে হবে ত'!" বলে তিনি পুরানো ঝি রাসুর দিকে ফিরে তাকান, কথাটা অনুমোদনের আশায়।"

রাসু তার মনিবকে বেশ জানে বলেই, কথায় উৎসাহ দেখিয়ে বললে, "আমিই আজ ভাবছিলাম আপনাকে বলব। বসে থাকলে মেয়েটার দায়িত্ব কি করে নেবেন।" রাসু বিছানা ঝেড়ে ঠিক করে কথার সঙ্গে সঙ্গে।

স্যার হরিনাথ মাথায় হাত বুলিয়ে কি যেন চিন্তা করে বললেন, "তবে এখনই টেলিগ্রামটা করে দিই আমার বন্ধুকে, আর ঐ সঙ্গে একটা চিঠি লিখে পাঠাই। সত্যি দেরি করা আর উচিত নয়, কথাতেই আছে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' স্যার হরিনাথ ব্যস্ত পায়ে পাশের ঘরে ঢোকেন।"

সরসী স্তব্ধ-বিস্ময়ে পাশের ঘরের দিকে চেয়ে থাকে। চোখের যেন পালক পড়ছে না তার! একটা সমাজচ্যুতা আশ্রয়হীনা, যার নাম গোত্র পর্য্যন্ত জানা নেই, তাকে যে এমন করে আঁকড়ে ধরে মানুষ উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে, সরসীর এ ধারণাই ছিল না। আজ এই সৌম্য-দর্শন কর্ম্মচঞ্চল বৃদ্ধের স্নিগ্ধ মুখটা যেন সরসীকে মানুষের আর একটা রূপও যে থাকতে পারে তাই বুঝি দেখিয়ে দিলে। যে নির্য্যাতন, যে হিংস্রতা সরসীকে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে দিয়েছিল, আজ মনে হচ্ছে তার গ্রামের মানুষ দিয়েই সবাইকে বিচার করে সমগ্র পৃথিবীটার উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল বলেই ভগবান তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন। সৃষ্টির মধ্যে ভাল-মন্দ দুটো দিকই আছে, শুধু ভাগ্যের পাশাখেলা যেন!

হঠাৎ বিরাট আরশিতে নিজেকে দেখে সরসী অবাক হয়ে যায়। সত্যিও কি মাত্র দু'গাছ শাঁখা হাতে লাল পাড় মোটা শাড়ী পরা গ্রামের সেই চক্রবর্ত্তী বাড়ীর ছোট বৌ সরসী সে নয়? এত দিন কি সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে? সরসীর ছোট্ট কপালে বিন্দু বিন্দু হয়ে ঘাম মুক্তোর লহর তোলে এক মুহূর্ত্তে। সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আরশির স্বচ্ছ কাচের উপর। নিজেকে সে চিনতেই বুঝি পারছে না। গাঢ় নীল রংয়ের রেশমী শাড়ীটা রাসু কেমন ভাবে কুঁচিয়ে পরিয়ে দিয়েছে যেন! গায়ে লম্বা হাতার লাল মেরুনোর জামা পিঠের উপর দু'দিক থেকে মোটা মোটা দুটো বেণী লাল রিবনের ফুল করে বাঁধা। কানে চিকচিক করছে লাল পাথরের লম্বা দুল, গলায় এক ছড়া সরু চেন, হাতে মোটা মোটা দুটো বালা, বাঁ হাতের অনামিকায় একটা মুক্তোর আংটি। রুগ্ন পাঁশুটে মুখে স্নো পাউডারের প্রলেপ।

সরসী বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি মেলে আরশির মেয়েটিকে দেখে। এমন করে কখন সে বদলে গেল নিজেই যে জানে না!

পাশের ঘর থেকে স্যার হরিনাথ ডাকেন, "সীমা, চিঠিটা তুই একটু

পড়ে ছাখ্‌। নইলে গোলমাল থেকে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার রীতিমত ভেবে-চিন্তে করা উচিত, কি বলিস মা?”

কাকে চিঠি লেখা এবং কিসের ব্যবসা কিছুই সরসী জানে না, তবু কেমন যেন ঐ মিষ্টি ডাকে অজ্ঞাতে সাড়া দিয়ে ওঠে, “এই যে যাই বাবা—”

এগার

বিকেল প্রায় চারটে। স্যার হরিনাথ বাগানের দিকে চেয়ে বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন। কোলের উপর একটা সংবাদপত্র খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, পাশে টিপয়ের উপর চায়ের কাপটা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। এমন সময় হঠাৎ ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে অসীমা বলে ওঠে, "এতক্ষণে ছুটি পেয়েছি।"

স্যার হরিনাথ অসীমার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললেন, "পড়া শেষ হ'ল ?" কথার সঙ্গে সঙ্গে ঈজিচেয়ারে তিনি সোজা হয়ে উঠে বসেন।

"শেষ কি হতে চায়! পাক্কা তিনটি ঘণ্টা পড়িয়ে তবে ছাড়বেন আমার মাষ্টারমশাইটি। বেছে বেছে মাষ্টার তুমি যোগাড় করেছ বটে! আজ আমি কিঙ্করদার সঙ্গে ঝগড়া করেছি। উঃ, এমনি করে পড়া!" অসীমা সারাদিনের শ্রান্ত পিঠটা চেয়ারে এলিয়ে দেয় কথার শেষে।

স্যার হরিনাথ হাসিমুখে চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে গলাটা প্রথমে ভিজিয়ে নেন। তারপর মেয়ের শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলেন, "কিঙ্কর রায় তখনকার আমলের গ্র্যাজুয়েট ত', পড়াশুনোয় ফাঁকি জানেনা বলেই তোকে হায়রান করে মারে। আর দুটো বছর তুই ঝগড়া করেই পড়ে নে, দেখবি পরে এসব কাজে লাগবে। যাক্, এখন কোথায় যাবি বল্ আমি একেবারে ঠিক হয়েই বসে আছি।" কথার শেষে চায়ের কাপটা আবার তিনি টিপয়ের উপর রাখেন।

অসীমা চেয়ারে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবে। তারপর, হঠাৎ বলে ফেলে, "আচ্ছা বাবা, আমাকে তুমি তোমার মিল দেখাতে নিয়ে যাওনা কেন ?"

'মিল ? সেখানে আবার কি দেখার আছে যে দেখতে যাবি ?" মেয়ের কথায় স্যার হরিনাথ বিস্মিত হয়ে যান।

অসীমা চেয়ারে ঠিক হয়ে বসে জোরাল গলায় বলে উঠল: "বারে মিলটা একটা শ্রমিক সঙ্ঘ, তাকে তুমি দেখার কি আছে বলে উড়িয়ে দিতে চাও নাকি! এই ত' সেদিন আমাদের ক্লাসে লেবার সম্বন্ধে একটা এস্‌সে লিখতে দিয়েছিল, আন্দাজে কি ভাল লেখা হয়! মাঝ থেকে সুজাতাটা প্রাইজটা পেল। না, এবার তোমাকে মিল দেখাতেই হবে। সত্যিই ত' কত কি হয় মিলে অথচ আমি কিছুই দেখিনি! তুলো থেকে সুতো, কাপড়, এসব কেমন করে হয় আমি এবারে না দেখে ছাড়বোই না, সে তোমাকে বলে রাখছি কিন্তু।"

'বেশ ত' আসছে মাসে পেমেণ্টের সময় তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তখন দেখিস তবেই ত' হবে।"

খুশি হয়ে অসীমা বললে, "হাঁ, মনে থাকে যেন, আমায় ফাঁকি দিতে পারবেনা, মিল আমি দেখবই দেখব! রোজ রোজ লোকে আমাকে কথা শুনিয়ে যাবে, নিজের চোখে দেখে, তবে এর প্রতিকার—বুঝলে বাবা ? লোকে বলে, আমরা নাকি লেবারদের রক্ত চুষে খাই, ওদের খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলি!—এসব কথা কেন সব বলে বল ত' ?"

অসীমার ছেলেমানুষী কথার মধ্যে হঠাৎ ব্যবসা সংক্রান্ত কথা ওঠায় ভ্রূকুঞ্চিত করে স্যার হরিনাথ বললেন, "এসব কথা কে তাকে বলেছে ? আমি আজই তার নামে হেডমিষ্ট্রেসের কাছে রিপোর্ট করব।" কথার সঙ্গে সঙ্গে স্যার হরিনাম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন আকস্মিকভাবে।

অসীমা তাঁর ক্রুদ্ধভাব প্রশমন করতে মৃদু হেসে বললে, "রিপোর্ট আর কার নামে করবে! স্বয়ং হেডমিষ্ট্রেস মিস্ বোসই এসব বলেন। অবশ্য, আমাকে নাম করে কিছু বলেন না কখনো, তবে মিলওয়ালাদের ওপর তাঁর বড্ড রাগ। তিনি বলেন, যে বাংলাদেশ একেই মরা, তার

ওপর মিলের অবাঙ্গালী এই সব প্রপ্রাইটররা দেশটাকে সবরকমে চুষে খাচ্ছে! সুতরাং বাঙ্গালী প্রপ্রাইটরদের উচিত বাংলার শ্রমিকদের রক্ষা করা, তাঁদের উপরই রয়েছে বাংলার ভবিষ্যৎ। কিন্তু এদিকে একবারের জন্যেও কেউ দৃষ্টি দেয়না এমনি দুর্ভাগা আমাদের দেশ!"

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্যার হরিনাথের চোখে সহজ হয়ে যায়। সকৌতুকে তিনি বলেন, "লাবণ্যের পৈতৃক রোগটি এতদিনে মেয়েটার ঘাড়ে চেপেছে। একেও দেখছি জেলে পচে মরতে হবে। দাঁড়া, কালই আমি যাচ্ছি তোদের স্কুলে আচ্ছা করে মেয়েটাকে ধমকে দিতে হবে দেখছি এই সব বলে কি আমার ব্যবসাটা তুলে দিতে চায় নাকি লাবণ্য' আনন্দগোপালের মেয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে বইকি!"

অসীমা জানে কত বন্ধুত্ব ছিল এই আনন্দগোপালের সঙ্গে স্যার হরিনাথের। মেয়ের কাছে তিনি নিজের পাঁচ বছর বয়স থেকে যা কিছু মনে আছে, দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও গল্প না করে পারেন না, আর অসীমাও সহস্রবার শোনা ঘটনাই, দিব্বি বসে বসে শোনে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয় না তার আগ্রহপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে যে, ঘটনাটি ইতঃপূর্ব্বে অনেকবারই সে শুনেছে। তাই সহাস্যে সে বললে, "তোমার সঙ্গে জ্যাঠামণির শত্রুতা কি মিত্রতা জানিনা, তবে আমার কিন্তু লাবণ্যদির কথা শুনে সত্যি মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে। যারা প্রাণপাত করে খাটবে, তারা উপযুক্ত পয়সা পাবে না এ কেমন কথা!" সত্যিই এটা রীতিমত স্বার্থপরতা! একদল রক্ত জল করে খাটবে, আর দুটো পয়সা দিয়ে মিল কিনেছেন বলেই কর্ত্তারা লাভের সর্ব্বাংশ নেবেন। ছিঃ, এর চেয়ে মানুষের হীনতা আর নেই! আমি যদি মালিক হতাম, কখনই লাভের অংশ নিতাম না।" অসীমা তার সদ্য-কেনা জড়োয়া ব্রেসলেট জোড়ার দিকে ছলছলে চোখে চেয়ে থাকে। স্যার হরিনাথ অসীমার পরদুঃখকাতর ছলছলে চোখ এবং ব্যথায়

গাঢ় হয়ে যাওয়া স্বরটা লক্ষ্য করলেও হঠাৎ যেন কথার উৎস হারিয়ে যায়। স্তব্ধভাবে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে থাকেন তিনি। চোখের উপর ভেসে ওঠে একটি নিরাশ্রয় মেয়ের সকরুণ চেহারা! সর্ব্বহারা বিহ্বল চোখে যেন তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে আজও। অকস্মাৎ স্যার হরিনাথের মনটা সরসীর প্রতি দুঃখ সমবেদনায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে অসীমার মাথাটা বুকের উপর টেনে নিয়ে সাগ্রহ স্বরে তিনি বলে ওঠেন, "অত ভাবনার হ'ল কি! তোরই হাতে যখন সব নির্ভর করছে, তখন যাতে ভাল হয় কর, আমি বাধা দেবনা। তবে একটা কথা পড়াশুনো না করে, এই সব লেবার নিয়ে মাতামাতি আমার কাছে চলবেনা, সে আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

অসীমা স্যার হরিনাথের বুকের উপর থেকে মাথাটা তুলে চোখ দুটো কৌতুকে নাচিয়ে বলে, "সে আমাকে বলতে হবেনা আর স্পষ্ট করে। আমি আজই রাসুকে বলছিলাম কোন রকমে তোমাদের ইণ্টার মিডিয়েটটা দিতে পারলে হয়, তারপর আমি ডাক্তারী লাইনে যাব। মানে, যাতে করে আমাদের মিলে আমি হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারি তার জন্যে আমাকে রীতিমত শিক্ষা করতে হবে। সুতরাং পড়াশুনো ফাঁকি দিয়ে ওদের নিয়ে এখন মাথা-ঘামালে আমার সমস্ত প্ল্যানটাই নষ্ট হয়ে যাবে যে! তুমি আমাকে কি যে ভাব বুঝিনা! জীবনটাই যেখানে নতুন করে গড়ে তুলতে হচ্ছে, সেখানে কোন দিক দিয়ে আমি ত্রুটি বা ফাঁক কিছু রাখতে চাইনা। আগে থেকেই আমি স্থির করে রেখেছি ভবিষ্যতে কি করব না করব।" অসীমা একটু থেমে হাসবার চেষ্টা করে আবার বলে, "জীবনটাও নদীর মতই, একদিক ভাঙ্গে আর একদিক গড়ে ওঠে বোধ হয়।" কথার সঙ্গে সঙ্গে চার বছর আগের একটা অধ্যায়ের উপর হঠাৎ বুঝি অসীমা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কয়েকটা মুহূর্ত একটা শ্বাসরুদ্ধকারী জমাট বাঁধা স্তব্ধতা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। যেন অতীতের সেই দুঃসহ অপমান তাকে বাক্‌-হারা করে দিয়েছে। স্যার হরিনাথ স্নেহসিক্ত মুখে অসীমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন আস্তে আস্তে। তারপর এই ভারী আবহাওয়াটা সরিয়ে দেবার জন্যই বললেন, "তুই কি আজ ঘরে বসে বসেই গল্প করবি? এদিকে কতক্ষণ থেকে মোটরটা অপেক্ষা করছে বল ত'?"

দুঃস্বপ্ন থেকে চমকে উঠে একটু যেন অপ্রস্তুত হাসি হেসে অসীমা বলে "সত্যি, একেবারে ভুলেই গিছলাম মোটরটার কথা! আমার পছন্দ হলে তবে কিনবে বলেছ যখন, আমি আজ লম্বা রান্ দেব কিন্তু! শেষে শীত করছে, রাত হ'ল, এই সব নানা কথা বলতে পারবে না।"

"বেশ ত' এখন ওঠই আগে মোটরে, তারপর কথা।" স্যার হরিনাথ কোলের উপর ফেলে রাখা সংবাদপত্রখানা টিপয়ের উপর রেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে।

"আমার একটুও দেরি হবে না, কাপড়টা চট্ করে বদলে নিচ্ছি।" বলে অসীমা দ্রুত পদে পাশের ঘরে ঢোকে এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দোতলা থেকে ফিরে আসে এক রাশ গরম জামা আলোয়ান স্কার্ফ হাতে। এসে বলে, "পাঞ্জাবি ত' পরেছ, এদিকে ভেতরে সোয়েটারটা ঠিক পরা আছে ত?" কথার শেষে স্যার হরিনাথের গায়ের পাঞ্জাবিটা উল্টে ভিতরের সোয়েটারটা অসীমা নিজের চোখে দেখে নেয়। তারপর স্যার হরিনাথের গলাতে স্কার্ফটা ভাল করে জড়িয়ে দিতে দিতে মন্তব্য করে, "অবাক হবার কিছু নেই—শেষে ঠাণ্ডা লাগুক রাতে কেসে কেসে অস্থির হতে হবে ত'! একটু যদি শরীরের দিকে তোমার খেয়াল থাকে সব আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলেই তুমি বিপদ ঘটাবে। নাও এখন লাঠিটাও নিয়ে এসেছি গুছিয়ে।" বলে বারান্দার এক কোণে কিছু আগে ঠেস দিয়ে রাখা শৌখিন ছড়িটা স্যার হরিনাথের হাতে

লে দেয় অসীমা। তারপর বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে হাঁক
দয়ঃ "রাসু আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।"
াসু বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে মালীকে দিয়ে গাছে জল দেওয়াচ্ছিল,
লে, "সন্ধ্যে করেই ত' বেরুচ্ছিস্, তবে ফিরবি কখন?"
স্যার হরিনাথ একটু হেসে অসীমার হয়ে জবাব করেন, "মা'টি তার
নাবালক ছেলেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দয়া করে এখন নিয়ে বেরুচ্ছেন, রাত
টার আগে কি সময় হবে। বিশেষ করে আজ আবার রবিবার।"
স্যার হরিনাথের কথায় অসীমা হেসে বলে ওঠে, "নাবালক ছেলের মাকে
নেক ভেবেচিন্তেই রবিবারে বেরুতে হয়। আর রাত হয়ই যদি হোক্,
গরম জামা ত' রয়েছে।—এসো দিকি এখন।" বলে ভারিক্কী চালে
অসীমা স্যার হরিনাথকে অতি শিশু ছেলেটির মত সযত্নে মোটরে ধীরে
রে বসায়। পরে নিজে উঠে ব'সে হুকুম করে, "গড়ের মাঠে চলো।"
ড়ী বাগানে ঘুরে গেটের বাইরে দ্রুত চলে যায়, সবকিছু পিছনে ফেলে।

বার

আরও পাঁচ বছর পরের কথা। গ্রামের সেই সমাজলাঞ্ছিত অশিক্ষিতা চক্রবর্ত্তী বাড়ীর বৌটি স্বামীর অবিচার এবং মিথ্যা অপমানের বেড়া-আগুনে সত্যিই একেবারে যেন পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে সেই ভস্মীভূত আত্মা থেকে যে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জির স্নেহধারায় সিঞ্চিত হয়ে, সেই অসীমা ব্যস্ত পায়ে মেডিকেল কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে এসেই বললে, "বাবাঃ, ডাক্তারী পড়া বলে একেই! খাটাতে খাটাতে শেষ করে ফেল্‌লে আমাকে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে বই খাতা টেবিলের উপর রেখে আব্দারের সুরে চেঁচিয়ে উঠল অসীমা: "আমার ভাত!"

রাসু তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে ছুটে এল অসীমার সাড়া পেয়ে। তার পর চট্ করে অসীমার কপালটায় হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে বললে, "যাক্ জ্বর হয়নি তাহ'লে। ভাত খাবি?"

"তোমাকেও খেয়ে ফেলতে পারি! উঃ ভীষণ খিদে পেয়েছে শীগ্‌গির ভাত দিতে বল আমার।" অসীমা হাত মুখ ধোবার জন্যে নিজের বাথ্‌রুমে গিয়ে ঢোকে।

রাসু চেঁচিয়ে বাথ্‌রুমের দরজার কাছ থেকে বলে, "ফোয়ারা খুলে এখন স্নান যেন করিসনে! মাথা-ধরা জ্বরেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ। এখন দিন কাল বাপু ভাল নয়, শেষে অসুখবিসুখ হলে বিপদে পড়ব। কর্ত্তাবাবু বার বার করে বলে গেছেন কিন্তু, শরীর খারাপ হলেই যেন খবর পাঠাই।"

বাথ্‌রুমের ভিতর থেকে চাপা আওয়াজে অসীমার কথা শোনা যায়, "কবার না কাল যাবার কথা ছিল চন্দননগর? এই ভাখো একা-একা

গেলেন সঙ্গে কি নিলেন না নিলেন কে জানে! নাঃ, পারি না বাপু তোমাদের নিয়ে।" অসীমা কথার শেষে বিরক্ত মনে কলটা খুলেই শুধু যে হাত মুখ ধুচ্ছে, বাইরে থেকেই রাসু তা বোঝে। তাই আর কিছু না বলে অসীমার ভাত, মাছের ঝোল, উপরের ঘরে দিয়ে যাবার জন্য তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে বলতে যায়।

খেতে বসে অসীমা রাসুর আঁচলটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে হুমকী দিয়ে বলে, "আমার দই কোথায়? চোত মাসের রোদ্দুরে মাথা ফাটিয়ে বাড়ী ফিরব আর উনি আমায় দই দেবেন না! দাও বলছি, নইলে এই খাওয়া ছেড়ে উঠলাম কিন্তু।"

অসীমার দুষ্টুমী-ভরা মুখের দিকে চেয়ে কৃত্রিম ক্রুদ্ধস্বরে রাসু বললে, "এই সকাল বেলা গলা ব্যথা-ব্যথা করছে, মাথা ধরেছে, এখন মেয়ের দই চাই।"

অসীমা হাসতে হাসতে বললে, "কলেজে গিয়েই ওষুধ খেয়েছি, গুণে গুণে তিনটে ট্যাবলেট। মাথা ধরা-টরা সব একেবারে জল! সত্যি, এখন দিব্বি ঝরঝরে লাগছে শরীরটা।"

রাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অসীমাকে একবার লক্ষ্য করে। তারপর সত্যি যখন দেহে রোগের কোন লক্ষণ চোখে পড়েনা তখন 'মিট সেফের' ভিতর থেকে অসীমার জন্য নিয়মিত যে দইটুকু সে নিজের হাতে পেতে রাখে, সেটা এগিয়ে দিতে দিতে স্নেহের ভৎর্সনা করে বললে, "আজ কিছু বললাম না, কর্ত্তাবাবু এলে সব বলে দেব।"

"আমিও উল্টে বলব।" বলে অসীমা সহাস্য মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে দই-এর বাটিটা পাতের কাছে সাগ্রহে টেনে নিয়ে আঙ্গুলে করে একটু মুখে দেয়। রাসু পাতের সামনে বসে এটা খা, ওটা বুঝি খাবি না, আর চাট্টি ভাত মেখে নে ত' মাছের টকটা দিয়ে, ইত্যাদি ব'লে অসীমার খাওয়ার তদারক করে চলে।

"আর একটুক্রো মাছ দেব ?—খেলিই না যে !" ব'লে রাসু হাতা ক'রে মাছ তোলে।

অসীমা মাথা নেড়ে বলে, "না না, অত মাছ আমি খেতে পারি না। তার চেয়ে তুমি এখন খেতে বসো দিকি। বেলা যে সাড়ে চারটে প্রায় !"

রাসু নিজের ভাতটা এতক্ষণ বাদে কাছে এগিয়ে নিয়ে বলে, "তুই খেলিনে, কর্ত্তাবাবুও বাড়ীতে নেই, একা বুঝি আমি খেতে পারি ?"

"তবেই হয়েছে ! এখন আমার খাওয়ার জন্যে যদি তুমি বসে থাক মিছি মিছি তা'হলে শরীর খারাপ হবে যে। এখন কি আমার ইস্কুল, কলেজের নিয়ম মত পড়াশুনো ? সবে ত' থার্ড ইয়ার ! এরপর ত আরও সব হাঙ্গাম বাধবে। অত চাট্টিখানি কথা নয় ডাক্তার হওয়া।"

অসীমা ভারিক্কীভাবে হাসে।

"বেশ চাট্টিখানি কথা না হয়, আটটখানি কথাই হ'ল, কিন্তু ডাক্তার হয়ে আগে কলেজ থেকে বের হয়ে নে, তারপর তোর ডাক্তারী শাস্ত্র শোনা যাবে। এখন আমার কথা মেনেই চলতে হবে। হাত মুখ ধুয়ে, বই নিয়ে আর না বসে বারান্দায় একটু ঘোরা-ফেরা করগে যা।" রাসু ভাত মাখতে থাকে অসীমার পাতের অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তাই কুড়িয়ে জড়ো করে।

অবশ্য এর জন্য প্রথম প্রথম অসীমা অপ্রস্তুত হয়ে যেত, কিন্তু এখন এটা একটা অভ্যাসে যেন এসে গেছে বলেই চোখে ঠেকে না। হাতমুখ ধুয়ে সে উঠে দাঁড়ায় ফুললতা আঁকা কার্পেটের নরম আসনের উপর।

নিচে থেকে চাকর ডাকে, "দিদিমণি বোস সাহেবের গাড়ী এসেছে।"

চঞ্চলভাবে অসীমা বলে, "এই রে সুজাতারা সবাই এসে গেছে, আজ যে সিনেমা যাবার কথা ছিল !"

রাসু রাগ করে বলে, "আজ তোমার যাওয়া উচিত হবেনা, ওদের বরং বলে দাও কাল-পরশু যাবে বলে।"

অসীমা দ্বিধাজড়িত-স্বরে বললে, "কিন্তু ওঁরা কি মনে করবেন!"

"কিছু মনে করবেননা। শুনছি যখন শরীর খারাপ তখন না গেলে কিছু এমন একটা হবেনা!" বলতে বলতে সুজাতা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে হাস্যস্মিত মুখে। তারপর অসীমার এঁটো হাতের দিকে চেয়ে কৌতুক-ভরা স্বরে বলে, "আমারও মা দিদি আছে, কিন্তু সীমার জন্যে রাসু যা করে দেখলে হাসি আসে।"

কথায় টিপ্পুনী তুলে পিছন থেকে অপর্ণা বললে, "খুকীকে বুঝি তুমি খাইয়ে দিচ্ছিলে! আহা, আর একটু আগে এসে পৌঁছুতে পারতাম যদি।"

"আহা, তা'হলে একেবারে তোমার স্বর্গ লাভ হ'ত!" অসীমা কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে অপর্ণার পিঠে দুম্ করে একটা কিল মেরে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে দরজা দিয়ে দেয় উচ্চহাসির রোল তুলে।

রাসু চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠল: "এই সুরু হ'ল দস্যিগুলোর উৎপাত! যা যা বের হতে হয় যদি বেরুগে, সিনেমা টিনেমা যাতে হয় যা। এই অবেলায় খেয়ে উঠে একটু যদি না গড়াই শরীর খারাপ হবে। আমি এখন কারুর চা-টা কিছু করতে পারবনা।" রাসু এঁটো হাতে উঠে নিচে চলে যায় তিনটি একবয়সী মেয়ের ভয়ে। কিন্তু রাসুর মুক্তি সহজে হয় না, সুজাতা চিৎকার করে বলে, "রাসুদিদি আমরা তা'হলে টেনিস খেলি, তুমি চায়ের ব্যবস্থাটা করো। ওরে ও সীমা, অপর্ণা, চল্ নিচে যাই।"

চোখ নাচিয়ে দুষ্টুমী করে অসীমা বললে, "সেই ভাল। টেনিসই খেলি, কিন্তুই ইন্দিরা এলনা যে!"

রাসু মুখে একটা পান দিয়ে চুনসুদ্ধু বোঁটাটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, "হনুমানের দল কি কম থাকে! এসে গেছে গুণগুণ সুরে গান করতে করতে।"

"ব্যাকরণে যদি ভুল হয় তাতে কথাটার যথার্থ অর্থবোধ হয় না। সুতরাং

হনুমানের স্ত্রীং কি হবে ঠিক করে বল।” কথার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা হাসি চেপে সিঁড়ির মুখে আড় হয়ে রাসুর পথ আগলে দাঁড়াল।

“হনুমানের স্ত্রীলিঙ্গে হনুমানী হবে, হয়েছে ত’?” রাসু অপর্ণার বেণীটা ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে হাসি চেপে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। সিঁড়িতে দম্‌-ফাটা হাসি চারটি সমবয়সী মেয়ের কণ্ঠ থেকে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত সারা বাড়ীটায় ছড়িয়ে পড়ল।

অসীমাকে শেষ পর্য্যন্ত একাই একদিন মিল পরিদর্শনে বেরুতে হ’ল। ক’দিন থেকে স্যার হরিনাথের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সুতরাং মেয়েকেই শ্রমিকদের এই হপ্তা-হিসাবের মাইনেটা মিটিয়ে দিতে যেতে হ’ল রাম সিং দারোয়ানকে সঙ্গে করে। এই নিয়ে অসীমার দু’বার মাত্র চন্দননগর যাওয়া। কিন্তু কলকাতা ফিরে এসে যে ভাবে সে গুম্‌ ধরে বসে রইল টেবিলের কাছে একটা কাগজ বিছিয়ে, তাতে বৃদ্ধ পিতা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন। ভাবেন, মেয়ে বুঝি অসন্তুষ্ট হয়েছে এখন পযান্ত হাসপাতালটার ভিত্তি গাঁথা হ’লনা দেখে। ভয় ভয় ভাবে ডাকেন: “কি রে ওদের পেমেণ্ট ক্লিয়ার করে দিয়েছিস?” কথার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময় পিতা আদরের মেয়েকে নিজের কাছে ডেকে নেবার জন্য উঠে বসেন বিছানায়।

পশের ঘর থেকে অসীমা মাথা দুলিয়ে বলে, “সব বলছি তুমি শোও, আমি আসছি এক্ষুণি।” ব্যস্তভাবে অসীমা কলমটা দিয়ে কাগজটার উপর ইতোমধ্যে আঁকজোখ সুরু করে দিয়েছে। মাথা আর তোলে না ঐ ছড়ানো কাগজখানা থেকে। স্নেহপাগল স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জ্জি আর স্থির থাকতে পারেন না, উঠে পড়েন বিছানা থেকে। তারপর পা টিপে টিপে তিনি যখন মেয়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন হঠাৎ হাহা হেসে উঠলেন সানন্দে। বললেন, “এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম বুঝি আমার রাগ করেছে হাসপাতালটা এখন সুরু হলনা দেখে। বেশ

বেশ চমৎকার প্ল্যানটা করেছিস ত' !" হাতের উপর কাগজখানা স্যার হরিনাথ তুলে নেন উৎসুক ভঙ্গিতে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অসীমা লজ্জিত হাসি হেসে হাত ধরে তাঁকে নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললে, "উঠে না এসে বুঝি পারলেনা ? বাবারে বাবা, কৌতূহল বটে ছেলের !—নাও, এখানে বসে ছাখ, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার মাথায় কি প্ল্যান এসেছে।" ব'লে সে চেয়ারের সামনে ঝুঁকে বড় কাগজখানা টেবিলের উপর ছড়িয়ে যা যা ব্যবস্থা করার কথা জানাল তাতে বর্ত্তমান মিল মালিক মনে মনে টাকার অঙ্কটা হিসাব করে যেন একটু শিউরে ওঠেন। কিন্তু সেদিকে ভবিষ্যৎ মালিকের কোন খেয়ালই হয় না। উপরন্তু যেখানে একটিমাত্র কটন মিল এবং রাণীগঞ্জে ছোটখাট একটি কারখানা ছিল, সেখানে হিসাব করা হচ্ছে, আরও তিনটি মিল কিনে সে শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে তুলবে। তারপর তাদের জন্যে হাসপাতাল, স্কুল, বাজার যা কিছু দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন সব তাদের জন্য ভবিষ্যৎ মালিক এখনই করে নিতে চায়।

মাথায় হাত বুলিয়ে ভেবেচিন্তে স্যার হরিনাথ বললেন, "সব কিছুই ত' ভাল, কিন্তু এত টাকা পাই কোথায় ?"

অসীমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে: "টাকা নেই কে বললে ? আমার নামে এত টাকা জমা করে না রেখে গরীব লোকগুলোকে বাঁচান কি উচিত নয় ?"

হেসে ফেলেন স্যার হরিনাথ, "তোর নামের ঐ টাকা দিয়ে কি এতবড় একটা ব্যাপার খাড়া হয় ! এ যে কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। বেশ, দু'দিন না হয় একটু চুপচাপ থাক, তোর পরীক্ষাটা শেষ হোক আর এদিকে শচীনও জার্মানী থেকে ফিরে আসুক, পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করব।" ব'লে তিনি মেয়ের হাতে-আঁকা বিরাট প্রতিষ্ঠানের নক্সাখানা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকেন।

অসীমা প্রথমটা একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আমি ত' এক্ষুণি তোমাকে মিল কিনে এসব করতে বলছিনা, তবে এখন থেকে কাজে হাত দেওয়া আমাদের উচিত। মানে, তুমি জমি কিনে শ্রমিকদের জন্যে বাড়ী সুরু করে দাও, এদিকে তোমার হাসপাতাল, স্কুলগুলো হোক্, ততদিনে শচীনবাবু এসে যাবেন। ওঁর খরচটাও ত' কমে যাবে মাস ছয়েক পরে।" অসীমা কথার শেষে নিজের হাতে-আঁকা শ্রমিকদের ঘরগুলোর দিকে চেয়ে বললে, "ঠিক এমনিভাবে ওদের ঘর তৈরী করতে হবে। বেচারীরা অন্ধকার ঘুপচী ঘরে পড়েও থাকবে, তোমার মেশিনেও ডিউটি মত কাজে আসবে, সেকি হয়? এই জন্যেই ওদের স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেছে। যারা তোমার মিলের প্রাণ, তাদের মেরে ত' মিল চলতে পারেনা, বরং তাদের সেবা যত্ন দিয়ে বাঁচাও, তবেই লাভ হবে। আর এক কথা, ঐখানেই আমাদের যে অফিস হবে, সেখানে যে সব ক্লার্করা কাজ করবেন, তাঁদের জন্যে এইদিকে কোয়ার্টার থাকবে।" বলে অসীমা আঙ্গুল দিয়ে কাগজখানায় আঁকা একটা চিত্র দেখিয়ে দিলে।

স্যার হরিনাথ হেসে বললেন, "তোকে আর দেখিয়ে দিতে হবে না। সবই ত' লিখে রেখেছিস প্ল্যানখানায়। হাসপাতাল ঘিরে যে বাগান হবে তার মালী কোথায় থাকবে, অফিসের দারোয়ান, চাপরাশী সকলের স্থানগুলোই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছিনা এতবড় একটা ব্যাপার গড়ে তুলব কি করে?"

"সেজন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবেনা! আমি ত' আছিই তারপরে শচীনবাবু, আমাদের বুড়ো কিঙ্করদা, এত লোক থাকতে ম্যানেজ করা এমন একটা কিছু মারাত্মক হবেনা।"

অসীমা এমন ভাবে কথাটা বলে, মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার বিষয়ে একমাত্র যেন একটু দেখে তত্ত্বাবধান করাই সমস্যা ছিল, সেটা সে

সমাধান করে দিলে এই মুহূর্তে! হাসি আসে অসীমার ছেলেমানুষী কথা শুনে, কিন্তু হাসেননা স্যার হরিনাথ। তাঁর মনে পড়ে যায় নিজের মেয়ের কথা। এমনি করে সেও গরীবের প্রতি আকুল চোখে চেয়ে থাকত; কখনো কোন ভিখারী না খেয়ে অনিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে কেউ শোনেনি। অতীতের শোকটা বুকে ব্যথা জাগিয়ে তোলে, কিন্তু পর মুহূর্তেই অসীমার দিকে চেয়ে ভুলে যান নিজের শোক-ব্যাকুল ভাবটা। যাকে একদিন বিপদের দিনে তিনি আশ্রয় দিয়েছিলন, যাকে নিজের হাতে বসে বসে লেখাপড়া শিখিয়ে এত বড়টা করে তুললেন, আজ তার এই আকাজ্ক্ষা যদি তিনিই মিটিয়ে না দেন, তবে দুর্ভাগিনী মেয়েটা কার কাছে আব্দার ধরবে! জীবনে আঘাত ত' কম পায়নি এই শিশুর মত সরল মেয়েটা! এখন সে ব্যথা যদি পরের দুঃখ মোচনের ভিতর দিয়ে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, যদি আবার মানুষের অধিকার নিয়ে সমাজ-লাঞ্ছিতা মেয়েটা বেঁচে ওঠে, তাকে তিনি বাধা দেবেন কোন প্রাণে? হাসি আনন্দ সব কিছুই যে জীবন থেকে মুছে গেছে ওর!

"হাসছ ত' না, হাসির কথা আমি কিন্তু মোটেই বলছিনা! দেখবে এসব করলে আমাদের মিল কেমন চলে। তোমার টুং-টাং করে একটা মিল খুলে বসলে এখন হবেনা, অনেক কাজ আছে।" অসীমা এতক্ষণ বাদে ডাক দেয়, "কি গো রাসু, আজ কি বাপ-বেটির চা বন্ধ?" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে টেবিলের উপর কাত হয়ে বসে।

"রাসু বন্ধ করার মালিক নয়, তোমার বকর-বকরই চায়ের দেরি করিয়ে দিলে।" বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে রাসু দু'কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকল। রাসুর হাত থেকে কাপটা নিতে নিতে অসীমা বললে, "রাসুর কথা শুনছ বাবা! আমি বলে বকর-বকর করছি, মাথার ওপর কত বড় একটা কাজ তা' ও বুঝবে কি!"

"হ্যাঁ, বুঝি নাই বটে, ওসব তোমার লেবার-টেবার বুঝলে মানুষ

হয়ে যেতাম।” বলে রাসু উঁকি মেরে কাগজখানার উপর উৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

দুষ্টুমী করে অসীমা কাগজখানা ফস্ করে ভাঁজ করতে করতে বললে, “যারা এসব বোঝেনা তারা দেখতে পাবেনা। কেমন, নয় বাবা?” সে কৌতুকে চোখ দুটো উজ্জ্বল করে স্যার হরিনাথের দিকে তাকায়।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। স্যার হরিনাথ হেসে বলেন, “এখন না হয় কাগজটা মুড়ে রাসুকে দেখতে দিলিনা, কিন্তু যখন এসব করা সত্যিই হবে তখন ত' লুকুতে পারবিনা! অতএব যা প্রকাশ্য তা আগে থেকেই দেখান উচিত। কি বলিস্‌রে রাসু?” ব'লে তিনি রাসুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকান।

রাসু ঠোঁট উল্টে বললে, “দিদিমণি না দেখালেও আমি আগেই দেখেছি আঁকার সময়, আমায় হারাতে পারেনি।” রাসু হাসতে হাসতে স্যার হরিনাথের পায়ের তলায় বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দেয় আস্তে আস্তে।

কৃত্রিম কুপিত-স্বরে অসীমা ভ্রূটা কুঁচকে বললে, “আমার হুকুম ছাড়া লুকিয়ে দেখার জন্যে দাঁড়াও না তোমাকে কি করি! এখনও ইনজেকশান্ দুটো বাকী, দেব আচ্ছা করে ফুটিয়ে, মজাটি বুঝবে তখন। নিত্যি ভাল্লুকের মত জ্বর ত'!”

“শুনেছেন কর্ত্তাবাবু আমায় কি বলছে? কাল বলে ভাল্লুক বললে?”

হেসে ফেলে অসীমা বললে, “তোমার মত উপুসী ভল্লুক ত' দেখিনি বাবারে দিন দিন এটা কি টিনটিনে রোগা হচ্ছে।”

“বেশ, রোগাই না হয় হয়ে যাচ্ছি। এখন শচীনদা কবে আসছেন বলুন ত' কর্ত্তাবাবু, মাসীমা বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন ছেলের জন্যে।” রাসু জুত হয়ে বসে ঘর-সংসারের দু'চারটে কথা বলার জন্যে, কিন্তু অসীমা তার ঐ মিল স্যার প্ল্যান নিয়ে এত বেশী আলোচনা সুরু করে দিলে যে, শেষ পর্য্যন্ত রাগ করে রাসু উঠে গেল পাশের ঘরে।

স্যার হরিনাথ বিপন্ন হয়ে বলেন, "তোরা দুটো মেয়ে যদি এই ভাবে আমাকে বিব্রত করিস তবে কি করে আমি টিঁকি বল দিকি!"

হেসে অসীমা রাসুর গম্ভীর মুখখানা এ-ঘর থেকে লক্ষ্য করে বললে, "রাসুর আছে কেবল ঘর-সংসার! এটা বাবার জন্যে, এটা সীমার জন্যে, এই কথা ছাড়া ওর কিছু নেই; কিন্তু এতবড় পৃথিবীটায় কত লোক যে অসহায় বিপন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে তাদের কথা আগে হবে, না হবে ওর কথা! আর শচীনবাবু যে শীগ্গিরই মাস তিনেকের মধ্যেই আসছেন এটা কি ও জানেনা তুমি বল? রাসু নিজে বলুকদিকি তোমার চিঠিখানা আমি ওকে পড়ে শুনিয়েছি কিনা!"

"বেশ, সব মেনে নিলাম, এখন তোর বক্তব্য বল্ শুনি।" স্যার হরিনাথ উভয়পক্ষের নালিশটা এড়াবার জন্য কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন স্নিগ্ধ হাস্যে। অসীমা চায়ের কাপটা টিপয়ের উপর রাখতে রাখতে বললে, "আমার বক্তব্য হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি আমরা কাজে হাত দিতে পারি তার চেষ্টা করা। কেননা যুদ্ধ এবারে লাগবে। এই একটা দুর্যোগের সময়। এই অবস্থায় কিছু লোক যদি আমাদের মিলে আটকে ফেলতে পারি হয় ত' তারা বাঁচতে পারবে। গরীবরাই ত' মারা যায় সবচেয়ে আগে। ক'টা ধনী আর মরে! যাদের দু'বেলা ভাতের সংস্থান নেই এসব সময় তারাই আগে মরে এটাই ত' জানা কথা!" কথার শেষে অসীমা দরিদ্রের প্রতি সমবেদনার হাসি হাসে।

স্যার হরিনাথ অসীমার স্নেহসিক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন, "বেশ, একটা শুভদিন দেখে রাখ্, আমি বীরভূমের রাইস মিলটা কিনে ফেলি। এসব ব্যবস্থার আগে কিছু চাল আটক রাখতে হবে। মানে, কাপড় চাল দুই যদি আমাদের হাতে থাকে, তা'হলে ওদের কষ্ট দুঃখটা কম হবে।"

যেখানে কিছুই হচ্ছিলনা সেখানে একটা এগুচ্ছে দেখে শিশুর মত অসীমা

আনন্দের যেন কাকলি তুলে বলে উঠল, "তবে ত' হয়েই গেল সব! ওখান থেকে সস্তা দরে ওদের চাল দেব, এখানে কাপড় হচ্ছে, মাইনে পাবে, ঘর আছে, অসুখ হলে চিকিৎসার খরচ আর কিচ্ছু লাগবেনা!"
রাসু ওঘর থেকে টিপ্পনী কাটে: "ইস্কুলটা—!" তারপর সস্মিতমুখে এই আত্মভোলা বাপ-মেয়ে দুটির উদ্দেশ্যে বলে, "সব ব্যবস্থাই এখন হ'ল, কিন্তু ক'টা বাজল সেদিকে কি খেয়াল আছে? আটটা যে বাজে প্রায়!"
রাসুর কথায় হঠাৎ অসীমা রিস্টওয়াচটায় চোখ বুলিয়ে অপ্রস্তুতস্বরে বলে, "তাই ত' কথায় কথায় রাত হয়ে গেল, তোমার যে খাবার সময় হয়ে গেছে।"
"কথা রেখে জামা কাপড়টা চট করে বদলে এস, আমি ততক্ষণ টেবিল সাজাচ্ছি।" বলে, রাসু ব্যস্ত পায়ে চলে যায় বারান্দা দিয়ে।
"আচ্ছা পাগলা মেয়ে! মিল থেকে এসে হাত মুখ ধোয়ারও সময় পাসনি ত'? না, না, আর কথা নয় যা বলার খেতে খেতে বলিস, শুনব।" স্যার হরিনাথ নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান কথার সঙ্গে সঙ্গে।
রাসুর তাড়া আসে ডাইনিং রুমের ঘণ্টার ধ্বনির ভিতর ঢং ঢং শব্দে। আটটা বাজে।
স্যার হরিনাথের অন্য কোন বিষয়ে কখনও সাহেবীয়ানা দেখা যায়না। কিন্তু রোজ দুপুর বেলায় যেমন রীতিমত বাঙ্গালী ঘরের পদ্ধতিতে আসন পেতে নানারকম বাঙ্গালী রান্নায় পাতা সাজিয়ে খেতে বসেন, ঠিক আবার রাত আটটায় সেই স্যার হরিনাথ যেন সম্পূর্ণ বদলে যান! টেবিলে বসে ঝক্‌ঝকে কাঁটা-চামচ নেড়ে সাদা ডিসে বিদেশীদের মত খানা খাওয়াই তাঁর আশৈশবের অভ্যাস। অবশ্য মুসলমান খানসামা বাবুর্চী তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানায় এ পর্যন্ত ঢোকেনি যদিও, তবে সামান্য সখটুকু মেটাতেই বোধহয় বাবুর্চী আর খানসামার পোশাক পরে রান্না ও

টেবিলে পরিবেশন করার জন্য দুটি বাঙ্গালী সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে মোটা মাইনে দিয়ে রেখেছেন।

অসীমা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে কোনরকমে জামা কাপড়টা বদলে নেয়। তারপর মাথাটাকে চট্ করে একটু আঁচড়ে, পায়ে শ্লিপারটা ঢোকাতে ঢোকাতে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে যায় তাদের ডাইনিং রুমে।

ভোর

পূর্ণ একটি বছর অর্থের স্রোত এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ঢেলে, অসীমার বিরাট পরিকল্পনাটি খাড়া হয়ে উঠল যখন, খুশির আলোয় অসীমার বড় বড় চোখ দুটো তখন যেন ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। পরিচিত, বন্ধু, সামান্য জানা, যাকে পায় তাকেই অসীমা টেনে নিয়ে যায় মিল দেখাতে। আজ এটা হচ্ছে কাল ওটা হবে, প্রতিদিন নানা কাজের ঝামেলা তার বেড়েই চলেছে। যেন পক্ষিনী-মায়ের মত বিরাট ডানা মেলে এদের সে আগলে রাখতে চায় এমনি একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা তার দু'চোখে। মাঝে মাঝে এসব কাজের জন্য কলেজের কামাই হচ্ছে, খাওয়া নাওয়া ঠিক সময় হয়না দেখে, মেয়ের উপর স্নেহময় পিতা হঠাৎ কঠোর হয়ে আদেশ জারি করে দিলেন, তিনমাস অন্তর একটি দিন সে মিলে যেতে পাবে। তাছাড়া নিয়মিত পড়াশুনার ভিতর দিয়ে পূর্ব্বে যেমন সে চলছিল তেমনি ভাবে চলবে। যদিও আদেশটা অসীমা মেনে নেয় বাধ্য মেয়ের মতই, তবে কথার চুক্তি করতে হ'ল, শচীন লাহিড়ীকে প্রতি হপ্তায় তার হয়ে তদারক করার ব্যবস্থা স্যার হরিনাথকে করে দিতে হবে। কেননা নিতান্ত কর্ম্মচারী যারা, বেতনটুকু হিসাব করেই যারা কাজ করবে, তাদের উপর এই প্রতিষ্ঠানটি, নির্ভর করে চলতে পারেনা। সুতরাং যিনি এই পরিবারের একজন আত্মীয় হিসাবে এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার হিসাবে অসীমার সব কাজের সহায়তা করে এসেছেন, তাঁকেই একমাত্র অসীমা বিশ্বাস করতে পারে। বৃদ্ধ পরমেশবাবু আর 'বিশ্বস্তদাস্ত' আছেনই! অসীমা হাসতে হাসতে আবার পড়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে, নিশ্চিন্ত হয়ে।

...অসীমার আজ মিল পরিদর্শন করার ভিড়টি তিন মাস পরে বাড়ীটাকে যেন অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে। চাকরগুলো ছুটোছুটি করছে জিনিস-পত্র নিয়ে, রাসু কি-সব জিনিস গোছ করছে বিরাট কাঠের একটা বাক্সের উপর উপুড় হয়ে। বামুনদি বড় বড় দুটো টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরছে। অসীমা ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সির সঙ্গে তর্ক করছে, শচীন লাহিড়ী কাগজপত্র নিয়ে স্যার হরিনাথের কাছে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে এগিয়ে দিচ্ছে, তিনি সই করে দিচ্ছেন। রুগ্ন হয়ে পড়েছেন আজকাল তাই, অতদূর আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। বিছানায় শুয়েই দিন কাটে এতবড় বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক স্যার হরিনাথের। সই করাটাও যেন পরিশ্রম এমনি ভাবে হাতের পেনটা বিছানার উপর গড়িয়ে দিয়ে একটু চোখ বুঁজে থাকেন তিনি। তারপর, চোখ থেকে চশমাটা খুলে বিছানায় আড় হয়ে শুতে শুতে সহাস্যে বললেন, "বুঝলে শচীন, আমার ত' মনে হয় তুমি যখন জার্ম্মানীতে গেছলে এত জিনিসপত্র সঙ্গে নাওনি।"

"কিন্তু এটা জার্ম্মানী যাওয়া ত' নয়, চন্দননগর যাওয়া; একেবারে ফরাসী আড্ডায়।" অসীমা সহাস্যে কৌতুকের স্বরে কথার উপর রসান দেয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতঘড়ির কাল ব্যাণ্ডটা টেনে একটু ছোট্ট করে কব্জিতে বাঁধতে বাঁধতে। তারপর বলে, "পৌনে ছ'টা বেজেছে এখনই বেরুন ভাল, কি বল বাবা?"

স্যার হরিনাথ মেয়ের বেশভূষার দিয়ে চেয়ে স্নিগ্ধ হাস্যে বললেন, "রাত তিনটে থেকে আয়োজন চলছে সুতরাং এখন যাত্রা করাই ভাল, নইলে আবার রাত করবে ত' ফিরতে।"

"একটা দিনও যদি তুমি ছুটি না দাও তবে আমি নিরুপায়।"

"আর নিরুপায়ের দোহাই দিস্ নে বেরিয়ে পড়।"

"তুমি ওষুধটা নিজে খেতে যেও না; বামুন দিদিকে বলো। অসীমা

তাকে বলে যাচ্ছি ঠিক সময়মত সব করতে।" অসীমা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়।

চোখ বুঁজে বুঁজে স্নেহের হাসি হাসেন স্যার হরিনাথ। শচীন লাহিড়ী দরজার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললে, "ওঁর দুটো দিক নিয়ে চিন্তা! মিলে গিয়ে আপনার জন্যে ভাবেন, বুঝি সময়মত ওষুধ পথ্য কিছু পড়ল না, এদিকে বাড়ীতে থাকলে চিন্তা মিল চলছে কেমন করে কে জানে! ভারী ইণ্টারেসটিং ওঁর এই অবস্থাটা!" কথার শেষে শচীন লাহিড়ী কাগজপত্রগুলো ভাঁজ করে পকেটে গুছিয়ে রাখতে থাকে বেশ একটা হেঁয়ালী হাসি হেসে।

স্যার হরিনাথ অপলক চোখে এতক্ষণ শচীন লাহিড়ীর দিকে চেয়ে কিছু যে একটা মনে মনে চিন্তা করে, দৃঢ় সংকল্পে সংকল্পিত হয়ে উঠলেন সেটা তাঁর ঐ উঠে বসার ভঙ্গিতেই বোঝা গেল। "সীমাকে তোমার কেমন লাগে শচীন? লজ্জা করো না—কেন না, আমি ত' ক্রমশঃই অথর্ব হয়ে পড়ছি, তাই স্থির করেছি ওর একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। অবশ্য এর আগে কতগুলো কথা তোমাকে বলার প্রয়োজন। যদিও বংশে আমরা খুবই উঁচু, মেয়েও আমার দেখতেই পাচ্ছ—মানে, কোন দিক থেকেই ত্রুটি নেই। তবে, একটা বিষয়ে তোমার মা'র অভিমত হবে কিনা, সেটার জন্যে আমার চিন্তা।"

এতদিন আভাসে-ইঙ্গিতে যে ভাবটা প্রকাশ পেয়েছে, আজ তার পূর্ণ বিকাশে প্রথমটা শচীন লাহিড়ী যেন চমকে উঠল। বিদেশে শিক্ষার্থে এত অর্থব্যয়ের যথার্থ কারণটি আজ ধরা পড়ে গেছে। এতদিন বাদে এই সৌম্যকান্তি বৃদ্ধের মনের গোপন উদ্দেশ্য শচীন লাহিড়ীর কাছে খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ায়, হঠাৎ সে চমকে উঠলেও অসন্তুষ্ট হ'ল না। বরং শান্তগলায় বললে, "আমার মা মোটেই কন্‌সারভেটিভ মাইণ্ডের নন্। এই ধরন শ্রেণী, অমুক তমুক এসব তিনি মোটে পছন্দ করেন না।"

নিচে থেকে জোর হর্ণ বেজে উঠল। স্যার হরিনাথ ব্যস্তভাবে বললেন, 'ঐ শোন, মোটরে হর্ণ দিচ্ছে, দেরি নয় শীগ্‌গির যাও।—পরে কথা হবে।"

শচীন লাহিড়ী নূতন একটা প্রেরণায় হঠাৎ হাল্কা পাখীর মত দ্রুত পায়ে নিচে নেমে মোটরে গিয়ে বসে অসীমার মুখের উপর একটা উৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে।

মিলের সীমানা থেকেই অসীমাকে দেখে সকলে আনন্দে কলরব করে উঠল। ভাবী অভিভাবিকা অসীমা দেবী আসছেন মিল পরিদর্শন করতে। মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিক ঝাড়া, মোছা, ঝাঁট দেওয়া সুরু হয়ে গেল। একটু অপরিচ্ছন্ন থাকলে অসন্তুষ্ট হবেন, সুতরাং পরিষ্কার পথে আবার ঝাড়ু চলে, আফিসে গোছ-গাছ হয়, শ্রমিকরা ঘর-দোর মুছে ঠিক করে। এমন কি, কেরানীবাবুদের বাড়ীতেও নোংরা জিনিসপত্র, প্রত্যেকে অসীমার চোখের আড়াল করে।

অসীমা মোটর থেকে নেমে চতুর্দ্দিকটা ঘুরে বেড়ায়। এদিকে রাম্‌ কাঠের বাক্স খুলে, প্রত্যেকটি বালক-বালিকার হাতে পুতুল খেল্‌না ইত্যাদি দিতে আরম্ভ করে দিয়েছে। একেবারে শিশু যারা, তাদের হাতে অসীমা লজেন্স দিচ্ছে, একটু আদর করছে গাল টিপে। এই আদরটুকু নেবার জন্যে শ্রমিকদের বৌরা তাদের সন্তানকে কত রকম না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এগিয়ে দিচ্ছে। যেন, ঐ স্নেহের স্পর্শটুকুতে তাদের সন্তানরা দাসত্বের এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, পৃথিবীতে বেঁচে উঠবে মানুষের অধিকারে। অসীমার কাছে ধনী-দরিদ্র সবাই সমান অধিকারে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকের সঙ্গে হেসে অসীমা কথা বলছে, তার চোখে যার শরীর সে খারাপ বোধ করছে, তাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ছুটির দরখাস্ত করতে বলছে। খুশি আর আনন্দের কলরবে মিলের চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। তার উপর,

মাঝে মাঝে আকাশস্পর্শী বড় বড় চিমনীগুলো থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, ঘণ্টা হিসাবে সিটি পড়ছে পর পর তিনটি মিল থেকে। অসীমার সম্বর্দ্ধনার ভিতরেও কাজ তাদের নিয়মমতই চলছে যন্ত্রের ঘচ্ ঘচ্ শব্দ তুলে।

একটুক্ষণ অসীমা তুলো থেকে বিচি ঝাড়াইটা দাঁড়িয়ে দেখে। তারপর, যেখানে শাড়ীর পাড় ডেকরেটার উইভিং মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে নানা রকম নক্সাটা করছে, সে দিকে উঁকি মেরে নিঃশব্দ পায়ে চলে যায় শিল্পীদের যেন স্বপ্ন না ভেঙ্গে যায় এমনি ভাবে বারান্দা পেরিয়ে।

হাসপাতালের কাছাকাছি আসতেই ক'টি ছেলে অসীমার হাতে এক গোছা শিরিষ ফুল দিতেই অসীমা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল: "বারে! ভারী সুন্দর ত' কোথায় পেলে?"

শ্রমিকদের, অনাহারে ক্লিষ্ট, অবহেলায় পশুর মত গড়িয়ে নিজে নিজেই বড় হয়ে ওঠা, ক'টি দশ-বার বছরের ছেলে, হেসে বললে, "আমাদের এখানে অনেক গাছ আছে। বকুল ফুল দেব দিদি?"

"বকুল ফুল? বলিস কি—চল্ চল্ দেখি, কেমন ফুল ফুটেছে!" অসীমা ওদের সঙ্গে এগিয়ে যায় বকুল গাছের তলায়। এমন সময়, একটি বছর পাঁচেকের ফুটফুটে ছেলে একমুঠো বকুল ফুল তুলে অসীমার দিকে এগিয়ে আসতে খোয়া বিছান পথে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ছেলেমেয়ের অগুনতি ঢেউয়ের মধ্যে এই ছেলেটি কোন্ বাড়ীর অসীমা চিনতে পারে না। কেননা, এখানে ইতর ভদ্র সকলেই এক সঙ্গে মানুষ হচ্ছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি লোকই এখানের নতুন বাসিন্দা। সুতরাং, ছেলেটি যে কে, কিছু বুঝতে না পারলেও তাড়াতাড়ি ঐ ধুলো মাখা রক্তপড়া অবস্থাতে ছেলেটিকে সে কোলে তুলে ডাকে, "ও রাধু একটু আইডিন নিয়ে এস দিকি।"

অসীমার ডাকে রাম্বুর সাড়া আসার আগেই হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার পরমেশবাবু তাড়াতাড়ি মালিকে সঙ্গে নিয়ে, এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, "ঝমনুর কাছে ওকে নামিয়ে দাও মা, আমি বেঁধে দিচ্ছি আইডিন দিয়ে।"

'না, না, আইডিন আমি দেব না।" ছেলেটি চেঁচিয়ে, কেঁদে, এমন ভাবে অসীমাকে জড়িয়ে ধরলে যে, হেসে ফেলে অসীমা বললে, "দিব্বি ছেলেটি, কার ছেলে কাকাবাবু?" বৃদ্ধ পরমেশবাবু বললেন, "এটি বাঙ্গাল চক্কোত্তির ছেলে। কি যেন নামটা ঠিক মনে নেই।" অপ্রতিভ হেসে পরমেশবাবু নামটা ভাবতে চেষ্টা করেন মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে। দুষ্টুমীর সুরে অসীমা বললে, "এই প্রতিষ্ঠানটি ত' দেখছি বাঙ্গালেরই আড্ডা! কিন্তু, এমন সুন্দর নামকরণটি বোধ হয় কারুর হয়নি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা ছেলেটিকে ঝমনুর কাছে এগিয়ে দিতে গেল।

আহত ছেলেটি ঝমনুর ঐ কাল ভয়াবহ চেহারাটা দেখেই কিন্তু ভয়ে কেঁদে উঠল অসীমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে। যেন পায়ের ব্যথার চেয়ে ঝমনুর হাতে আইডিন লাগানটাই বেশী কষ্টকর এমনি একটা আতঙ্কে, মুখটা নীল হয়ে গেছে ছেলেটির। অসীমা মুহূর্তের জন্য ছেলেটির ভয়ার্ত মুখটা একবার দেখে নেয়। তারপর, ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা ওর সঙ্গে বকুল ফুল তুলছিল, তাদের দিকে ফিরে সস্নেহ কণ্ঠে বললে, "এর বাড়ীটা কোনদিকে তোরা জানিস? চল্ দেখিয়ে দিবি।"

তাই বলে আপনি ওকে বয়ে নিয়ে যাবেন নাকি! দিন, নামিয়ে দিন ঝমনু নিয়ে যাচ্ছে।" শচীন লাহিড়ী এতক্ষণ বাদে এদের এই জটলার মধ্যে এগিয়ে আসে, ঐ নোংরা ধুলো বালিমাখা অবস্থায় অসীমার কোলে ছেলেটিকে দেখে।

অসীমা ছেলেটির মুখ নিজের শাড়ী দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, "যাবে না বলে কেমন আঁকড়ে ধরেছে, দেখছেন ত'! কি করি, যাই

দিয়ে আসি ওর মায়ের কাছে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুখে অসীমা একদল ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে এগিয়ে যায় কেরানীবাবুদের কোয়ার্টার-গুলোর দিকে। পিছনে ঝমন্নু আস্তে আস্তে এগুতে থাকে কেমন যেন অপরাধীর ভঙ্গিতে।

শচীন লাহিড়ী একটু বিরক্ত হয়ে সিগারেটটায় ক'টা টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে অসন্তুষ্টি ছড়িয়ে বলে উঠল: "এমনি করেন বলেই, মিলে আস' স্যার হরিনাথ চ্যাটার্জি বন্ধ করে দিয়েছেন। এত সেন্টিমেন্ট্যাল হ'লে চলে না!"

হেসে পরমেশবাবু বলেন, "সীমা আমার চিরদিনই এমনি স্বভাবের; যাক্ চলো আমার হাসপাতলে বসিগে।"

শচীন লাহিড়ী বললে, "তাছাড়া গতি কি—চলুন আজ বেলা গড়াবে ঐখানেই।"

এদিকে অসীমা যখন ছাব্বিশ লেখা লাইট পোস্টটার কাছে এসেছে, তখন একটি ছেলে বললে, "ঐ তিন নম্বর বাড়ীটা খোকনদের।" বলে সবাই তারা মোড় ঘুরে চলে যায় স্কুলের ঘণ্টা শুনে। অসীমা ভাল করে দেখে নেয় এই পঁচিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর দেওয়া লম্বা খোয়া-ঢালা রাস্তাটা। অফিসের কেরানী এবং মিলের আর্টিস্ট, উইভিংমাস্টার, স্কুলের মাস্টার, হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার, ডাক্তার ইত্যাদি, অর্থাৎ ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁরা মিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের ব্যবহারের জন্য এই বাসাগুলো ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, তার মধ্যেও পদ-মর্যাদা হিসাবে বাসার একটু তফাৎ রাখতে হয়েছে ঠিকই। অর্থাৎ, ছাব্বিশ নম্বর লাইনে যাঁরা থাকেন তাঁরা পদমর্যাদায় একটু নিম্নস্তরের: এই ছাব্বিশের তিন নম্বর বাসাটি যে গরীব একটি গৃহস্থের, অসীমা মনে মনে তা' অনুমান করে দরজার কড়াটা একটু আস্তে নাড়লে। কোন পরিচয় নেই এদের সঙ্গে, কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগে অসীমার;

নিজেদের দরজার কাছে এসে খোকন কান্না ভুলে একটু লজ্জিতভাবে হেসে, অসীমার কোল থেকে নামবার চেষ্টা করছে দেখে, হাসি মুখে অসীমা বললে, "ওরে দুষ্টু ছেলে! বাড়ীর কাছে এসে কোল থেকে নামা! সে হবে না, তোমাকে নামতে দিচ্ছিনা আমি।" ব'লে অসীমা এই অচেনা ছোট্ট ছেলেটিকে সস্নেহে দু'হাতে কোলে চেপে ধরে। খোকন হেসে ফেলে অসীমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "মাকে বলো খোকন ঐ বড় গাড়ী চেপে চলে গেছে, দেখবে কেমন খোঁজে আমাকে। বুঝলে মাসীমা, মা যখন তোমাকে আমার কথা জিগ্‌গেস্ করবে সত্যি পড়ে গেছি কিনা, বলোনা কিন্তু, তাহলে আর আমাকে ঘর থেকে মোটে বেরুতে দেবে না। আমি লুকুচ্ছি।" ব'লে খোকন অসীমার কোল থেকে ফস ক'রে নেমে পিছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসীমারই দামী সাদা জর্জ্জেট শাড়ীর রুপালী জরির ধাকাদেওয়া আঁচলের একটা অংশ গায়ে জড়িয়ে। অসীমার মনটা মুহূর্ত্তে শিশুর এই আপন করে নেওয়া মিষ্টি 'মাসীমা' ডাকটি আর এই দুষ্টু ব্যবহারে নিজেরই অজ্ঞাতে কৌতুকে যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। সে পিছনে বাঁ হাতটা দিয়ে খোকনের পিঠটা থাবড়ে বললে, "তা'হলে খেলা সুরু করে দাও, আর আমি বুড়ী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, কেমন?" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজার কড়াটা এবার জোরে নাড়া দেয় হাসি মুখে।

দরজার কড়া নাড়ার মিনিট খানেক পরে দরজার ভারী খিলটা দমাস্ করে খুলে, বড় বড় সবুজ রং-এর পাল্লা দুটো দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়ে এক হাত হলুদ-মাখা অবস্থায় ব্যস্তভাবে যে অন্তরালবাত্তিনীটি আকস্মিক অসীমার একেবারে মুখোমুখী হয়ে দাড়াল, তার দিকে অবাক হয়ে অসীমা চেয়ে থাকে। এই হ'ল খোকনের মা! খয়ের পাড় মিলের সাদা শাড়ী পরা একটি বছর তেইশের রোগা মত ছোট্ট বৌ। মাথার উপর অল্প একটু ঘোমটা-টানা, কপালে বড় করে আঁকা সিঁদুর টিপ,

নাকে ছোট্ট একটি ওপেল পাথরের নাকছাবি, মণিবন্ধে শাঁখা, নোয়া আর ব্রোঞ্জের উপর সোনার পাত মোড়া তিনগাছি করে চুড়ি। গলায় চিক্‌চিক্ করছে সুতোর মত সরু ছোট্ট একটা ঘষা গোট হার। ঐশ্বর্যোর কোন চিহ্ন নেই চেহারার মধ্যে, বরং দরিদ্র সংসারের মধ্যে কোন রকমে যে দিন কাটায় তারই প্রত্যেকটা মুহূর্ত্ত বৌটির দেহের অঙ্গে অঙ্গে যেন কালশিরার মত দাগ রেখে যাচ্ছে একটির পর একটি করে। তবু বেশ মিষ্টি লাগে বৌটির ডাগর ডাগর চোখ দুটোর তলায় ঐ কালি ঢালা ক্লান্ত চাহনিটা। গালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে গেছে একটু, শরীরে মাংস নেই বললেই চলে, কিন্তু তারই মধ্যে কি হাসিখুশি মুখখানা! দু'চোখে বিস্ময় আর আনন্দ ফুটিয়ে লজ্জা-মিশ্রিত স্বরে বৌটি বললে, "আসুন!"

"তবু যাহোক আসতে বললেন! আমি ত' ভাবলাম আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বুঝি দরজা থেকে বিদায় দেবেন। অথচ আমরা আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে এলাম। কেমন নয় খোকন?" অসীমা হাসতে হাসতে আড়াল থেকে খোকনকে টেনে সামনে আনে। তারপর, খোকনের পায়ের ছড়ে যাওয়া হাঁটু দেখিয়ে বলে, "দেখুন কি করেছে, ঘরে আইডিন আছে?"

"আইডিন আমি দেব না মাসীমা।" কথার সঙ্গে সঙ্গে একদৌড়ে খোকন ঘরে ঢুকে পড়ে অসীমার পাশ কাটিয়ে।

হেসে ফেলে বৌটি বলে, "ওকে জাম্‌বাক্ ছাড়া কখন যদি কিছু লাগান যায়! ভারী দুষ্টু, আসুন আপনি।"

উঠান পেরিয়ে অসীমা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে খোকনের হাতটা চেপে ধরে সহাস্যে বলে, "মোটেই দুষ্টু ছেলে নয়, এর মধ্যে আমাকে 'মাসীমা' বানিয়ে ফেলেছে। চমৎকার ছেলে!"

অসীমার হাত ছাড়িয়ে হেসে খোকন দৌড়ে পালিয়ে গেল দেখে, "এখন

দেখুন কেমন।" বৌটি বলে লজ্জা লজ্জা ভাবে যেন ছেলের এই আপন করে নেওয়া স্বভাবটা শুধু দুষ্টুমী মাত্র!

বৌটি অসীমাকে ঘরে বসিয়ে ভেবে পায় না এখন সে কি করবে! ইতঃপূর্ব্বে কখন এঁকে দেখেনি, সুতরাং কি করতে হবে কিছুই ভেবে না পেয়ে চট্ করে একবার রান্না ঘরটা ঘুরে আসে। চা করবে কি? কিন্তু, শুধু চা সেই বা কেমন! একটু দোমনা অবস্থায় জানালা দিয়ে অফিসের দিকে তাকায় স্বামীর আশায়। এই কিছু আগে স্বামী তাকে সতর্ক করে গেছে ঘর-দোর সম্পর্কে যে, মিলের ভবিষ্যৎ মালিক যিনি, তিনি আসছেন। এই এক মুহূর্ত্ত আগেও অসীমা দেবী সম্পর্কে যে সব অদ্ভুত কল্পনা করেছিল তার সঙ্গে কিছুই মিল নেই। কি সুন্দর রূপবতী হাস্যমুখী এই যুবতীটি। সারা দেহে স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন জ্বলজ্বল করছে! এ কি চোখ-ধাঁধান রূপ! বৌটি ম্লান হয়ে পড়ে অসীমার কাছে। তার মত একজন পঁচাত্তর টাকার কেরানীর স্ত্রীর কাছে মিলের মালিক অসীমা দেবী পা মুড়ে পাটিতেই যে বসবে ভাবতেও বুঝি বৌটি পারেনি! তাই, গলায় অপ্রস্তুতের সুর ঢেলে সে বললে, "মাটিতে না বসে চেয়ারখানায় বসলেই ত' পারতেন।" বৌটি একপাশে গুটিয়ে-গুটিয়ে বসল কথার সঙ্গে সঙ্গে।

হেসে ফেলে অসীমা বললে, "অমন করে ব্যবহার করলে, আপনার এখানে আসা হয়ে উঠবে না। আমি সবার কাছেই সমান ব্যবহার পছন্দ করি। যাক্, আপনারা এসেছেন কবে এখানে?"

"তা' মাস দেড়েক হবে।" বৌটি কর গুণে হিসেব করে বললে, "উনি চাকরি পেয়েই আমাকে বরিশাল থেকে এখানে নিয়ে এলেন।"

"এখানে আসার আগে গ্রামে না শহরে থাকতেন? শহরে থাকা অভ্যেস হলে প্রথম প্রথ মএখানে কিন্তু বেশ অসুবিধে হবে।" ব'লে অসীমা একটু হাসে হালকা ভাবে।

অসীমার কথায় বৌটি হেসে ফেলে বলে, "কথায় আছে ঃ অন্নের সুখে অরণ্যে বাসও ভাল। এ ত' একটা সুন্দর জায়গা। আমার ত' খুব ভাল লাগছে। দিব্বি ঘুরে বেড়ানও চলে। এখানে আবার কষ্ট কোথায়! দাদার ঐ শহরের ঘুপচি ঘরে এবার গেলে প্রাণে মরব। কি চমৎকার হাওয়া বাতাস খেলে ঘর দুটোতে!"

বৌটির কথায় মনে মনে খুশি হয়ে অসীমা এক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে দেখে তার নিজের হাতে প্ল্যান করা বাড়ীখানা। দু'খানা মাঝারি সাইজের ঘর। ভিতর দিকে ছোট উঠান, ঘরের কোণেই বারান্দা, তার একধারে রান্নাঘর, ভাঁড়ার, আরেক ধারে কল। বাইরের দিকে খোলা একটু রোয়াক। দু'খানা করে এক একটা ব্লক; মাঝখানে একটু করে জমি ছেড়ে আবার দু'খানা ব্লক।

অসীমা বললে, "যাক্ আমার প্ল্যান যে আপনাকে খুশি করেছে এতে আনন্দ পেলাম। কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যটা ত' ভাল দেখছি না!" অসীমা প্রশ্নের পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৌটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি মুহূর্তে বুলিয়ে গেল দেখে, লজ্জিত হাসি হেসে বৌটি বললে, "এবার খুব কষ্ট পেয়েছিলাম তাই শরীরটা খারাপ।..."

অসীমা চৌকির উপর ঘুমন্ত একটি শিশুর দিকে চেয়ে বললে, "এই? কিন্তু এও যে বড় রোগা!"

বৌটি ঘুমন্ত রুগ্ন মেয়েটির দিকে চেয়ে মাথাটা নামিয়ে আঙুল দিয়ে চৌকির পায়াটাকে-ঘষতে ঘষতে মিলিয়ে যাওয়া স্বরে বললে, "সেটি আঁতুড়েই গেছে।"

অসীমার ভ্রূটা একটু কুঁচকে উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপর গম্ভীরমুখে ব্যস্তভাবে বললে, "এইখানেই যখন হাসপাতাল আছে, ডাক্তার ডেকে পাঠাননি কেন? বেশ, এখনই আমি বলে যাচ্ছি নীরজা দিদিকে। আচ্ছা আজ চলি।" অসীমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় আঁচলটা ডান দিক দিয়ে,

ঘুরিয়ে বুকের উপর ঘন করে টেনে। সাদা ধপধপে শাড়ীতে খোকনের পায়ের রক্ত আর ধুলো বৌটির নজরে পড়ায় সে কুণ্ঠিতস্বরে বললে, "ছেলেটা বুঝি কোলে চেপেছিল, দেখুন কি কাণ্ড করেছে! আহা, কাপড়টা একেবারে গেছে!"

অসীমা হেসে দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে বললে, "ও কিছু নয়, ধুয়ে ফেললেই হবে। আর আপনি কিন্তু চিকিৎসা করাবেন। এখানে পয়সা লাগে না কোন কিছুর।" অসীমা ধীর পায়ে এগিয়ে চলে খোয়া বিছান পথের দিকে।

মেলে আসা উপলক্ষে কত লোকের সঙ্গেই না পরিচয় হচ্ছে! কিন্তু খোকনের মাকে যেন বেশ একটু ভাল লাগে অসীমার। সংসারে অর্থের সংস্থান নেই, দেহে স্বাস্থ্যের দীপ্তি নেই, তবু তারই মধ্যে বৌটি যেন নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে এমনি একটা তৃপ্তিমাখা হাসি রক্তশূন্য ঠোঁটের উপর খেলা করছে। কিন্তু এইভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার আনন্দের আড়ালে যে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসছে সেটা বোধ হয় এই সরল মনের মেয়েটি এখন কিছুই বোঝে না বলেই, আজও সংসারের জালে জড়িয়ে স্বামী, সন্তান, সংসার নিয়ে নিজেকে ভুলে আছে। এই হ'ল বাঙ্গালী মেয়ের ঘরোয়া জীবন!

অসীমার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিয়ে রাম্রু ডাক দেয়: "এসো রাত হয়ে যাবে যে!"

অসীমা কোন প্রতিবাদ করে না শুধু পায়ের গতিটা বাড়িয়ে দেয় খোয়া বিছান পথের উপর।

চৌদ্দ

আবার তিনমাস পরে অসীমা মিল দেখতে এসেছে। গতবার যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাদের ডেকে খুঁজে আলাপ ত' করলই, আর এবার যাদের সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, অপরের কাছ থেকে পরিচয় জেনে তাদের সঙ্গে বাড়ী গিয়ে আলাপ করে এল। যেন আলাপী একটি মেয়ে শুধু মাত্র আলাপ এবং পরিচয় করতেই এসেছে এমনি একটা খুশির ঢেউ ছড়িয়ে ইতর ভদ্র সকলের সঙ্গেই অসীমা আলাপ করতে করতে এসে দাঁড়াল খোকনদের দরজায়।

অসীমা কড়াটা নাড়বার আগেই দরজা খুলে কমলা এক মুখ হেসে বললে, "আসুন, আমি আপনার জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

অসীমা সহাস্যে বললে, "দেখছি আমার চিঠিতে কাজ হয়েছে। এই ত' দিব্বি ফিরে গেছেন!" বলে অসীমা আর একবার কমলার চেহারাটা দেখে নেয় খুশি মনে।

কমলা হাসি চেপে অসীমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতে বসাতে বললে, "আপনার মুখে কেবল স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্য! আমরা অত বুঝলে ত' ছাই!..."

মাথা নেড়ে অসীমা কথার প্রতিবাদ করে, "বোঝেন না বলেই ত' এত করে আমায় বলতে হচ্ছে। অর্থাৎ অন্ততঃ আমার মিল সীমানায় এই হীনস্বাস্থ্য যাতে করে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তার জন্যেই আজ আমাকে ডাক্তারী পড়তে হচ্ছে। সমাজে স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা শত্রুর চেয়ে মারাত্মক।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমার দৃষ্টি পড়ে কমলার মেয়েটির উপর। মেয়েটি বারান্দার এক কোণে বসে কি যেন খেয়ে হাত চাটছে

মস্তবড় একটা লিকলিকে জিব বার করে। অসীমা বুঝি শিউরে উঠল মেয়েটির তেল গোল নেড়া মাথা, বৃদ্ধাপ্রপিতামহীর মত বলিরেখাযুক্ত কোচকান মুখ, আর হাড় জিরজিরে পেটসর্ব্বস্ব চেহারাটা দেখে। বললে, "ওকে ডাক্তার দেখাচ্ছেন না কেন ?"

কমলা মাথার কাপড়টা টানতে টানতে বললে, "হাসপাতালে রোজ নিয়ে যাওয়া ওঁর পক্ষে সুবিধে হয় না ত' তাই ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না। বোঝেনত বোধ হয় একা মানুষ, অফিস করে সময় পাওয়া যায় না; আসেন ত' সেই রাত আটটা ন'টা, এতে কি বলা যায় !"

ভ্রূ টেনে অসীমা বললে, "অফিস পাঁচটায় বন্ধ হয় তবে আটটা ন'টা হয় কেন ?" অসীমার পক্ষে যদিও পরের ঘরোয়া কথা বলা উচিত নয়, তবু নিজের স্টাফের বিষয় খোঁজ নেওয়ার জন্যই অসীমাকে প্রশ্ন করতে হ'ল গম্ভীর মুখে। কিন্তু কমলা কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে যায় অসীমার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখে। মনে মনে একটু রাগও যে হয় না তা নয়, কি দরকার বাপু পরের সংসারের অত খবরে ? তবু কমলা বলে, "সারা দিন পরিশ্রমের পর মানুষ ত' একটু আরাম চায়, তাই আমিই ওকে তাস খেলতে মেস বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই।"

অসীমা হেসে ফেললে কমলার মনের চাপা অসন্তোষটা বুঝতে পেরে। দুঃখ হয় এই সব সরল মেয়েগুলোর মনটার বহুদূর অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে। তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে স্বামীর মনঃতুষ্টি করতে। দেহে শক্তি নেই, তবু সন্তানের বোঝা হাসিমুখে বহন করছে। সংসারে যেন শুধু সন্তান প্রসব করা, আর অভাব-অনটনের মধ্যে তালি মেরে একরাশ ছেলেমেয়ে তাড়িয়ে জীবন কাটানই জীবনের মূল সার্থকতা বলে ভেবে বসেছে। কিন্তু এই রুগ্ন অসহায় শিশুগুলো যে ভবিষ্যৎ জীবনে কখনই বাঁচতে পারে না বাঁচার মত করে, এটা কেমন করে বোঝাবে সে ! তবু চেষ্টা করতে হবে, বাঁচাতে হবে তার এত সাধের

বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকে। একটু নড়ে-চড়ে বসে অসীমা বলে, "আমার কথায় রাগ করলে চলবে না ত' ভাই! আমি আপনার চেয়ে এসব বেশী বুঝি বলেই বলছি, খুকুর জন্যে কালই আপনার স্বামীকে হাসপাতালে পাঠাবেন। তাস খেলা পরে খেললেও চলবে। আর নেহাতই যদি পাঠান সম্ভব না হয় ওকে ভর্তি করে দিন হাসপাতালে। বাচ্চাদেরও আলাদা ওয়ার্ড রয়েছে।"

কমলা অসীমার কথাটা শোনামাত্র সঙ্কোচ আর লজ্জায় ঘেমে ওঠে একেবারে। কি আশ্চর্য্য মানুষটি তার মনের কথাটা মুহূর্ত্তে প্রকাশ করে দিলে হাল্‌কা গলায়। লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বরটা একটু ঝেড়ে নিয়ে কমলা বললে, "কিন্তু হাসপাতালে খুকুকে কি রাখা যাবে? ভারী কাঁদবে, তার চেয়ে ওঁকেই বলব। উনি সেদিনও বললেন, কিন্তু আমার কেমন যেন রোজ দু'বার করে হাসপাতাল পাঠাতে লজ্জা করে। বাইরে খেটে আসেন তার ওপর ঘরের কাজ করা কষ্টের ত'! একটা দ্বিতীয় লোক পর্য্যন্ত সংসারে নেই যে এটা-ওটা করে।"

কথার মোড় ঘুরে যায়। অসীমা ঘরের চতুর্দ্দিকে চোখ বুলিয়ে বলে, "তা ঠিক, একা হাতেই সব করতে হয় আপনাকে। শ্বশুর বাড়ীর কেউ নেই?"

কমলা এতক্ষণ বাদে খাঁটি মেয়েলী কথার সূত্র পেয়ে অসীমার কাছে বেশ একটু ঘনিয়ে বসতে বসতে বললে, "থাকার মধ্যে আছেন বড় জা। কিন্তু তাঁকে এই ক'বছরের মধ্যে চোখেও দেখিনি। তিনি কাশীতেই থাকেন। এদিকে বাপের বাড়ীতে সবাই থাকলে কি হয়, সকলেই যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। দিদি থাকেন দিনাজপুরে, তাঁর ছেলের কাছে। বৌদিরা যার যার সংসার করে। বাবা বুড়ো মানুষ। মা ত' বিয়ের দু'বছর আগেই মারা গেছেন। তবে যার কাছে মা'র মত আদর আব্দার করা যায় সেই বড় বৌদিটি আমার আপন ভাইয়ের বৌ নয়,

এদিকে দিদিও সৎবোন। মানে, বাবা তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলেদের নিজের ছেলের মতই মানুষ করেছিলেন, যদিও বৌদিরা কিন্তু ততটা আপন ভাবে না আমাদের।” কমলা একরাশ ঘরোয়া কথা ব’লে অসীমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, “তবে কাকে ভরসা করি বলুন ?”

অসীমা কমলার ছেলেমি দেখে সহাস্যে বললে, “এখনকার দিনে ভরসা নিজেকেই করতে হয়। যাক্ শরীরটা আবার যেন খারাপ করে না বসেন, তা’হলে আমার সঙ্গে ঝগড়া হবে কিন্তু।” অসীমা যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

“দোহাই আপনার ঝগড়া বিবাদ মোটে আমি পারি না! বলতে লজ্জা নেই আপনি একটু গম্ভীর হলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। সেখানে ঝগড়া করব কি করে ?” কমলা হাসতে লাগল অসীমার সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললে, “আপনি আমাকে ‘আপনি’ বললে ভারী বিশ্রী লাগে, বয়সে বড় কিনা জানিনা, তবে সম্মানে ত’ বড়। আর আপনার দয়াতেই খেয়ে-পরে এখানে রয়েছি যখন, ‘আপনি’ বললে বিশ্রী লাগে শুনতে।”

মুহূর্তে অসীমার হাস্যস্মিত মুখে একটা বিরক্তির ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ যদি নিজেকেই নিজে অপমান করে, তবে সম্মান সে পাবে কোথা থেকে! দীনতা সহ্য হয় না অসীমার। বিনয় মানুষের জীবনে প্রধান গুণ, কিন্তু তাই বলে দীনতা কেউ বোধ হয় মেনে নিতে পারে না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে অসীমা বলে ওঠে, “আমার দয়াতে কেউ খেয়ে-পরে এখানে নেই। সকলেই পরিশ্রমের মূল্য পাচ্ছে, এছাড়া আর কিছুই নয়।”

কমলা শিক্ষিতা মহিলা না হলেও বোকা নয়। কথাটা যে বেফাঁস হয়ে গেছে সেটা বুঝে নিয়েই সহজ হাস্যে বললে, “সে যাই হোক্! আপনি আমাকে ‘আপনি’ বললে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। এ পর্য্যন্ত ‘আপনি’র

পদে উঠিনি ত'! পাড়ায় পর্য্যন্ত 'তুমি' বলে সকলে কারণ আমি না
সকলের চেয়ে বয়সে ছোট। আচ্ছা তেইশ বছর আট মাস বয়স
কি খুবই কম, বলুন ত' কেমন কথা।" কমলা সরল মনে খিলখিল করে
হেসে উঠল নিজের অপ্রতিভ ভাবটা সরিয়ে দিয়ে।

কমলার নিজের বয়স সম্বন্ধে বিরাট একটা ধারণা এবং ওর ঐ সরল হাসি
অসীমার মনের বিরক্তিটাকে যেন সরিয়ে সহজ করে দেয়। সে বললে,
"তবে ত' আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি, তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছ
আমি মানুষটি কেমন লম্বা-চাওড়া, সেই আন্দাজে বয়সটাও বেশ
অতএব নাম ধরে 'তুমি' বললে কিছু অপমান হবে না। কেমন রাজী
ত'?" অসীমা কমলার স্বাস্থ্যের লালিমা-ভরা গালটায় একটু আদরের
ভাবে টোকা মারলে।

কমলার কাছে ঐটুকুই অনেকখানি পাওয়া। খুশির সুরে সে বললে,
"তবে আমিও দিদি তুমি বলব, রাগ করতে পারবে না কিন্তু।"

অসীমা দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হেসে উত্তর দেয়, "এটা না
হলেই রাগ করতাম।"

গরীব কেরানীর স্ত্রী কমলা আনন্দের নির্ব্বাক একটা অনুভূতিতে যেন
স্বপ্নাচ্ছন্নের মত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলে অসীমার পাশে পাশে।

ওপাশ থেকে কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী এগিয়ে এসে সহাস্যে বললে, "মা লক্ষ্মী
আমার বাড়ীতে উঠি উঠি করে বসে এলে, আসছে বার কিন্তু তোমাকে
ঘড়ি ধরে আধটি ঘণ্টা আটকে রাখব।"

উইভিং মাস্টারের বিধবা মেয়ে বিভা দুষ্টুমী করে: "তবে আমি ত
দিদিকে রাখব আটকে সারা দিনের বলে!"

কৃত্রিম কুপিতস্বরে দ্রুত এগিয়ে এসে বড়বাবুর স্ত্রী বললেন, "তোরা
সবাই যদি মাকে ঘরে বন্ধ করতে চাস, তবে আমি ওকে এক্ষুনি
নিয়ে যাব এখান থেকে। তুমি এসে পড় ত' মা এই পঁচিশ নম্বরের

পাইনে, দেখি কেমন করে আমার মা জননীকে আটক করে!”
কথার সঙ্গে সঙ্গে বড় গিন্নী অসীমাকে সস্নেহে জড়িয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন দেখে, নার্স উষা হাসপাতালে ডিউটি দিতে যাওয়ার পথে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বললে, “আপনি চলে আসুন সীমাদি, এদের বাজে গজলার চেয়ে নার্সিং বিষয়ে দুটো আলোচনা করলে কাজ দেবে। কেবলি ত' টানাটানি চলছে। এই বেলা পালাই চলুন।”
উষার স্মিত প্রসন্ন মুখখানার দিকে চেয়ে বিভা পাল্টা জবাব করে, “তুই থাম্ দিকি! একটা পুঁচকে মেয়ে আমাদের মধ্যে কথা বলিস কেন? মন দিয়ে নিজের কাজ কর্।”
উষা দূর থেকে দুষ্টুমী করে বিভাকে কিল দেখিয়ে বললে, “কাজটা এত করছি। আসছ ত' হাসপাতালে, দেখবে মজাটা তখন।”
বিভা ঠোঁট উল্টে ভেংচি কেটে বলে: “ম্যালেরিয়ার জন্যে কেউ হাসপাতাল যায় না। আপনি আসুন সীমাদি।” কথার শেষে সে অসীমার কাছে এগিয়ে যায়। কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়ে কমলাকে সরিয়ে বিভার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, “এবার থেকে তোমার দরজায় আমরা পাহারা দিয়ে বসে থাকব।”
“শুধু পাহারা নয় এবারে আমরা তালা দিয়ে রাখব। দেখি কেমন করে তুমি দিদিকে আটক কর্।”
হাসতে হাসতে কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী বলে: “তা মন্দ বলনি বিভা! এই দরজাই হ'ল আসল আড্ডা।”
কমলা থতমত খেয়ে যায় সকলের অভিযোগ শুনে। যদিও হাসিমুখেই সবাই নানা ভঙ্গিতে অসীমার এখানে বসা সম্বন্ধে আলোচনা করছে অসীমাকে সামনে রেখে, তবু কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায় কমলার সহাস্য মুখখানা। অসীমা এতক্ষণ বাদে মিষ্টি হেসে সকলের কথার কাটান দেয় বিভার কোল থেকে তার ভাইটিকে একটু আদর

করে। "অভিযোগটা সকলের দিক থেকেই আসছে। কিন্তু সবারই ত' বোঝা উচিত বেচারী কমলা একেবারে নতুন কলকাতা এসেছে। তার ওপর ছেলেমানুষ, এখানের রীতিনীতিটা একটু বোঝাতে হবে ত'।"
বড় গিন্নী পানটা এতক্ষণ বাদে বাঁ হাতের মুঠো থেকে মুখে দিয়ে, একটু চিবিয়ে যেন জুত করে নিয়ে বলেন, "সে ঠিকই, বিদেশে বেরুন একটা ঝঞ্ঝাট ব্যাপার। তার ওপর পদ্মা পাড়ি দিয়ে আসা। আমাদের বাবু বেশ, ট্রেনে চাপলেই দেশ!"
বিভা হাসে আর বলে, "তাই বটে! আপনারা যাবেন আর আসবেন। আমাদের দু'দিনের ঠ্যালা।"
ওধার থেকে কখন যে হেড্ মাস্টারের স্ত্রী এগিয়ে এসেছে কেউ লক্ষ্য করেনি। চিরদিনই নীহারকণা নিজের সংসার নিয়েই ব্যস্ত। দুটো কথা বলার সুযোগও তেমন জোটে না বলেই রান্নাঘর থেকে খুন্তিটা হাতে বেরিয়ে পড়েছে, উনুনে তরকারী চাপিয়ে। অসীমা মাস্টারের স্ত্রী নীহারকণার দিকে চেয়ে সহাস্যে বললে, "শেষে কি আমাকে খুন্তি-পোড়া দিয়ে তাড়াবেন নাকি? ব্যাপারটা ত' সুবিধের মনে হচ্ছে না!"
নীহারকণা লজ্জিত হাসি হেসে বলে, "কি যে বলেন, খুন্তি-পোড়া বরং আমাদের জন্যেই ব্যবস্থা করা উচিত। যা পেত্নীর মত রূপ! যাক্ যার জন্যে রান্না চাপিয়ে ছুটে এলাম তাই জিগ্‌গেস করি। আচ্ছা, আপনাদের ঐ বণ্ডে কি সই করা যেন ব্যবস্থা হয়েছে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না ত'? উনি কাল বলছিলেন, কিন্তু কোন কথা ত' ছাই খুলে বলা ওঁর অভ্যেস নেই। মাঝ থেকে আমি ভেবে মরি। কি হয়েছে, বলুন না সীমাদি? বোঝেনই ত' দিনকাল খারাপ, ভয় হয়!"
বড় গিন্নী ঠোঁট উল্টে বলেন, "ভয় তোমার কিসে নেই গো! বণ্ডে সই করবে তোমার স্বামী, ভয়টা তোমার কিসের! তুমি ত' আর সই

করতে যাচ্ছ না! আচ্ছা এক বোকা! সাতটা ছেলের মা হয়ে বুদ্ধি গেছে একেবারে!"

নীহারকণা বড় গিন্নীর কথায় ম্লান হেসে জবাব করে, "সকলের মত বুদ্ধি নেই বলেই সীমাদি'র কাছে জেনে নিতে হচ্ছে। শেষে সাতটা ছেলে নিয়ে একা মেয়েমানুষ সংসার চালাতে কি ভরা-ডুবি করব!"

কমলা এতক্ষণ উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনছিল, এখন ফস্ করে সে বলে ফেললে, "এই ব্যাপার! তা আপনাকেই না হয় যুদ্ধে পাঠান হবে মাস্টার-মশাই-এর বদলে। বণ্ডে সই করা মানেই যুদ্ধে যাওয়া।" কমলা হেসে লুটিয়ে পড়ে বিভার পিঠের উপর। তারপর একটু দম নিয়ে বলে: "কাল রাতে নীহারদি আমাকে এই কথাই জিগ্‌গেস করছিল, উনি ত' শুনে হাসি চেপে পালান। এখন নীহারদি'র কি ব্যবস্থা করবে কর দিদি! নইলে জ্বালাবে সমস্ত মিলসুদ্ধ!" কমলা হাসতে থাকে কৌতুকের ঝিলিক চোখে-মুখে ছড়িয়ে।

সকলেই নীহারকণাকে নিয়ে হাস্য-পরিহাস করছে দেখে অসীমা হাসি চেপে বললে, "ভয় কিছু নেই। বেশ ত' অফিস থেকে একটা ফর্ম এনে পড়ে দেখবেন। তবে অল্প কথায় আপনাকে আমি নিশ্চিন্ত করে বুঝিয়ে বলছি। বণ্ডে সইটা যুদ্ধের ব্যাপার মোটেই নয়। অর্থাৎ এখানের নিয়ম করা হয়েছে যে, তিন বছর ভাল ভাবে কাজ করার পর কর্ম্মীর কাজটি পাকা হবে, উন্নতি হবে এবং বছর বছর মাইনে বাড়বে। সুতরাং সেই সূত্রে বণ্ডে সই করবে মালিক এবং কর্ম্মী উভয়েই, যাতে করে ভবিষ্যতে গোলমাল কিছু না হতে পারে। এখন বণ্ডে সই করার পর তিন বছরের মধ্যে কোন কর্ম্মী যদি কাজের ত্রুটি করে, কিম্বা কোন অন্যায় কাজ করে, তাকে তক্ষুণি মিল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তারপরে ও কিছু করে যদি সেটা আইনের হাতে বিচার হবে।"

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে নীহারকণা বলে: "বাঁচালেন দিদি! বুড়োবয়সে দেশ গাঁ ছেড়ে এসেছি বলেই নানা চিন্তা। নইলে ওদের মত বয়স হ'লে কি ভয় পাই! জীবনটা অভাবের জ্বালাতেই পুড়ে শেষ হ'ল।" নীহারকণা হাসে ক্ষুব্ধভাবে।

বিভা যেন কথাটা কেড়ে নিয়েই বলে উঠল, "অভাব-অনটন কার ঘরে নেই বৌদি! আজ যদি অন্নের টান না পড়ত' তবে কি পদ্মা সাঁতরে এখানে এসে জুটি! তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে আমরা এখানে এক-জোট হয়ে বেশ আরামেই আছি।"

সায় দিয়ে বড় গিন্নী বলেন, "সত্যিই ত' কোন বিষয়ে মা আমার অভাব রাখেনি। স্কুল, হাসপাতাল, বাজার সব হাতের কাছে।"

অসীমা নিজের প্রশংসায় আরক্ত হয়ে বললে, "আজ চলি, আর একদিন আসব। সঙ্গে বাবা এসেছেন, ওঁর কষ্ট হবে দেরি করলে। বোঝেন ত' বয়েস হয়েছে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে অসীমা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় অদূরে অপেক্ষমান মোটরখানার দিকে।

স্যার হরিনাথ মোটরে বসে এতক্ষণ অসীমাকে লক্ষ্য করছিলেন। এত-গুলো শ্রমিক যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গাড়ীতে তুলে দেবার জন্যে এক সার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই ছিপছিপে মেয়েটির গতিশীল ভঙ্গির দিকে চেয়ে বৃদ্ধ পিতার হৃদয় যেন আনন্দে নেচে ওঠে। মিষ্টি লাগে ঐ সম্বর্দ্ধনার উচ্চ কোলাহল, ভাল লাগে শ্রদ্ধায় নুয়ে-পড়া মানুষগুলোর তৃপ্তির হাসি! অসুস্থ দেহ নিয়েও মেয়ের সম্বর্দ্ধনাটা দেখতে প্রায়ই স্যার হরিনাথ না এসে পারেন না। আজও এসেছেন যাকে তিনি হাতে করে পদ্মার জল থেকে তুলেছেন সেই লাঞ্ছিতা সমাজ পরিত্যক্তা অসহায় মেয়েটির জীবনে সফলতার জয়ধ্বনি শুনতে। মানুষ নিজেকে জড়িয়েই বাঁচতে চায়, কল্পনা করে, ভবিষ্যৎ বেঁধে নিজের ঘরখানাকে সাজায়। কিন্তু, একদিন

যে বধূটি ঘৃণার সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেছে, মুহূর্ত্তের জন্যেও জীবনের মায়া করেনি, সেই গ্রাম্য অশিক্ষিতা সরলা বালিকার চোখে আজ যে স্বপ্ন দুল্‌ছে তাকে অবহেলায় সরিয়ে ফেলা যাবে না। সে যে পৃথিবীর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে ধীরে ধীরে। মাটির প্রদীপ জেলে যে শিশুর মুখখানা সরসীর চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আজ সেই শিশু হারিয়ে গেছে আর্ত্ত বিপন্ন সহস্র সহস্র শ্রমিকের জীবনের স্রোতে। সরসী নিজেকে ভুলে গেছে দুঃখীর দুঃখ মোচনের আকুল একটা প্রেরণায়। কিন্তু, স্যার হরিনাথ ভোলেন না সেই মুহূর্ত্তটা। যেন এখন নিজের কানে শুনতে পাচ্ছেন প্রলাপের কথাগুলো !

"কি ভাবছ বাবা ?" অসীমা গাড়ীর দরজা খোলে কথার শেষ রেশটা মিলিয়ে যাবার অনেক আগে। অসীমার কথায় স্যার হরিনাথ আসনে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চিন্তা-সূত্র ছিঁড়ে যায় নিজের হাতে গড়ে তোলা অসীমার স্পর্শে। তৃপ্তির একটা হাসি হেসে বলেন, "দেখছিলাম আমার মাকে। সত্যি ভালবাসে বটে মিলের শ্রমিক শ্রেণী ! ছাখ্ কেমন সার বেঁধে শিরিষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। ওরা গেট অবধি সঙ্গে সঙ্গে যাবে। এই হ'ল প্রীতির সম্পর্ক ! নইলে, অন্য মিলের মালিক যখন আসে তখন এই এরাই চাপা-গলায় পিছনে গাল দেয়, আমি জানি।"

অসীমা একবার মিলের চতুর্দ্দিকটা দেখে তারপর মৃদু হেসে বললে, "মিলের ভবিষ্যৎ যারা, তাদের বাঁচতে না দিলে পিছনে নয়, সামনেই, গালাগাল দেবে। ওরাও মানুষ, এটা ভুলে গেলে চলবে কেন ?" কথার সঙ্গে সঙ্গে মোটর স্টার্ট দেয়।

পনের

যুদ্ধ আর দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষ, অসীমার জীবনের গতিটা আরও যেন দ্রুতগামী করে তোলে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কোথ দিয়ে কি ভাবে যে চলে যাচ্ছে, অসীমার খেয়ালই নেই। বলতে গেলে দিনের প্রায় তিন ভাগ সময়ই মিল-সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে তাকে ব্যস্ত ভাবে মোটরে মোটরে ঘুরতে হয়। মনে হয় সে যেন সন্তানের মত এত সাধের নিজের হাতে গড়ে-তোলা এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকে দুঃখ দুর্দ্দশার গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য, সামান্য কিছু খাদ্য-সংগ্রহের আশায় ব্যাকুলভাবে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

রুগ্ন দেহে ঈজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে স্যার হরিনাথ চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁর স্নেহের সীমাকে। মেয়ের এই কর্ম্মব্যস্ত চেহারাটা স্যার হরিনাথকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। খুশিতে ছোট্ট শিশুর মত কলরব করে উঠতে ইচ্ছে হয়। এতদিনের পরিশ্রম, আশা, আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়েছে। পদ্মার গভীর জলরাশি থেকে একদিন যাকে নিতান্তই মানুষের কর্ত্তব্য হিসাবে রক্ষা করেছিলেন, আজ সেই সর্ব্বহারা দুঃখ অপমানে লাঞ্ছিতা গ্রাম্য বধূটি এতবড় প্রতিষ্ঠানের মালিক হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। আর কোন ভয় নেই! এতবড় পৃথিবীতে সরসী হারিয়ে গেলেও স্যার হরিনাথ যাকে স্নেহের উত্তাপে শাসনের গণ্ডী বেঁধে ধীরে ধীরে একটি বন্য-শিশুকে মানুষের স্তরে এগিয়ে এনেছেন, সেই অসীমা হারিয়ে যাবে না—যেতে পারে না! স্যার হরিনাথ কিছুক্ষণ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃভরা মুখে চোখ বুজে বসে থাকেন, তারপর হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে তাঁর বন্ধু এটর্ণী মিঃ সিংহকে ডাকেন উইলটা নিয়ে বিকেলে আসার জন্যে।

অসীমার নামে মিলের সম্পূর্ণ মালিকী-স্বত্বটা লিখে দেওয়ার পর মাত্র মাস তিনেক তিনি বেঁচে ছিলেন। যুদ্ধের শেষের দিকে, বর্ষার সময় হঠাৎ শরীরটা তাঁর এতই ভেঙ্গে পড়ল যে, এক সন্ধ্যায় অসীমার কোলে মাথা রেখে স্যার হরিনাথ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। মৃত্যুর ঘণ্টা কয়েক আগে তিনি শচীন লাহিড়ীর হাতটা টেনে অসীমাকে সঁপে দেওয়ার মত করে এইটুকুই শুধু বলে যেতে পেরেছিলেন : "তোমার হাতে রেখে গেলাম, দেখো দুঃখ যেন আর ওকে স্পর্শ না করে। অনেক কথাই বলবার ছিল বলা হ'ল না।" কথার বেগে স্যার হরিনাথের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে দেখে শচীন লাহিড়ী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "আমাকে আর কিছুই বলতে হবে না আপনাকে! আমি থাকতে সীমার জন্যে ভাববেন না।"

আনন্দে আর আবেগে স্যার হরিনাথের দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়তে লাগল। অসীমা পাথরের মূর্ত্তির মত শচীন লাহিড়ীর সবল হাতের ভিতর হাত রেখে বসে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়টি ধীরে ধীরে তার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে!

আকস্মিক এতবড় আশ্রয়টাকে হারিয়ে প্রথমটা অসীমা কেমন যেন বিহ্বল হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, শচীন লাহিড়ী যে দিন তাকে রীতিমত জোর করেই মিলের প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল, সেদিন আবার অসীমা নিজেকে যেন ফিরে পায়। সত্যিই বুঝি পিতৃশোক সে ভুলে গেল নিজের হাতে গড়ে-তোলা তার অতি স্নেহের শ্রমিকদের দিকে চেয়ে। যিনি অসীমার ভিতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাঁর অর্থে এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তিনি শোকের উর্দ্ধে! তিনি যে প্রতি মুহূর্ত্ত স্মরণীয় হয়ে অসীমাকে কর্ম্মপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। অসীমা খালি পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় স্যার হরিনাথের প্রতিমূর্ত্তিটির দিকে। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে

পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে জল-ভরা চোখে।

মাস কয়েক পরের কথা। অসীমা মিলের সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করে কমলার দরজায় এসে কড়াটা নাড়ল বেশ একটু জোরেই।
ভিতর থেকে কমলা হাস্যমুখে বলেঃ "দোর খোলাই রয়েছে, তুমি এসো।" অসীমা উঠানে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে সদর দরজাটা ঠেলে দিতে দিতে বললে, "ব্যাপার কি ? হঠাৎ নেমন্তন্ন যে ? খোকনবাবুর বিয়ে নাকি ?"
কমলা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে অসীমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "চিঠি লিখে থেকে ভয় ভয় করছিল, কি জানি যদি না আস !"
"যাক্ এসেছি যখন, ভয়টা নিশ্চয়ই তখন আর নেই ! কিন্তু ব্যাপারটা কি বল ত' ?"
"বা রে আমার বুঝি রান্না করে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না ? নিজে ত' রান্না করতে পার না। কাজেই ছোট বোনটি কেমন রাঁধতে পারে, সেটা একবার তোমার পরীক্ষা করে দেখা উচিত নয় কি ? সত্যি, আমার কিন্তু রান্না করে খাওয়াতে ভা-রী ভালো লাগে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে কমলা রান্নাঘরের দরজায় শিকল তুলে দেয় একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে।
অসীমা হেসে বললে, "এই ব্যাপার ! তা মন্দ নয়, আমার দিক থেকে পরীক্ষা করাও হবে, পেটও ভরবে নানা রকম খেয়ে। সেদিন বড় গিন্নী রেঁধে কত কি খাওয়ালেন, আজ তুমি। বেশ, বেশ, পালা করে এখন থেকে আমাকে রেঁধে খাওয়াও সবাই।"
কমলা মৃদু মৃদু হেসে বলে, "তোমার গরীব বোন বিশেষ কিছু খাওয়াতে ভাই পারবে না। নিতান্তই সাদাসিধে খাওয়া। হয়ত' পেটই তোমার ভরবে না এত সামান্য ব্যাপার।" কমলা বারান্দার বাল্‌তি কাত করে কথার শেষে।

"তাই যদি জান যে আমার পেটই ভরবে না তবে ডেকে এনে বিভ্রাট করলে কেন ভাই? এখনই খিদে-খিদে করছে রান্নাঘরের গন্ধে, অথচ বলছ কিনা পেটই ভরবে না!"

কমলা লজ্জা-মিশ্রিত হাসি হেসে বললে, "দিদির সঙ্গে কথায় কি পারা যায়! বলছিলাম, তোমরা কত কি ভাল ভাল জিনিস খাও, আর আমরা হলাম গরীব গেরস্ত, আমাদের মত তুমি ত' মুসুর ডাল, মাছের ঝোল, ডাঁটা চচ্চড়ি খাও না—তাই!" কমলা হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে নিজের অবস্থার সঙ্গে অসীমার পার্থক্যটা খোলাখুলি ভাষায় বলে।

কমলার কথার উত্তরে অসীমা সকৌতুকে বললে, "বেশ ত' আগে রান্নার আয়োজনটাই না হয় দেখি। তারপর বিচার করা যাবে পেট ভরবে কি ভরবে না সে কথা!" বলতে বলতে অসীমা রান্নাঘরের দিকে সত্যিই এগিয়ে যায় দেখে কমলা দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে যায় ধোঁয়ায় নোংরা শক্ত শিকলটা খুলে দেবার জন্যে।

অসীমা কমলার উনানের সামনে পিঁড়িখানায় ঝপ্ করে বসে পড়ে গামলার জল থেকে ভিজান খুন্তিখানা তুলে চেঁচিয়ে ওঠে: "বল কি ভাজা ভাজবো—তেল, কড়াই কোথায়?"

কমলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠে বলে, "রক্ষে কর, তোমায় আর ভাজা-ভুজি করতে হবে না, শেষে পুড়ে ঝুড়ে বিপদ ঘটাও আর কি!" কিন্তু কে শোনে কমলার সাবধান-বাণী, ততক্ষণে অসীমা একটা কাঁসিতে নুন হলুদ মাখা বেগুনগুলো ঝুড়ির তলা থেকে টেনে নিয়ে, রান্নার পোড়া কড়াইটা দেওয়ালের পেরেক থেকে নামিয়ে উনানে বসিয়ে দিয়েছে। "হ'ল ত' হ'ল ত' হাতখানার সৌন্দর্য্য! যাও হাতটা সাবান দিয়ে শীগগির ধোওগে, আমি ভাজছি।" বলতে বলতে প্রায় জোর করেই অসীমাকে কমলা পিঁড়ে থেকে উঠিয়ে স্নান-ঘরের দিকে নিয়ে যায় সহাস্য মুখে।

স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে অসীমা হাতটা রুমালে মুছতে মুছতে রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, "বেশ কথা রইল আমি একদিন রান্না করব। দেখবে, কেমন রান্না করি। হুঁ! উনিই যেন ভাল রাঁধেন আমিও পারি।"

"পার বলেই ত' শুকন কড়াইখানা উনুনে বসিয়ে গেছ।" বলে কমলা সাঁড়াশী দিয়ে তেতে লাল হয়ে ওঠা কড়াইটা দুম্ করে নামিয়ে ফেলতেই জলের ছিটে লেগে তাতা লোহাটা শব্দ করে উঠল ভীষণ ভাবে।

এদিকে মাসীমাকে দেখে খোকন স্কুল থেকে একটা দৌড়ে উঠানে ঢুকেই চমকে ওঠে কড়াইখানার শব্দে। কমলা খোকনের অবস্থা বুঝে বলে ওঠে, "কড়াইটা কেমন রাগে ফড় ফড় করছে! ধরবে কিন্তু শীগ্গির পালা তোর মাসীমার সঙ্গে, আমি যাচ্ছি।"

অসীমা বোঝে কমলা তাকে রান্নার দিক থেকে সরিয়ে দিতে চায়, তাই সে হেসে বললে, "চল্ যাই আমরা।"

"হ্যাঁ, তাই চলো মাসিমা।" বলে খোকন তার মাসমীকে জড়িয়ে ধরে ঘরে পালিয়ে আসে কড়াই ধরার ভয়ে। কমলা বাকী রান্নাটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে সেরে নেয় খোকনের জিম্মায় অসীমাকে বসিয়ে।

খোকন আর অসীমার গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে কমলা এসে যোগ দিচ্ছে যদিও, কিন্তু কেন জানি আজ মনটা তার অসীমার কাছে সহজভাবে প্রতিবারের মত এগিয়ে যেতে পারছে না। কেবলি স্বামীর স্বার্থপর কথাগুলো মনে কাঁটার মত খচ্খচ্ করছে। কিন্তু সে ত' মালিক হিসাবে তাকে আজ নিমন্ত্রণ করেনি! স্নেহ করেন বড় দিদির মত তারই দাবীতে সে খেতে লিখেছে। এতে স্বামীর চাকরির উন্নতির সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? এই কিছু আগেও রুই মাছটা রান্নাঘরের সামনে দমাস্ করে ফেলে রাখতে রাখতে কমলার স্বামী বলেছে, "এত সামান্য আয়োজনে কি হাতে আসে! বেশ কিছু যোগাড় কর যাতে করে স্যার হরিনাথের

হবু জামাই আমাদের হেড-কোয়ার্টারের জেনারেল ম্যানেজারটিও থান তার ব্যবস্থা চাই। উনিই তোমার দিদির বুদ্ধিদাতা গণেশ, সে জান ত' ? তেল দিতে হ'লে দু'দিক থেকেই দিতে হয়। কিন্তু তুমি যে ছাই পাটি দিতে পারবে না! পারলে দেখতে এই শর্ম্মা টাইম কিপারের কাজ থেকে চাই কি হেড ক্লার্ক হয়ে যেতে পারত। যাক্ তবু ধীরে ধীরে যা হয়। দই মিষ্টি সবই এনে দিলাম এখন কাজটি যাতে সুশৃঙ্খলে হয়, তার চেষ্টা করবে। ছেলেটাকে ভজিয়ে দেবে খুব যাতে 'মাসীমা মাসীমা' করে। মানে, ওর খরচটাও যদি ওঠাতে পার। বুঝতেই ত' পার এই দিনে সংসার চালান কি দায়! দেশ ছেড়ে বিদেশে দুটো টাকার জন্তেই ত' আসা!" কমলা শিউরে ওঠে কথাগুলো মনে করে।

স্বামীর মনের এই ইতরবৃত্তির জন্য কমলা মাঝে মাঝে গোপনে চোখের জল ফেলে। দরিদ্র হলেও এইভাবে সম্মান খোয়ান যায় না। বিশেষ করে যার মনটা, কমলা কাঁচের মত স্বচ্ছ মনে করে, তার কাছে এত ভাবে স্বার্থের জাল বুনে এগুতে কেমন ঘৃণা লাগে। একদিনই ত' স্বামীর শেখানর কথা বলে অসীমার কাছে উত্তর পেয়েছিল। সুতরাং খোশা-মোদ যে সহ্য করতে পারে না, তাকে খোশামোদ করে স্বামীর উন্নতি করতে সে পারবে না। আজকাল স্বামীর মুখে এই সব স্বার্থসিদ্ধির হীন কথাবার্ত্তা শুনলেই কমলার মনটা রুক্ষ হয়ে উঠে! স্বামীকে সে ভাল-বাসে, ভক্তি করে, তাই বলে যেটা অন্যায় সেটা কমলা কখনই স্বীকার করতে পারবে না। চুরির দায়ে যখন স্বামীর স্টিমার ঘাটের কাজটা যায় তখন নব-বিবাহিতা স্ত্রী কমলাকে দিয়েই স্বামী বড় সাহেবের পায়ে ধরিয়ে বেঁচে যায়। আজও কমলা সেই দিনটা ভোলেনি। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে একটা বিলিতী সাহেবের পায়ে ধরে কেঁদে পড়েছিল খোকনকে কাঁথা জড়িয়ে বুকে আঁকড়ে। সেদিনটা বিপদের ছিল, বাঁচতে হবে বলে এ সব করতে হয়েছিল। কিন্তু যেখানে আরামে আছে, সেখানে

এসব হীন স্বার্থবুদ্ধি কেন? কমলার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিয়ে অসীমা ডাকে: "আরে এরা কি খেতে দেবে না? বারটা যে বাজল! বল্‌ত' খোকন মাসীমা খিদের জ্বালায় শুয়ে পড়ল কিন্তু—"

কমলা ব্যস্তভাবে বেগুনভাজা ক'খানা থালাতে নামিয়ে রেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "তুমি উঠে এসো দিদি, আমি সব ঠিক করে রেখেছি। এসো এই ঘরে।" বলে কমলা আঁচল থেকে চবি নিয়ে পাশের ঘরের দরজার তালাটা খুলে ফেললে। পিছন থেকে অসীমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তালা দিয়েছ কেন? ছিটকিনি নেই বুঝি দরজায়?"

"সবই আছে গো, সবই আছে, তোমার লক্ষ্মী বোনপোটির ভয়ে তালা দিয়ে ঠাঁইটা সাজিয়ে রেখেছি।" বলতে বলতে কমলা ঘরের জানালাগুলো খুলে দিলে দু'হাত বাইরে ঠেলে। তারপর আসনের সামনে কাঁচের প্লেট দিয়ে ঢাকা খালি গ্লাসটা সামনের কুঁজো থেকে জল ঢেলে এগিয়ে দিয়ে সহাস্যে বললে, "তুমি বসো, আমি ভাত আনছি।" কমলা দৌড়ে ছোট্ট মেয়ের মত চলে যায়।

অসীমা আসনে বসে কমলার ঘরের চতুর্দ্দিকটা ভাল করে দেখতে থাকে। প্রত্যেকটি বাড়ী যে মাপে তৈরি এইটিও সেই মাপেই তৈরি, কিন্তু চমৎকার একটি শ্রী ঘরটিকে যেন ঘিরে রেখেছে। গরীবের অল্প আয়ে গৃহসজ্জা কিছুই নেই যদিও তবু যে ক'টি জিনিস রয়েছে তারই সুন্দর একটা পরিপাটি গোছ অসীমার চোখকে স্নিগ্ধ করে। দেওয়ালের গায়ে বৈঞ্চিতে গোটা চারেক ট্রাঙ্ক পাড়ের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা, এককোণে ঠাকুরের আসন পাতা, ঘটে ফুল সাজান, লক্ষ্মীর পটে সিঁদুর পরান। এদিকে বড় একটা সিন্ধুকের উপর কিছু কাঁচের পুতুল, খেলনা, আরশি, চিরুণী, সিঁদুরকৌটো ঝেড়ে মুছে রাখা। দেওয়ালে লম্বালম্বিভাবে তার টাঙ্গান, তারের উপরে ধোয়া শাড়ী, জামা, ধুতি ইত্যাদি পাট করে সাজান রয়েছে। জানালায়, ঢাকাই ছেঁড়া

শাড়ীর পর্দা এমন নিপুণ করে কমলা লাগিয়ে দিয়েছে যে, দূর থেকে ধরাই যায় না যে এটা রঙীন কোন ছিট নয় বলে! ঘরের মেঝে থেকে দেওয়াল ঝকঝক করছে এমন ঝাড়ামোছা! খোকন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, "আসব মসীমা?"

কমলা দু'চোখ কপালে তুলে বলে: "সর্ব্বনাশ! তুমি এঘরে নয় বাবা, ততক্ষণ খুকুর সঙ্গে খেলা করগে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে কমলা রান্নাঘর থেকে দু'হাতে ধরে বিরাট একখানা থালা অসীমার সামনে আস্তে নামিয়ে রাখলে। তারপর বললে, "বেশী কিছু নয় সব খেতে হবে কিন্তু—"

অসীমা থালার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "মানুষটা এতবড় হলে কি হয়, এত কি খাওয়া যায়! বাবাঃ শাক, স্তুক্ত থেকে আরম্ভ করে মাংসে পর্য্যন্ত দৌড়েছ!"

কমলা আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটা মুছতে মুছতে বলে, "কিছু এমন বেশী নেই, তুমি খাও দিকি!" কথার শেষে অসীমার। পাতের কাছে পাখা হাতে বসতেই অসীমা খপ্ করে পাখাটা কমলার হাত থেকে নিয়ে বলে, "রাখো পাকা বুড়ীর ঢং—তুমি নিজের খাবার আগে বেড়ে নিয়ে এসো, তারপর খাওয়া যাবে পাল্লা দিয়ে।"

অগত্যা কমলা কি আর করে, অসীমার হাতেই পাখা করার ভারটা দিয়ে এক এক করে দই, মিষ্টি, পায়েস, নিজের ভাত ইত্যাদির বিরাট একটি আয়োজন নিয়ে এসে বসে, নিজেই বললে, "তোমার ভগ্নিপতি দেখলে এখন নিশ্চয়ই ঠাট্টা করত। এই জন্মেই লোকে বলে মেয়েরা শেষে খায় দিব্বি রয়ে-সয়ে। তা বাপু মন্দ কথা নয়, ওদের মত একেবারে উনুন থেকে নামতে তর-সয়না অবস্থায় কি খাওয়া যায়!"

অসীমা টুকে টুকে ঝোলের মাছটা খেয়ে সহাস্যে বললে, "এখন একটা মেডেলের ব্যবস্থা করতে হয়! সত্যি তুমি ভাল রান্না কর। মাছের ঝোলটা চমৎকার হয়েছে।"

অসীমার প্রশংসায় কমলা খুশি হয়ে বললে, "খোলটা সবটুকুই তুমি নাও না দিদি! কইমাছ তুমি ভালবাস সেদিন কথায় কথায় বলেছিলে আমার মনে আছে। তাই ওঁকে কলকাতা পাঠিয়ে এনেছি।"

"পাগল একেবারে!"—অসীমা কমলাকে খুশি করতে এটা-ওটা খাওয়ার পর কম দুধের মধ্যে বেশি চাল দেওয়া আঠাল মতন পায়েসটাও শেষ পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলে কোন রকমে। মিষ্টি কম লাগে তবু কমলার স্নিগ্ধ মুখখানার দিকে চেয়ে কেমন যেন বাটিটা পাত থেকে নামিয়ে রাখতে সঙ্কোচ বোধ হয়।

কিছু আগে মাংসটা অসীমা একটুখানি চেখেই তেমন পছন্দ করি না বলে সরিয়ে রেখেছিল দেখে, এখন নিজের পাতে কমলা সামান্য একটু মাংস তুলে নিয়ে বলে, "আমিও তেমন পছন্দ করি না মাংসটা। খোকন কিন্তু মাংস বলতে অস্থির। ঠিক ওঁর মত।"

অসীমা একটু হাসে কোন রকমে পায়েসটা গিলতে গিলতে। তবু মন্দ লাগে না খাওয়ার আনন্দটুকু। হাত-মুখ ধুয়ে অসীমা কমলার শোবার ঘরে ঢুকল এলাচ ছাড়াতে ছাড়াতে।

এই ঘরখানার সঙ্গে অসীমার যথেষ্টই পরিচয় আছে। তবু আজ যে বিশেষ করে এই ঘরটি ধোয়ামোছা হয়েছে প্রতিটি জিনিস দেখেই অসীমা বুঝতে পারে। জানালা বরাবর বেঞ্চির সঙ্গে চৌকি জুড়ে বিরাট বিছানাটি আজ একটা সস্তা দরের সুজনী দিয়ে ঢাকা। দেওয়াল আলমারীর ভিতরে কমলার এটা-ওটা খুচরো জিনিস সাজান-গোছান। ঘরের একধারে কেরোসিন কাঠের হাল্‌কা দরের টেবিলটার উপর আজকে সাদা ধপধপে জালের কাজ করা একটা টেবিল ক্লথ বিছান হয়েছে। পাশেই একটা কাঠের তাক, তার উপর কাগজ পেতে খোকনের বই খাতা গোছান। টেবিলের উপর লেখার কিছু সরঞ্জাম আর একগোছা অফিসের কাগজপত্তর। অসীমা এদিক ওদিক চেয়ে

টেবিলের সামনে টিনের চেয়ারখানা টেনে বসে পড়ে বললে, "ভীষণ খাওয়া হয়েছে, রীতিমত অজগরের অবস্থা!"

ঘরের কোণে খোকন এতক্ষণ তার গোপন সম্পত্তি মার্বেলগুলো প্যাণ্টের পকেট থেকে বাছাই করে একমনে কি গুণে গুণে দেখছিল, এমন সময় হঠাৎ অজগরের কথা শুনে তাড়াতাড়ি অসীমার দিকে সে এগিয়ে এসে বললে, "আমার বইটাতে অজগরের চেহারা আছে, দেখবে মাসীমা?"

"হয়েছে অজগর আর দেখাতে হবে না তোমাকে।" কমলা ছেলেকে কপট শাসন ক'রে মাদুরটা মেঝেতে বিছিয়ে পাতল। তারপর, পাশের ঘর থেকে কাঁটা ফিতে আরশি নিয়ে বিকেলের পাটটা একেবারে সেরে নেবার জন্য মাদুরে এসে বসল। কিন্তু ততক্ষণে খোকন তার 'হাসি-খুশিটা' বার করে অসীমাকে এগিয়ে দিয়েছে।—"দেখছ কত বড় সাপটা?" খোকন অজগরের ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ে বিস্ময়ে চোখ বড় করে।

অসীমা খোকনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সহাস্যে বললে, "বই থেকে অজগর দেখার চেয়ে একদিন তোমাকে আমি জু গার্ডেনে জ্যান্ত সাপ দেখিয়ে আনব, তাহলেই বুঝবে অজগর কত বড়!"

খোকনের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল উল্লাসে। সে বললে, "কবে নিয়ে যাবে মাসীমা?" কমলা হাসতে হাসতে বললে, "দিলে পাগল নাচিয়ে। এখন শুরু হ'ল অজগর কবে দেখাবে! এই ছেলেটা মহা শয়তান!" কমলা খোকনের উদ্দেশে সস্নেহ তিরস্কার করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে। অসীমার দিকে তারপর ফিরে বললে, "ঐ পুরোন বই ঘেঁটে কি হবে দিদি! তার চেয়ে তুমি গল্প বল আমি চুল বাঁধতে বাঁধতে শুনি।"

অসীমা খোকনের বইগুলো থেকে একটা ছেঁড়া 'আনন্দ মঠ' বার করে

সকৌতুকে বলে উঠল: "ছেলে যে এখনই অনন্দ মঠ পড়ে। ব্যাপার কি?" কমলা আরশির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চুলটা উল্টে সরু চিরুনী দিয়ে সিঁথি চিরে নিতে নিতে জবাব করে, "ছেলেটা ভারী বই পাগ্লা দিদি! সেদিন সিন্দুক থেকে পুরোন বাসনপত্রের ভেতর ক'টা বই পেয়ে ঝেড়েঝুড়ে নিজের শেলেট পেনসিল 'হাসি খুশির' মতো গোছ করে রেখেছে—মহা বিদ্বান ত'!" ছেলের দিকে চেয়ে কমলার মুখে মিষ্টি হাসি ফোটে। কমলার হাসিতে খোকন লজ্জা পেয়ে ছুটে বাইরে যাচ্ছে দেখে হেসে অসীমা বললে, "আবার লজ্জা!"

কমলা মুখ টিপে হেসে বললে, "ছেলের বই-বই বাতিক ছোট্ট থেকে; উনি বলেন যে, জ্যাঠার রোগ পেয়েছে। শুনেছি আমার ভাশুর খুব নাকি বই-পত্তর পড়তেন। সব গেছে দেশের বাড়ীতে। বোঝই ত' উই ধরলে কিছু কি থাকে? তবু যা ভাল ছিল সঙ্গে এনেছিলেন, কিন্তু সেগুলোও নষ্ট হল!"

"কেন, এখানেও উই আছে নাকি?" অসীমা পোকায় কাটা বইখানার পাতা উল্টে প্রশ্ন করে কৌতূহলী ভঙ্গিতে।

"না না, এখানে উই আসবে কোত্থেকে? তবে এর আগে যেখানে ছিলাম ভাড়ার দায়ে উনি শেষ পর্য্যন্ত ভাশুরের বইগুলো বিক্রী করেন। অনেক ভাল ভাল বই ছিল ইংরেজী বাংলা।" কমলা কথার সঙ্গে সঙ্গে চুলের গোড়ায় ফিতেটা শক্ত করে বাঁধে আরশির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারপর হঠাৎ একটু হেসে আরশি থেকে চোখ তুলে অসীমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "বুঝলে দিদি, ছোট বেলায় জোড়া ভ্রূ আর সতীন চুলটাকে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু কাজে যখন শেষ অবধি সত্যি বলেই বুঝিয়ে দিলে, তখন থেকে এই দুটোর একটা কোন মেয়ের দেখালেই আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়! তাই ভাবছি তোমারও যে জোড়া ভ্রূ!"

অসীমা কমলার কথার যথার্থ ইঙ্গিতটা তেমন যেন ধরতে পারে না বলেই বইটার উপর দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করে, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না ত'!" কথার শেষে অসীমা বইটা বন্ধ করে কমলার দিকে চেয়ে সোজা হয়ে বসে বেশ যেন কৌতূহলী ভাবে।

কমলা চুলের বিনুনী করতে করতে হাল্‌কা গলায় একটু হেসে বলে, "ব্যাপারটা বোঝা অত সহজ নয়। অর্থাৎ, সোজা কথায় আমাদের মেয়েলী শাস্ত্রে আছে যে সতীন চুল থাকলে সতীন হয়। যেমন, আমার একটি সতীন আছে শেষে শুনলাম। তাই বলছিলাম, তোমার যখন জোড়া ভ্রূ তখন একটু ভাল করে খোঁজ নিও যে ইতঃপূর্ব্বে লাহিড়ী মশাই আর কোথাও কাজটা সেরে রেখেছেন কিনা!" কমলা হাসতে থাকে নিজের রসিকতায় চোখ মুখ উজ্জ্বল ক'রে। তারপর হাসিটা একটু থামিয়ে বলে উঠল, "পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই। আমার যখন বিয়ে হয় কথাটা একেবারে গোপন করেই বিয়ে হয়েছিল। নইলে, দোজবরের কি অভাব? বাবা আমাকে বড় ক'রে ঘরে রাখলেন শুধু এই বাছাই করতেই! কিন্তু কপালে আছে যাবে কোথায়! শেষে নিলামী মাল কপালে জুটল দিদি!"

অসীমা হেসে ফেললে কমলার গোপন দুঃখটা এতদিন পরে জানতে পেরে। সকৌতুকে সে বললে, "নিলামী জিনিস হলেও ভাঙ্গাচোরা যখন নয়, তখন ভাল বলেই গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে ভদ্রলোকটি খুব তোমাকে ভালবাসেন বহুবারই ত' বলেছ শুনেছি, তবু সতীনের প্রতি হিংসে করাটা কিন্তু উচিত হচ্ছে না।"

"বারে, আমি তাকে হিংসে করব কেন! বরং তাকে ঘেন্না করি মেয়ে জাতের কলঙ্ক দিলে ব'লে!—ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে কি এসব কাজ করে!" কমলা দ্রুত হাতে বিনুনী করতে থাকে কথার সঙ্গে সঙ্গে। অসীমা ক্রমশঃ যে পরের পারিবারিক ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে সেটা

বুঝতে পারে। সুতরাং ঐ প্রসঙ্গ এড়াতে খোকনের বইপত্তর উল্টে একটা কিছু নিয়ে সময় কাটানর উদ্দেশ্যে হঠাৎ মলাট-ছেঁড়া একটা বই টেনে বার করে পাতার উপর চোখ বুলিয়েই যেন চমকে উঠল, "এসব বই ছেলেমানুষকে দাও! করেছ কি!" বলতে বলতে অসীমা বইখানা কমলার মাদুরের উপর ছুঁড়ে ফেললে বেশ একটু অপ্রসন্ন মুখে।

কমলা এক নজরে বইটাকে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না! সেদিন পুরোন বইপত্তর থেকে এটা বেরুন মাত্র উনি ছিঁড়ে উনুনে জ্বালাতে দিয়েছিলেন। শেষে, কি আবার যেন মনে ভেবে বইটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। আর এই ছেলেটা কিনা লুকিয়ে তুলে এনেছে? আশ্চর্য্য বাপু! আমি সত্যি খবর রাখি না ভাই। আজ উনি দেখলে আবার চটে যাবেন। বোঝই ত' যে জন্যে সংসারে এতবড় কলঙ্ক পড়ল, তার দেওয়া বই স্বামী হয়ে কি কেউ সহ্য করতে পারে? বিয়েতে উপহার দিয়েছিল সেই লোকটা।" কথার শেষে কমলা বইখানার উপর একটা মুগ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে একটু হেসে মন্তব্য করলে, "বইটাতে রঙ্গিন রঙ্গিন ছবিগুলো কিন্তু বেশ চমৎকার!"

ছেঁড়া বইখানার ঐ রঙ্গিন অঙ্গভঙ্গি সহকারে বিচিত্র ফটোগুলোর প্রতি কমলার ঔৎসুক্য দেখে অসীমা না হেসে পারে না। বলে, "তখনকার দিনে বিয়েতে এ সব বই খুব চলত। তবে আমাদের কাছে এখন সস্তাদরের রঙ্গ-তামাসা মনে হয়। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে এই শ্রেণীর বই পড়া মোটেই উচিত নয়।"

কমলা মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে বলে, "সত্যিই ত' এ-সব ঢং শিখলে কি আর রক্ষে থাকবে! আমি বাপু এ-সব বই দেখিনি আগে। এই দেখছি যে, একজনেরই এমন নানাভাবে ফটো তুলে তাতে ছড়া-পাঁচালী বসিয়ে বই করে বেরুতে পারে বলে সম্ভব! সেদিন বিভাদি'র ওখানেও এমনি একটা বই দেখলাম, বিয়েতে কে উপহার দিয়েছিল, আর এই

এইখানা দেখছি। তবে বইটা যে আমার নয় এটা বোধ হয় নাম দেখেই বুঝতে পারছ। নামটা পড়েই দেখ না!" কমলা চুল বাঁধতে বাঁধতে বই-খানা হাতের ঠ্যালা দিয়ে অসীমার দিকে এগিয়ে দিল।

অসীমা উপহার লেখা পৃষ্ঠাটায় চোখ বুলিয়ে দুষ্টুমী করে বললে, "সতীনকে তুমি যে কতটা হিংসে কর এই ক্ষতবিক্ষত পাতাখানাই তার সাক্ষী। কিন্তু তোমার লক্ষণ মত, আমার জোড়া ভ্রূর খোঁচা খেয়ে একটি সতীন যদি হঠাৎ বেরিয়ে পড়ত, আমি কিন্তু তাকে এভাবে লোক-চোখের সামনে কখনই ক্ষতবিক্ষত করতে পারতাম না বোধ হয়। উঃ, কি হিংসুটে মেয়ে রে!"

কমলা খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে সহাস্যে জবাব দেয়, "আমি ক্ষতবিক্ষত করলে হতভাগীর ভাগ্য বলতে হ'ত! যাকে হতভাগী অপমান করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, সেই নিজে ঐভাবে নামটা কেটেছে। তারপর সেদিন ত' একেবারে রেগে চটে বইটাকেই ছিঁড়ে ঐ আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিলে! উঃ, যদি তুমি দেখতে ওঁর রাগটা ত' বুঝতে! তোমার ভগ্নীপতি এমনিতে ভারী চাপা মানুষ। গুমরে গুমরে থাকেন, কাউকে কিছু বলেন না ত'! কিন্তু সেদিন থিয়েটার দেখে এসে সে কি আবোল-তাবোল বকুনী! তেড়ে তেড়ে বাইরে যেতে চাওয়া, আমাকে গালমন্দ করা, কিছুই বুঝি না! পরের দিন শুনি থিয়েটারে বলে নাচনী হয়েছে বিদ্যেধরীটি।"

এক শ্বাসে কথাগুলো বলে কমলা একটু যেন দম নিয়ে সিঁদুর কৌটোটা খুলতে খুলতে মন্তব্য করে: "থিয়েটারেই যদি নামবি তবে ভদ্রঘরে জন্ম নিলি কেন? ছিঃ ছিঃ, শেষে হাজার হাজার লোকের সামনে ধেই ধেই করে নাচলি! সত্যিই ত' এসব চোখে দেখলে কি পুরুষ মানুষের ধৈর্য্য থাকে? উনি বলে রাগে চিৎকার করে স্টেজের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, শেষে ওঁর এক বন্ধু রীতিমত পাকড়ে

ধ'রে হল্ থেকে বার করে আনে। এত সাধের সাজাহান দেখা হয়ে যায় জীবনের মত! মাঝ থেকে সারারাত বিকারের রোগীর মত চেঁচামেচি আর তেড়ে তেড়ে ওঠা, দেখে আমি ত' ভয়ে-ভাবনায় অস্থির! একটা রাতে চেহারা পর্য্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। এমনি আঘাত মনে লেগেছিল!"

স্বামীর অপমানে কমলার স্বরটা বুজে আসে, তবু গলাটা ঝেড়ে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে। বলে, "আমি কিন্তু ওঁকে বলি যে মন খারাপ করা বোকামী যা হবার হয়েই ত' গেছে, নতুন কিছু ব্যাপার নয় ত'! সে এখন থিয়েটারেই নাচুক আর রাস্তাতেই ভিক্ষে করুক, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কি?—কি বলো দিদি? তবে আমি চটে উঠেছিলাম, যখন শুনলাম যে ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল ঝি দিয়ে প্রণাম করবে বলে। শোন আস্পদ্দাটা একবার! হতভাগী জাত-কুল খেয়ে এখন স্বামীকে ব্রাহ্মণ হিসেবে প্রণাম করবে!" কমলা তার সতীনের উপর ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে সিঁদুরকৌটোটার মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে সিঁদুর তোলে আলতভাবে কপালে টিপ আঁকার উদ্দেশ্যে।

অসীমা যদিও পরের ঘরোয়া কথাবার্ত্তায় যোগ দেওয়াটাকে কখনই রুচিসঙ্গত বলে মনে করে না, তবু কেন জানি নারীর সহজাত কৌতূহলের প্রাবল্যেই হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললে, "ডেকে পাঠালে, বল কি? সাহস কম না ত'?"

কমলা তার ছোট্ট আরশির ভিতর দিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে কপালের ঠিক মাঝখানে সিঁদুর টিপটা ঘষে ঘষে গোল করে তোলে নিখুঁতভাবে। তারপরে সিঁদুরকৌটোটি কপালে ছুঁইয়ে মাদুরের উপর রেখে চিরুনি পরিষ্কার করতে করতে বললে, "সাহস কম হ'লে কি আর ঘর ছেড়ে পরপুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে আসে দিদি? রূপের গরবে বলে মাটিতে পা পড়ত না! তাই ত' ভাবি, এত সুন্দর তুমি, কই রূপের গরব

দেখিনি ত' কখনো!—বসো, আমি এগুলো রেখে এসে সব বলছি। তবে, আমিও শোনা ঘটনাই তোমাকে শোনাব। আমি ত' দেখিনি কিছু, উনি যা বলেছেন তাই শুনে নিজেদের ওপরই ঘেন্না আসে যে, স্ত্রী হয়ে আমরা এমন অবিশ্বাসের কাজ করতে পারি!" কমলার কথার শেষ রেশটা মিলিয়ে যাবার আগেই, ব্যস্ত পায়ে সে পাশের ঘরে ঢুকে আরশি চিরুনি হাতে, এবং পরক্ষণেই বেরিয়ে আসে একটা তোয়ালে নিয়ে। অসীমার সামনে মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে কমলা নীচু গলায় আবার বলতে বসে—"এসব ঘরোয়া কথা আমার বাপের বাড়ীর লোকেরাও জানে না। তোমাকে বলছি আজ কথার সূত্রে নিতান্ত কথাটা উঠল বলে তাই।" কমলা একটু থেমে তোয়ালে দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে বলে, "তুমি জানই ত' আমরা গ্রামের লোক। তবে আমি গ্রামে কখনই থাকিনি। আমার সতীনই গ্রামের বাস সকলের উঠিয়ে দিয়েছিল। মানে, ঐখানেরই যাদব সরকার নামে একটি ধনী ভদ্রলোকের ছেলে মানিকের সঙ্গে আমার সতীন রাতারাতি পালায়। অবশ্য উনি বলেন যে, এত শীগ্‌গির বোধ হয় ওরা পালাত না, নিতান্ত ঘরের বেড়া কেটে মুসলমানগুলোর যাওয়া আসাটা হঠাৎ ধরা পড়ে গেল বলেই সরসী সুন্দরীকে একেবারে বেপাত্তা হতে হ'ল। কিন্তু এখন শুনছি যে, সেই মানিক ছোঁড়াটাকেও নাকি ফেলে অন্য কার সঙ্গে আবার পালিয়ে গেছে। সেদিন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মানিকের। লজ্জায় বেচারী কেঁদে ফেলে আর কি! খুব নিন্দে করে বলে যে, ওকে নাকি সারাক্ষণই সরসী খোঁচাত কোলকাতায় নিয়ে আসার জন্যে। শেষে বাধ্য হয়ে সরসীকে নিয়ে মানিক পালায়। পুরুষমানুষ হয়ত' রূপের নেশা লাগতে পারে, কিন্তু তাই বলে হতভাগী তুই জাত-কুল খাস্ কি করে!" হঠাৎ কমলা তার কাহিনীর ছেদ টেনে, ব্যস্ত ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠল: "দিদি, দিদি, কি হ'ল?

তুমি মাথাটা এমন করে চেপে ধরলে কেন? মাথা ঘুরছে, হাওয়া করব?" কমলা তাড়াতাড়ি মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পাখার খোঁজে।

অসীমা দু'হাতে মাথাটা ধরে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। দু'চোখে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, সব বুঝি মিলিয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে। সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে মনে হচ্ছে যেন কিসের একটা ঘৃণ্য স্পর্শে গলা ঠেলে কিছু আগের খাওয়া খাদ্যগুলো উগ্‌রে উঠতে চাইছে। বুঝি এই ঘরটা থেকে ছুটে পালাতে পারলে সে বেঁচে যায়। কিন্তু উঠতে পারছে না। কোমর থেকে পায়ের দিকটা হঠাৎ যেন একটা চোট খেয়ে ভেঙ্গে দুম্‌ড়ে গেছে। তাই, পঙ্গুর মত রুদ্ধ রোষে সারা দেহ-মন মুচড়ে মুচড়ে অসীমাকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে। উঃ, কি স্পর্দ্ধা! অসীমা দাঁতে দাঁত ঘষে ক্রুদ্ধভাবে হিংস্র মনে। যে ঘৃণ্য কুকুরটা আজ তারই অন্নে অন্নসংস্থান করছে, এক্ষুনি তাকে জীবন্ত অবস্থায় সে মাটিতে পুঁতে ফেলবে তার স্পর্দ্ধার চূড়ান্ত দণ্ড হিসাবে। দেখিয়ে দেবে, একদিন অসহায় নারী বলে যাকে সকলে সমাজ থেকে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ সেই সমাজচ্যুতা নারীর ক্ষমতা কত উচ্চে উঠে দাঁড়িয়েছে। সরসী পনের বছর আগে পদ্মার জলে ডুবে গেছে বটে, কিন্তু তার অপমানের স্তূপ থেকে যে অসীমা তিল তিল করে নিজেকে সৃষ্টি করেছে, সেই মহিমান্বিতা নারী মিলের কর্ত্রী অসীমা দেবী মিথ্যাবাদী কাপুরুষ জঘন্য মনের মানুষটাকে এই মুহূর্ত্তে মিলের সীমানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।

ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সামান্য ক'টা টাকার লোভে স্ত্রীর দায়িত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারে যে মানুষ, তাকে অসীমা শুধু ঘৃণাই করে না, তার নারীত্বের অপমানের প্রতিহিংসা আজ সে নেবে! দিন এসেছে, সে বুঝিয়ে দেবে পঁচাত্তর টাকার টাইমকিপার সুরেন চক্রবর্ত্তীর

চেয়ে কত বেশী নিষ্ঠুর কূটবুদ্ধি রাখে এই মিলের মালিক অসীমা দেবী। আজ আর সেই অবোধ সরলা বালিকা সরসী বেঁচে নেই, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যাকে সবাই সৃষ্টি করে তুলেছে, সেই অসীমা দেবীর, একটা হুকুমমাত্র! সুরেন চক্রবর্ত্তীকে মিলের সীমানার মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে চিরদিনের জন্য। যে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে আজও সে তার স্ত্রীর কাছে সরসীর অকলঙ্ক চরিত্রে কালি লেপে দিচ্ছে, তার প্রতিহিংসা চাই! অসীমা ক্ষমা জানে না, শুধু জানে প্রতিহিংসা!

প্রতিহিংসার আনন্দে সরসীর সমাজলাঞ্ছিতা অপমানিতা আত্মাটা শান্তির স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়বে চিরদিনের জন্যে।

উত্তেজিত ভাবে অসীমা মাথা খাড়া করে তুলতেই কমলা তাড়াতাড়ি পাখাখানা নামিয়ে রেখে মুখের উপর ঝুঁকে আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করে: "এখন একটু সামলেছ কি? মাথা ঘুরে পড়তে আর একটু হ'লে! ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেছে রামু।" কমলা কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমার মাথায় জল হাত বুলিয়ে বাতাস করতে থাকে।

এদিকে কখন যে খোকন ঘরের ভিতরে এসেছে কমলা লক্ষ্য করেনি। এখন সে ভয় ভয় ভাবে অসীমার কাছে এগিয়ে ভীতু গলায় বলে, "মাসীমা তোমার কি হয়েছে, ডাক্তার ডাকতে হবে কেন?—জ্বর হয়েছে?" কথার সঙ্গে সঙ্গে খোকন ব্যাকুলভাবে অসীমার মুখের দিকে তাকাল দেখে এতক্ষণ বাদে অসীমার হারিয়ে যাওয়া সম্বিতটা যেন হঠাৎ সে আঁকড়ে ধরে। ক্লান্ত শরীরটা ডেক-চেয়ার থেকে টেনে তুলতে তুলতে অসীমা খোকনের উদ্দেশ্যে বলে, "দূর কিছু নয়! যত সব বাজে ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করা!—সত্যি কিছু হয়নি আমার!" কথার শেষে যেন এই মুহূর্ত্তের সম্পূর্ণ ভারী আবহাওয়াটাকে সে অবজ্ঞার সঙ্গে দু'পায়ে ঠেলে উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে।

একদিন যে ঘর আত্মহত্যা করার মুখেও তাকে টেনে ফিরিয়ে আনেনি,

আজ সেখানে অতুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হয়ে প্রতিহিংসার কথা কেন মনে উঠবে! ঐ জঘন্য বৃত্তির লোকটাকে সেদিন ত' সরসী অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেই চলে এসেছে, তবে কার সঙ্গে সে প্রতিহিংসা করবে! প্রতিহিংসা করতেও সমান স্তরের লোক দরকার। মানুষ আর পশুর মাঝখানে প্রতিহিংসা সাজে না। যদি তার একমুষ্টি ভিক্ষায় পথের কুকুরটা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, তাতে কি আসে যায় এই মিলের মালিকের? এমন কি, তার পাতের পাশ থেকে কুড়িয়ে ফেলা চারটি ভাত যদি এই দীন, দরিদ্র অসহায় বধূটি সন্তানের মুখে তুলে দিত, তবু অসীমা বাধা দিত না। ঐ শিশুর উপর কোন হিংসা দ্বেষ ত' নেই অসীমার। মিলের আর সব শিশুর মতই এই শিশুটিও অসীমার ভবিষ্যৎ। সুতরাং তাদেরই খাতিরে সামান্য পঁচাত্তরটা টাকার দান নিয়ে যদি এই পরিবারটি বেঁচে থাকতে চায়, তাতে অসীমা বাধা কেন দেবে! অতুল সম্পত্তিশালিনী অসীমা চিরদিনই ত' দীন-দরিদ্রকে দান করেছে। মনের চাপা উল্লাসে অসীমা যেন খুশির দোলায় দোল খেতে খেতে উঠানে নেমে পড়ে। কমলা দেখুক, সুরেন চক্রবর্ত্তী দেখুক, আজ সেই সরসীর অপমানিত আত্মা থেকে সৃষ্ট 'অসীমার জন্য তার দরজায় লোকের ভিড় কত, কত বেড়ে গেল। ডাক্তার দুটি এসেছেন, লেডি ডাক্তার আসছেন, নার্সরা সবাই ছুটোছুটি করছে, ষ্ট্রেচার নিয়ে হন্‌হন্‌ করে কুলীগুলো এসে পড়ল। সবাই ব্যস্ত মিলের মালিক শ্রীযুক্তা অসীমা দেবী হঠাৎ রোদ লেগে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। অসীমা হাসতে হাসতে রাসুর দিকে চেয়ে বলে, "আরে সামান্য মাথা ঘোরায় যে গোটা হাসপাতালটা ভেঙ্গে নিয়ে এলে দেখছি! চলো চলো আমি হেঁটেই যেতে পারব।" অসীমা সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবনের পূর্ণ বিকাশে মুখ টিপে টিপে হাসে কমলার দিকে চেয়ে।

ষোল

ভোরের স্নিগ্ধ নরম আলো খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে পৃথিবী নবজন্ম লাভ করছে। চতুর্দ্দিক স্তব্ধ শান্ত। মাঝে মধ্যে দু'একটা পাখীর ডাক দূর থেকে যেন বাতাসে ভেসে ভোরের আগমনী সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে।

অসীমা খোলা জানালাটার দিকে একটু সময় বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলে, "উঃ, কি দুঃস্বপ্ন! সেই নোংরা, গ্লানী-ভরা পুরোন জীবনটা কি আমাকে সত্যিই মুক্তি দেবে না? তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ না রাসু!" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা সোফায় সোজা হয়ে বসে রাসুর হাতটা ছেড়ে দিয়ে।

রাসু যদিও অসীমার মানসিক অবস্থাটা বোঝে, তবু তাকে সান্ত্বনার প্রশ্রয় দিয়ে দুর্ব্বল করে দিতে চায় না, কিম্বা এ প্রসঙ্গ সে উত্থাপন করতে রাজী নয় বলেই হঠাৎ যেন রাগত স্বরে বলল, "তোমার এসব পাগলামী আমি শুনতে চাই না। সারারাত যথেষ্ট বকেছ, এখন আর বকবক না ক'রে, যাও স্নান করে কিছু খাও দিকি! কি এক গেরোই আমার কপালে কর্ত্তাবাবু রেখে গেলেন, একটু যদি স্বস্তি দিলে কোনদিন!"

রাসুর বিরক্তিতে অসীমা ক্ষুব্ধ হয় না, শুধু ম্লান হেসে ধরাগলায় বলে উঠল, "সত্যি, সেদিন যদি পদ্মায় ডুবে মরতাম তবে, আজ এ সমস্যায় পড়তে হ'ত না! কতকাল এই মিথ্যে পরিচয় দেওয়া যায়! দিন দিন যেন ভারী বোঝার মত হয়ে উঠছে উপরের এই রং করা খোলসটা।" অসীমা চাপা কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে সোফায় মুখ গুঁজে।

রাসু তার ধৈর্য্যের বাঁধটা আর বোধ হয় রাখতে পারে না। সে মুখটা বিরক্ত ক'রে চাপাগলায় তীক্ষ্ণভাবে বলে ফেলে, "এতই যদি বোঝার মত হয়, বেশ ত' সবাইকে ডেকে ডেকে নিজের পরিচয়টা দিলেই পার! আজই আমি কাশী চলে যাচ্ছি; আমার কি এত দায় শুনি! মনে মনে জানব যে সত্যিই পর কখনো আপন হয় না!—ছিঃ, এত নেমকহারাম তুই? আমি হাতে করে মানুষ করলাম, আমার কথা তুই শুনবি না; বলতে তোকে হবেই? না, না, তার চেয়ে আমি বরং কাশী চলে যাই, তারপর অদৃষ্টে তোর যা থাকে হোক আমি দেখতে আসব না।" রাসুর স্বর দুঃখে অভিমানে জড়িয়ে যায়।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর রাসু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বলে, "বেশ, যা বলার আমিই শচীনদাকে গুছিয়ে বলব। দয়া করে নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা আর না করে, স্নান সেরে নাও। এখুনি বোধ হয় শচীনদা আসবে। ঘর ভর্ত্তি লোক, কে যে কোনখান থেকে কি শুনে ফেলবে, শেষে সব নষ্ট হবে! যাও আর বসে থেকো না আমি নিচে যাচ্ছি. বামুনদি দু'বার দরজা ধাক্কা দিয়ে গেছে।" রাসু ব্যস্তভাবে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আবার কি মনে করে ফিরে এসে মিষ্টি সুরে বলে, "তোকে বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে, এক কাপ গরম চা করে দিই খা, কেমন? দেখিস, শরীরটা একটু চাঙ্গা বোধ হবে। না না করিসনি, লক্ষ্মীটি।"

এই মমতাময়ী নারীটিকে অসীমা মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারে না। কাল রাতেও ঐ বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মধ্যে সবলে আঁকড়ে ধরে জীবনের ব্যর্থতায় ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, ভুলে যাওয়া সেই অপমান কাহিনী আবার নূতন করে যাকে সে শুনিয়েছে, সেই স্নেহ-মমতায় গড়া রাসুকে জীবনের পাশে না পেলে অসীমা বাঁচবে কি নিয়ে! সত্যিই সে যে তাকে আগলে রেখেছে দুঃসহ জ্বালার ভিতর থেকে। রাসুর কাছে

অসীমার কিছুই ত' অজানা নেই! অসীমা সজল চোখ দুটো মুছে ফেলে, বাধ্য মেয়েটির মত বলে, "দাও।"

খুশি হয়ে রাসু বলে, "এই ত' আমার লক্ষ্মী দিদি! চা খেয়ে তারপর স্নান সেরে নাও।" কথার সঙ্গে সঙ্গে রাসু চা আনতে চলে যায় দ্রুত পায়ে বারান্দা পেরিয়ে।

চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে অসীমা সবেমাত্র টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শচীন লাহিড়ীর হর্ণ নিচেতে শোনা গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্য অসীমা যেন চমকে উঠল। তারপর, কান পেতে সিঁড়িতে পদশব্দ শোনার ব্যর্থ চেষ্টা করলে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত্ত অসীমার কাছে ভারী পাথরের মত মনে হচ্ছে। সিঁড়ির বাঁকে পায়ের শব্দ থেমে গেল যেন! অসীমা রুদ্ধশ্বাসে সোফায় বসে থাকে। তবে কি রাসুই সব ভাবনার শেষ করে দিয়েছে? অসীমার মাথাটা দুশ্চিন্তার জালে ঘুরছে, তবু দরজার দিকে জোর করে সে এগিয়ে যায়। অনুসন্ধান করে জীবনের আর একটা ভুল বুঝি স্পষ্ট করে আজ জানতে চাইছে। কিন্তু দরজা অবধি গিয়ে অসীমাকে আবার ফিরে আসতে হয়। সারা দেহ মন লজ্জায় ঘৃণায় শিরশির করে উঠছে, সে বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ল। শচীন লাহিড়ীর চোখের সামনে থেকে অসীমা নামে ঐ সুন্দর ঝকঝকে রং করা খোলসটা খসে পড়েছে আর—আর—ধীরে ধীরে তার ভিতর থেকে মাথা খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছে পদ্মা পাড়ের রাজবাড়ী নামে এক অখ্যাত পল্লীর বধূ সরসী!

বিহ্বল অসীমাকে চমকে দিয়ে রাসু বলে উঠল, "এই ত্যাখো মেয়ের হাল। সারা রাত কিভাবে যে কেটেছে সবই ত' বললাম, এখন তুমি যদি পার বোঝাও।" কথার সঙ্গে সঙ্গে রাসু ঘরে ঢোকে শচীন লাহিড়ীকে নিয়ে। অসীমার বিবর্ণ পাংশু মুখের দিকে চেয়ে সহাস্যে শচীন লাহিড়ী বলে উঠল, "বেশ ত' পুরোন কাহিনী যদি এমনই মুখরোচক বোধ হয়, রাসু

-আর একবার না হয় শোনাক, তারপর একটা বোঝাপড়া করা যাবে। সুতরাং রাসু চটপট ঐ গেঁয়ো ভূতটার কথা তুমি বলতে সুরু করে দাও, আমি কিন্তু প্রস্তুত।" বলে সে একেবারে অসীমার পাশে বিছানার উপর বসে দিব্বি সপ্রতিভ মুখে।

রাসু অসীমার ঐ আতঙ্কে শক্ত হয়ে বসে থাকা চেহারাটার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য একটু সতর্ক চোখে তাকায়। তারপর সামান্য যেন হাসবার চেষ্টা করে শুকনো গলায় বলে, "হ্যাঁ বাপু, যা বলার সামনাসামনি বলাই ভাল, শেষে মেয়ে আমার জীবনভোর ফোঁস ফোঁস করবে এ আমিও চাই না। যদিও কর্ত্তাবাবু বলি বলি করেও বলেন নি, অর্থাৎ সুযোগই হয়নি, অতএব আমাকেই বলতে হবে।" ব'লে একশ্বাসে যে কাহিনীটি রাসু গড়গড় করে বলে যায়, তার মোটামুটি অর্থটি এই দাঁড়ায় যে, অসীমার দাদামশাই অসীমাকে অতি শিশু বয়সে বিয়ে দেন তাঁরই এক গ্রামের লোকের সঙ্গে। কিন্তু সেখানে সে খুব কষ্ট পায় এবং এক রাতে ঘরে চোর ঢোকায় শিশু মেয়েটির উপর চরিত্র দোষ দিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে একদল হয়ে স্বামী ভাশুর সবাই তাকে তাড়িয়ে দেয়। অসীমার বিবাহিত জীবনের ঐখানেই সমাপ্তি ঘটে, এবং স্যার হরিনাথ তখনই মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তারপর ধীরে ধীরে স্যার হরিনাথের বিপুল অর্থ, খ্যাতি এবং অসীমার জীবনও আবার নূতন ভাবে গড়ে ওঠে।

শচীন লাহিড়ী সশব্দে হেসে উঠে বলে, "যাক্ কাল রাতটা তা'হলে পুরোন কাহিনীর চর্চ্চা হয়েছে, কিন্তু আমি ওসব মোটেই গ্রাহ্য করি না। তবে তোমরা যদি ইচ্ছে কর সেই গেঁয়ো ভূতটাকে ডেকে আনতে পার আমি ডুয়েল লড়তে রীতিমত প্রস্তুত। অর্থাৎ, সহজে অধিকার আমি দেব না।"

এতদিন রাসুর মনের অতি গভীরে যে আতঙ্কটা বাসা বেঁধে লুকিয়েছিল, আজ শচীন লাহিড়ীর সরল হাস্য-পরিহাসের ঝাপ্‌টায় সেটা হঠাৎ যেন

পথ হারিয়ে সহজ হয়ে যায়। উৎফুল্ল ভঙ্গিতে রাসু বলে, "ঐ হতভাগাটার নাম আর করো না ভাই! কর্ত্তাবাবু ত' হাড়ে চটা ছিলেন ওদের ওপর। মেয়েকে বলেই দিয়েছিলেন যে, তুমি এই ঘটনাটাকে গতজন্ম বলে ভাববে। তোমাকে আমি রীতিমত শিক্ষা দেব, তারপর আবার বিয়ে দেব। কিন্তু হঠাৎ কাল কি যে হ'ল ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যি এত যেখানে আলাপ পরিচয় সেখানে এসব ভয় ভাবনা কেন যে হয় বুঝি না বাপু!"

রাসুর মুখের কথাটা যেন কেড়ে নিয়ে শচীন লাহিড়ী বলে, "তুমি আমি বুঝব কি করে বল! আমরা ত' আর অসীমা দেবীর মত পা মেপে পথ চলি না, যে এসব বুঝব? তবে আমি স্পষ্টই বলছি, তোমাদের দিদিমণিটির ঐসব অতীত নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করি। সুতরাং, আমি পিছিয়ে যেতে রাজী নই, তুমি দিন স্থির করতে পার। তবে, তার আগে বল দিকি এই উদ্ভট চিন্তাটি আমার মাননীয়া মালিক মহাশয়ার মাথায় হঠাৎ গজাল কি জন্যে?" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীন লাহিড়ীর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ভেদ করে চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

অসীমা তখনও বোকার মত শূন্য দৃষ্টিতে শচীন লাহিড়ীর মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে রাসু মনে মনে চটে ওঠে। ভ্রূটা কুঞ্চিত করে রাগতস্বরে বলে, "ঐ ত' কাট হয়ে বসে রয়েছে, ওকেই জিজ্ঞেস কর না কেন? সারা রাত জ্বালিয়ে মেরেছে, এখন আমার আর ভাল লাগছে না এসব ব্যাপার। মেয়ে নয় ত' কাল সাপ! যা হয়ে গেছে তাই নিয়ে মাথা ঘামান। আমার এসব মোটেই সহ্য হয় না বাপু!"

"সহ্য না হ'লে চলবে না ত' রাসু! দেখছ ত' কেমন ক্ষ্যাপাটে তোমাদের দিদিমণি! ভাবলে আমি বুঝি অল্পবয়সী ছেলেদের মত ছ্যাবলামী করব, সুতরাং যা বলার আগেই বলা উচিত। কেমন, এই ভাবনি কি

তুমি ?" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীন লাহিড়ী একেবারে যেন সাহসের সীমা ছাড়িয়ে এতদিনের নিভাঁজ ভদ্রতা ও গাম্ভীর্য্যকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সহাস্যে অসীমার মুখটা দু'হাতে তুলে ধরে।

"রাম্মু রয়েছে যে!" অসীমা চাপা গলায় শচীন লাহিড়ীকে সতর্ক করে। চোখ মুখ তার লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু কৌতুক আর উচ্ছ্বাসে শচীন লাহিড়ী সত্যিই যেন বয়সের সংযম হারিয়ে ফেলেছে। হাসতে হাসতে অসীমার নাকটা নেড়ে দিয়ে বললে, "রাম্মুর এখন তোমার মত বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। সে এখান থেকে অনেক আগেই চলে গেছে। যাক্ সে কথা, আমাকে একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে অনর্থক এতদিন ভাবিয়েছ। সত্যি, এখন বুঝতে পারছি মেয়েরা যতই লেখা-পড়া শিখুক, আর আলো-বাতাসেই মানুষ হয়ে উঠুক, তারা সেই আদ্দিকালের যত সব সিউপারষ্টিশান্ সবলে আঁকড়ে থাকবে। এরই নাম মেয়েদের কালচার, লিবার্টি!—নাঃ, তোমার কাছে এটা আমি মোটেই আশা করিনি সীমা!"

জীবনের সাথী হিসাবে অসীমা মনে মনে যাকে এতদিন কামনা করে এসেছে, আজ তার মুখে অতীতের প্রতি ঔবাস্যমিশ্রিত এই কথা-গুলো শুনে, অসীমার দ্বিধা-সংকোচে আড়ষ্ট মনটা মুহূর্ত্তে যেন প্রাণ-স্পন্দনে দুলে ওঠে। খুশির আমেজে চোখ দুটো বুঝি আপনা থেকে বুজে আসে। ধীরে ধীরে মাথাটা সে হেলিয়ে দেয় শচীনের কাঁধের উপর। সারারাতের উত্তপ্ত মাথাটা চিন্তার জটিলতা থেকে মুক্তি পেয়েছে যেন! অতি-সুখের মিষ্টি একটা স্পর্শে অসীমা শচীনের কাঁধের উপর মাথাটা হেলিয়ে ভাবে, সত্যিই ত' কেন সে আজও কুসংস্কারকে আঁকড়ে বসে থাকবে! একটা এঁদো পাড়াগাঁয়ে ক'টা আবছা হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে বসে কে তাকে শালগ্রামশীলা সাক্ষী রেখে সম্প্রদান করেছিল, আর কাকেই বা সে কনে-পিঁড়িতে বসে কিশোরীর ভয় ভয় মাখা বিহ্বল

দৃষ্টিতে দেখেছিল, আজ সে কথা মনে পড়ে না। ক্রমশঃই যেন উজ্জ্বল আলোতে মরা অতীত নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে কেন সে দ্বিধা করবে? অপমানিতা সরসীর অন্তর থেকে অতীত মুছে দিয়েই ত' অসীমা জন্মলাভ করেছে। আজ আর কেউই চক্রবর্ত্তীবাড়ীর সীমানায় তাকে বন্দী করে রাখতে পারে না। ঘৃণার সঙ্গে সরসী যেদিন তার বধূজীবনের পরম সৌভাগ্যচিহ্ন লাল শাঁখা জোড়া পদ্মার ঘোলা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেদিনই সব সংস্কারের শেষ হয়ে গেছে!

অসীমা একমুখ হেসে শচীনের দিকে চেয়ে বললে, "আমি কুসংস্কারকে অনেক দিন আগেই শেষ করে দিয়েছি। তবে তুমি ঠিকমত মেনে নিতে পারবে কিনা এটাই আমার দুশ্চিন্তা ছিল।"

শচীন অসীমার অবিন্যস্ত চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে সহাস্যে বললে, "এখন সে দুশ্চিন্তার যখন নিষ্পত্তি হ'ল, এবারে লৌকিক অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, কেমন?"

বারান্দায় বামুনদি'র কণ্ঠস্বর শুনে, অসীমা ব্যস্তভাবে উঠে বসতে বসতে বললে, "আমার কোন মতামত আর নেই। মাকে দিন দেখতে বলো, তিনি যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।"

"ভারী বাধ্য মেয়ে যে!" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীন খোলা জানালাটার দিকে তাকিয়েই হঠাৎ যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়ে বললে, "কাল যা দাঙ্গাটা আমাদের ওখানে হয়েছে, আজ বেরুব ভাবতেই পারিনি। এখানে কিছু গোলমাল ওঠেনি?"

অসীমা পথের নির্জ্জনতার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদু হেসে বললে, "ভুলে যাও কেন, এটা সাদার্ণ এভিনিউ—এখানে তোমার বৌবাজারের দল ওৎ পেতে বসে থাকে না।"

"ওৎ পেতে বসতে আর হয় না, যা দিনকাল পড়েছে তাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয়! মা ত' কাল প্রায় ফিট্ হয়ে পড়েন আর কি! মানুষগুলো

—যেন হিংস্র পশুর মত হয়ে উঠেছে। কেবল মারামারি আর খুনো খুনি! কোন্ সময় যে মৃত্যু হানা দেবে জীবনের ওপর বলা যায় না!” কিছু পূর্ব্বে যে মুখখানা জীবনের পূর্ণতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সে মুখ মুহূর্ত্তে যেন ম্লান হয়ে যায়। একটু সময় অসীমা পথের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “সত্যি মানুষগুলো ভরসা হারিয়ে ফেলেছে, এভাবে আর কতদিন থাকব কে জানে! আমি তাই ভাবছি, এখন না হয় বিয়েটা বন্ধ থাক কিছুদিন, কি বলো? এই মরা-বাঁচার সন্ধিক্ষণে বিয়ের আনন্দ ভাবতেও লজ্জা লাগে। এক দিকে মানুষ সামান্য স্বার্থের প্রতিহিংসায় জীবন দিচ্ছে, আর অন্য দিকে আমরা—”

“দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে সৃষ্টির পথ খুঁজছি!” শচীন অসীমার কথাটা হঠাৎ যেন কেড়ে নিয়ে শেষ করে দেয় দুষ্টুমির হাসি হেসে। আরক্ত হয়ে অসীমা কৃত্রিম ধমক দিয়ে বলে ওঠে, “ভারী ইয়ে তুমি—ওভাবে কথাটা আমি বলেছি?”

“বেশ ত’ তুমি বলোনি, আমি বলছি—হয়েছে ত’? এখনই ধমক খেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে সেই যে ছোটবেলার গল্প শুনেছি ‘ষ্ট্যাণ্ড আপ্ অন্ দি বেঞ্চ জুতা সমেত’ না হয়।” সহাস্য মুখে শচীন অসীমার কানে মুক্তার ঝুরি দেওয়া দুলটায় টোকা মেরে দুলিয়ে দেয় চঞ্চল শিশুর মত একটা চাপা প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির হয়ে।

অসীমা শচীনের হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে সকৌতুকে বলে, “শুধু জুতা সমেত বেঞ্চে দাঁড়ান নয়, হাতও বেঁধে রাখতে হবে দেখছি।”

“মালিক মহাশয়ার যখন যা মর্জ্জি সেই ব্যবস্থা মতই আমাকে চলতে হবে নিশ্চয়ই।” শচীন চোখে-মুখে এমন একটা হতাশার ভাব মুহূর্ত্তে ফুটিয়ে তোলে যে অসীমা একটু যেন থতমত খেয়ে যায়।

“বিয়ের দিন পিছিয়ে দিলাম বলে তুমি কি সত্যিই রাগ করলে?—না, না, তবে আমার দরকার নেই দেরি করার, তুমি আজই মাকে গিয়ে

জানাও।” কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা কেমন যেন ভয় ব্যাকুলভাবে শচীনের আরও কাছে এগিয়ে এসে বড় বড় চোখ দুটো মেলে শচীনের মনের ভাবটা বোঝার চেষ্টা করে।

অসীমার ভয়ার্ত্ত ভাবটা দেখে শচীন হেসে ফেলে বললে, “ভারী ছেলে মানুষ ত' তুমি, আমি রাগ করব কেন? তুমি ঠিকই বলেছ, এখন এই অবস্থার ভেতর অন্ততঃ আমাদের পক্ষে মোটেই উচিত হবেনা বিয়ের আমোদ করার! কাল সন্ধ্যেবেলা ক'টি বন্ধু মিলে আমরা স্থির করেছি যে একটা রিলিফ্ ক্যাম্প করব নোয়াখালিতে। এই কথাটা বলতেই সকালে এসেছিলাম যে, হয়ত আমি আজই বিকেলে রওনা হব। তুমি এখানের সব দায়িত্ব একা সামলাতে পারবে ত'?”

অসীমা আকাস্মিক কথাটা শুনে প্রথমে যেন উত্তর দিতে পারে না। তারপর বলে, “এখানের জন্যে ভাবনার কিছু নেই। ইন্দিরা রয়েছে, ওর দাদারা আছেন। কিন্তু আমি বলছিলাম এই সময়ে নোয়াখালি যাওয়া কি উচিত?”

“এই রে! অসীমা দেবী ঘোমটা দেওয়ার আগেই বাঙ্গালী ভীতু বৌটির মত নিজেরটুকু নিয়েই ভাবতে সুরু করে দিয়েছে। এ আমি মোটেই সইতে পারি না! মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেই প্রায় মত নিয়েছি। তোমার কাছে এটা আমি চাইনা। বরং আমাকে যুদ্ধের বেশে সাজিয়ে দেবে বীর যোদ্ধার মত”—বলে শচীন হোহো করে হেসে চেঁচিয়ে ডাকে, “রাসু আমার চা কোথায়? বক্‌বক্ করে গলা শুকিয়ে গেল যে।”

রাসু এই ডাকটুকুর অপেক্ষাতেই বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও ঘুরছিল। “এই যে যাই দাদা”, বলে এককাপ গরম চা, খানকয়েক নিমকী, ঘরের তৈরী সন্দেশ ট্রেতে সজিয়ে সহাস্যে ঘরে ঢুকল দেখে, সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে শচীন বললে, “অতদূরে আমি যেতে পারি না এই খানেই দাও। সীমা তুমি কাপটা ধরে থাক দিকি। ততক্ষণ আমি খাই।”

শচীন রাস্থর হাতের ট্রে-টার উপর থেকে খাবারের ডিসটা উঠিয়ে নিয়ে খেতে সুরু করে, আর মাঝে মাঝে অসীমার ধরে-থাকা কাপটায় চুমুক দেয়।

সহাস্যে রাস্থ অসীমাকে বলে, "তুমিও ত' কিছু খাওনি রাতে, একটু কিছু খাওনা কেন গল্প করতে করতে।—দেব খাবার ?"

অসীমা একে রাস্থর কাছে শচীনের এই সব ছেলেমী খেয়ালে অস্বস্তি বোধ করছিল, তার উপর এখন এই অসময়ে খাওয়ার কথা বলায় ধমকে উঠল হাসি চেপে, "তোমারও কি মাথাটা গরম হ'ল ? এই সাত সকালে আমি খেতে পারি না।"

রাস্থ অসীমার ধমক খেয়ে "বেশ বাপু বেশ" বলে হাসতে হাসতে ঘর থেকে চলে যায়। শচীন আড়-চোখে দরজাটা একটু দেখে নেয়, তারপর একটা নিমকী চট্ করে তুলে নিয়ে একেবারে অসীমার মুখের সামনে তুলে ধরে সকৌতুকে বলে, "এবারে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না, রাস্থ চলে গেছে।"

"হ্যাঁ, রাস্থর জন্যেই যেন সব বাধা! কি যে ছেলেমানুষী তুমি কর বুঝি না!" অসীমা মুখটা সরিয়ে নেয় হেসে।

"তা বটে! মিলের মালিক মহাশয়ার সঙ্গে জেনারেল ম্যানেজার যে রসিকতা করতে পারে না সেটা উল্লাসে ভুলেই যাচ্ছিলাম।" শচীন নিমকীখানা খেতে থাকে সহাস্য মুখে।

এই বারে অসীমা সত্যিই রেগে ওঠে। চায়ের কাপটা ঠক্ করে টিপয়টার উপর নামিয়ে রেখে বলে, "মালিক আমি একা নই ; বীরভূমের রাইসমিলটা, রাণীগঞ্জের ঐ কারখানা সবই ত' আমি টাকারদায়ে বিক্রী করেছি। এমন কি এখানের রাইসমিলটার পর্য্যন্ত তুমি পার্টনার। তবু তুমি এসব বলে কেন আমাকে খোঁটাদাও বল ত' ?" অভিমানে তার স্বর বুঁজে আসে।

বাবারে একটু যদি ঠাট্টা করতে পারি! অমন করে মেপে-জুপে কথা আর বলতে পারি না। বয়েসই না হয় বাড়ছে, তাই বলে এক-আধটু ঠাট্টাও করতে পারব না? যাক্ সে কথা, তবে আমি আজ বিকেলেই বেরিয়ে পড়ছি, তুমি এদিকটা যতটা পারবে ব্যবস্থামত করার চেষ্টা করবে। মিলে যাবার দরকার নেই, কিঙ্করদাকে আমি পাঠিয়ে দেব।" শচীন উঠে দাঁড়ায় কথার শেষ রেশটা মিলিয়ে যাবার আগেই।

"আসবে কবে?"

"সেকি বলা যায়? অবস্থা বুঝে খবর পাঠাব।" তারপর হঠাৎ কি ভেবে শচীন যেন বহু দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে বলেঃ "যদি আর নাই ফিরি আমার আক্ষেপ নেই। বুঝব মিলনে বিধাতাই বাদী হয়ে আমাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কিন্তু প্রকৃত মিলন থেকে কেউই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমার চিরদিনেরই ধারণা, মিলনটা স্ত্রী-পুরুষের শুধু দৈহিক মিলন বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠান দিয়ে দুটো অজানা মানুষকে বেঁধে সৃষ্টিকে পুষ্টি করে তোলাই, মিলন নয়। সমাজের, দেহের সব সীমানা ছাড়িয়ে যে মিলনটা প্রতি মুহূর্ত্তের অনুভূতি দিয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসে কর্ম্ম-প্রেরণার রূপ ধরে সেইটেই হ'ল উভয়ত মিলন। সুতরাং যেদিন এই কাজে দু'জনে একমত হয়ে নেমেছি সেই দিনই ত' আমাদের মিলন হয়েছে।" কথার শেষে হালকা মনে শচীন হাসতে থাকে অসীমার মাথাটা একটু নেড়ে দিয়ে।

অসীমার চোখে আজ শচীন নতুন করে দেখা দেয়। এতদিন যাকে সে দেখেছে, যার সঙ্গে কাজের সূত্রে মোটরে মোটরে ঘুরেছে, মিলের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করেছে, এই শচীন যেন সেই গম্ভীর, কর্ম্মচঞ্চল, স্বল্পভাষী শচীন লাহিড়ী নয়। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে সুট পরা ঠোঁটের কোণে সর্ব্বদাই একটা সিগারেট আলত ভাবে ঝুলছে, যেন,

হুকুমের দণ্ড উঁচিয়ে প্রতিবাদকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে, সোজা হয়ে এগিয়ে চলে মাথাটা একটু তুলে। আজ, সে চেহারাটা অসীমার চোখে পড়ে না। কেমন যেন একটু ছেলেমী ভাব লাগে শচীনের চেহারার মধ্যে। এই ক'বছর যে বলিষ্ঠ কর্ম্মব্যস্ত পুরুষটি তার কর্ম্মপ্রেরণার ভিতর দিয়ে অসীমাকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, আজ সেই পুরুষের কর্ম্মচঞ্চল সর্ব্বগ্রাসী রূপের দিকে অসীমা অপলক চোখে চেয়ে থাকে। দু' চোখের পলক তার পড়তে চায় না। ভুলে যায় তার বিরাট প্রতিষ্ঠানের কথা, ভুলে যায় আসন্ন বিপদের মুখে যারা রয়েছে তাদের মুখগুলো, ভুলে যাচ্ছে সে কাদের প্রয়োজনে প্রাণপণ করে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেছে। অসীমা বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে! সে শুধু নারী, যে নারী পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে চায় পুরুষকে অবলম্বন করে। সংসারের আবর্ত্তে স্বামী, সন্তানকে জড়িয়ে আরামে সে ডুবে থাকতে চায়; আর কোন পরিচয়ই তার নেই, সে শুধু নারী!

"কি ভাবছ?"

চমকে উঠল অসীমা। তারপর বিছানা থেকে নামতে নামতে বললে, "বিকেলে আমি তোমার বাড়ীতে যাব।"

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শচীন সকৌতুকে বলে, "দু'জনে বুঝি যুক্তিতর্ক এঁটে আমার যাওয়াটা বন্ধ করতে চাও। সে হবে না, বুড়ী মাটিকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করেছি, তুমি আর ইন্ধন দিতে যেও না। আমি দেখা করে যাব।" অসীমার ঠোঁটের কোণে ম্লান একটা হাসি ফুটে ওঠে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দরজাটার পাশে।

অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ শচীন যেন বেশী খুশি মনে ডাক-হাঁক করে তার মোটরে গিয়ে ওঠে, অসীমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানায়, কিন্তু অসীমার দিক থেকে প্রাণের কোন স্পন্দনই পাওয়া যায় না।

অসহায় দৃষ্টি মেলে আবছা চোখে সে চেয়ে আছে শচীনের মোটরখানার দিকে। পিছন থেকে রাসু হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল: “ও কি একটা বিপদের ভেতর যাচ্ছে আর তুমি চোখের জল ফেলছ?”

অসীমা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, “দূর, চোখের জল ফেলব কেন? এখনও স্নান করিনি তাই মুখ চোখ কেমন যেন জ্বালা করছে।”

রাসু কি বোঝে সেই জানে উত্তর করে না, তবে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে চাপা গলায় উপদেশ দেয়: “যা বলার বলা হয়েছে, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের কাজ করগে।”

অসীমা নিজের দুর্ব্বলতাটা রাসুর কাছে গোপন করার উদ্দেশ্যেই মুখে হাসি টেনে পাল্টা জবাব করে, “অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, তাই করলে দেখি।”

ভ্রূটা কুঁচ্‌কে রাসু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: “আমি কথার ওপর কথা মোটে সহ্য করতে পারি না। কর্ত্তাবাবু পর্য্যন্ত আমার কথার ওপর কথা কইতেন না। আর যাকে এতটুকুন বয়স থেকে হাতে করে মানুষ করলাম, তার কথা শোন একবার! খুব ভাল হয়েছে মা যে মেয়ের বিষ দাঁত ওঠার আগেই মারা গেছেন।”

ভাঁড়ার ঘর থেকে বামুন দিদি এগিয়ে এসে সহাস্যে বলে: “এত রাগ কেন রাসুদির। কি হ'ল?”

“আর হ'ল কি! কোথায় আমি বিয়ের হাঙ্গাম সেরে কাশী যাব ঠিক করছি, এদিকে মেয়ে বায়না ধরে বসলেন যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা না মিটলে বিয়ের কোন ব্যবস্থাই করা হবে না। নাও, এটা কি একটা কথা হ'ল? এই ত' শচীনদা বেরিয়ে গেল সেই নোয়াখালী, এখন তুই বুড়ী মর্ ভেবে! কোথায় এখন কচি-কাঁচা নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করব, না ঐ ধাড়ী মেয়ে গলায় নিয়ে বসে থাকি সারাটা জীবন!” রাসু গজগজ করে রাগে।

বামুন দি কথায় রসান দিয়ে বললে, "তাত বটেই, কাজটা সেরে ফেললেইত হ'ত! বুড়োবুড়ো মানুষের মধ্যে আমারও আর ভাল লাগে না। দশ বছর কাজ করছি দিদিমণির ছেলেমেয়ের দৌরাত্মই যদি না পেলাম, তবে আর কিসের জন্যে খাটলাম! ইস্কুল, কলেজের ভাত দিয়েছি আর ভেবেছি, কাঁচের পুতুলের মত দিদিমণির ছেলে মেয়েরা এই খানে বসে এমনি করে গরম গরম ভাত খাবে, তাড়াতাড়ি ইস্কুলে যাবে। কিন্তু বড় দেরি করছে এরা, তুমি জোর কর রাসুদি।"

রাসু কি বলে অসীমার কানে আসে না, সে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল। এই নিরক্ষরা দাসীটির স্নেহের মূল্য জীবনে বোধ হয় শোধ হবে না। তাকে সে সুখী করবে এবার। নিজের মনেই অসীমা নানা চিন্তা করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাসুকে মাঝে রেখে।

সতের

প্রায় মাস দুই হ'ল শচীন তার আর ক'টি বন্ধুর সঙ্গে নোয়াখালী চলে গেছে। অসীমা সম্পূর্ণভাবে একা পড়ে গেলেও, তার মিল সংক্রান্ত সব কিছু কাজেই জেনারেল অফিসের বড়বাবু বৃদ্ধ কিঙ্কর রায় তাকে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। তিনি নিজে প্রতি হপ্তায় চন্দননগর যাচ্ছেন যা প্রয়োজন করছেন। অসীমা শুধু অফিসের তদারক করছে। অবশ্য কিছুদিন তারা ক'টি মেয়ে মিলে দাঙ্গায় উৎপীড়িত, অসুস্থ লোকগুলোর জন্য সাহায্য সমিতিটা খুলেছিল, সেই খানেই অসীমার বেশী সময় ব্যয় হয়। এখানে কর্ম্মী তারা সবাই, কলেজের, স্কুলের অনেকগুলি মেয়ে মিলে এই রিলিফ্ ক্যাম্পটি ভবানীপুরে তৈরী করেছে। এখানে যে যেমন ভাবে পারে আর্ত্ত মানুষগুলোর সেবা করছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ওষুধ যোগাড় নিয়ে। শিশুর দুধ আর রোগীর ওষুধ এই দাঙ্গার মধ্যে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু অসীমা এদের বাঁচাবার চেষ্টায় কিছুমাত্র ত্রুটি রাখেনি। যেভাবেই হোক নানা প্রকার ওষুধ এরই মধ্যে যে যোগাড় করে রেখেছে এবং দুধ ও ব্যবস্থা করেছে বিরাট একটি ফার্মের সঙ্গে আগাম টাকা দিয়ে। যে কলকাতায় অর্থ ফেল্‌লে মানুষ যা ইচ্ছা করেছে তাই পেয়েছে, এমন কি এই যুদ্ধের বাজারেও প্রচুর অর্থের বিনিময়ে, মানুষ খাদ্য ঠিকই যোগাড় করে গেছে দিনের পর দিন, কিন্তু সেই কলকাতা যেন মুহূর্ত্তে মরুভূমির মত কঠিন নিষ্করুণ হয়ে উঠেছে। বাজার হাট কোথাও কিছু নেই, সব খাঁ খাঁ করছে প্রাণের আতঙ্কে। অসীমা, ইন্দিরা অপর্ণা, সুজাতা পরামর্শ

করে এখন কি করবে বলে। দলে দলে লোক এসে উঠছে পূর্ব্ববঙ্গ উজাড় করে। এদের খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, আশ্রয় চাই ; অসীমা আকুল হয়ে মিলের মধ্যে যাদের পারে ঢুকিয়ে দেয়, আবার কাউকে কারখানায় পাঠায়। যাদের পারে না কোথাও পাঠাতে, তাদের নিয়েই সমস্যা। কিন্তু তবু তাদের কাজ থামে না! ব্যাকুল হাতের বেষ্টনী দিয়ে আর্ত অসহায় বাস্তুহারা মানুষগুলোকে অসীমা নিজের কাছে আঁকড়ে ধরে তাদের সান্ত্বনা দিতে চাইছে। মাঝে সুজাতার দাদার সঙ্গে সে এক দিনের জন্য নোয়াখালী গিয়েছিল, কিন্তু শচীন তাকে সেই মুহূর্ত্তে ফিরতি ট্রেনে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদিও অসীমা রাগ করে বলেছিল, "তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছ কেন জানি।" শচীন উত্তরে বলেছিল, "এখন তুমি আমার ওপর যত রাগই দেখাও, এই ইতর অবস্থার মধ্যে তোমাকে কিছুতেই আমি থাকতে দিতে পারি না।" "তুমি থাকতে পার যদি আমিও পারি।" অসীমা জোর দেখাতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হেরেই ফিরে এসেছে। কারণ সে নারী, যেখানে দুর্ব্বৃত্তরা দেশ ভাগের উন্মত্ততায় নারীর অপমান করতে পারে, সেখানে শচীন তাকে কোন মতেই রাখতে পারে না। দেশের সাধারণ অবস্থায় তার সাহচার্য্য শচীনকে কর্ম্মপ্রেরণা জুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই দিনে সে তাকে থাকতে দেবেনা ঠিক করেই নিজে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছে। অসীমা প্রথমটা একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিল যদিও, তারপর কর্ম্মস্রোতে সেই ক্ষুব্ধ ভাবটা কোথায় যে তলিয়ে গেছে ভেবে পায় না। এমন কি একছত্র চিঠি লেখার পর্য্যন্ত সময় নেই। আজ যখন রাসু বকাবাক করে চিঠিখানা লিখিয়ে নিয়ে ডাকে ফেলে দিল অফিসের পিয়নকে ডেকে, অসীমা মনে মনে বেশ যেন খুশি হয়। এতদিন খবর নেওয়াটা উচিত ছিল বেচারা বিদেশে বিপদের মাঝখানে রয়েছে। অফিসের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে অসীমা আনমনা হয়ে পড়ে।

মিলের শ্রমিকদের বাঁচাবে বলেই এই প্রতিষ্ঠানটি একদিন অসীমা গড়ে তুলেছিল, কিন্তু আজ চতুর্দ্দিক থেকে একটা সর্ব্বগ্রাসী হাহাকার যেন তাকে ঘিরে ধরেছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা কত দিক থেকেই যে বাধা এসে দাঁড়াচ্ছে তার সুখের কল্পনা ভেঙ্গে দিতে, হিসাব করা যায় না। তবু চেষ্টা করতে হবে অসহায় মানুষগুলোকে বাচার অধিকার দিয়ে টেনে দাঁড় করানোর। যে সঙ্ঘবদ্ধতা, যে কর্ম্মপ্রেরণা মিলের চিমনীগুলোর বুক ঠেলে কাল কাল ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে অসীমাকে ভরসা দিয়েছে, আজ মনে হচ্ছে সে ভরসা ত' অতি সামান্য। কাজের সংখ্যার চেয়ে নিরন্ন মানুষের সংখ্যা যে বেড়ে গেছে। কিন্তু আর ভাবলে চলবে না, যে ভাবেই হোক মানুষের হাতে নির্য্যাতিত মানুষগুলোকে অসীমাকে বাঁচাতে হবে। ইতর, ভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত আজ আর কারুর মধ্যেই প্রভেদ নেই, জাতি বিচার পর্য্যন্ত সবলে ছিঁড়ে দিয়ে সকলে যেন দুঃখের জালে জড়িয়ে হিন্দুর অক্ষমতাকে চিৎকার করে ধিক্কার দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে। তারা স্বাধীনতা চায়না, সুখ চায়না, শুধু চায় এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থেকে দূরে পালিয়ে যেতে। কিন্তু কোথায় যাবে এই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হিন্দু? যে বুক ভাইয়ের হাতে ছুরি খেয়ে রক্তে মাটি ভিজিয়ে দিয়েছে, যেখানে মায়ের কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে আছড়ে মেরে মাটি ফাটিয়েছে, যেখানে নারীর অপমানে মাটি কলঙ্কিত হয়ে লজ্জায় ঘৃণায় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, সেখানে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র!

অসীমা হিসাবের খাতাগুলো ঠেলে রাখে বিরক্ত হয়ে। উত্তপ্ত মাথায় হিসাব করা অসম্ভব। ক্লান্ত মনে অসীমা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান মাত্র, একেবারে দুরন্ত ঝড়ের মত যেন হাস্য পরিহাসের ঝাপটা তুলে ঘরে ঢুকে প'ড়ে ইন্দিরা বলে, "কেমন আছেন আমাদের মিসেস লাহিড়ী? শুনলাম শরীরটা বেশ খারাপ।"

পিছু থেকে সুজাতা মুখ টিপে সকৌতুকে বলে, "অছুক—গো—অছুক!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমার গলাটা সে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে ঝুলে পড়ে দুষ্টুমী করে।

অসীমা হেসে সুজাতাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললে, "বড্ড যেন পাখীটি নয়! ছাড়্ ভারে যে বসে যাচ্ছি একেবারে।"

অপর্ণা অসীমার গালটা টিপে কৌতুকে চোখ মটকে ইন্দিরাকে বলে, "শোন্ কথা! মিঃ লাহিড়ী এলে ওজনটা একবার নিস্ দিকি।"

লজ্জায় মুখ-চোখ লাল করে অসীমা বলে উঠল, "ছাখ অপর্ণা বিয়ে হয়ে থেকে তোর মুখটা বড্ড আলগা হয়ে পড়েছে। দাঁড়া না আমি কি করি তোর।" অসীমার কৃত্রিম ক্রুদ্ধ ভাবটা ইন্দিরা গ্রাহ্যর মধ্যেই আনে না। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, "লুকিয়ে লুকিয়ে সব গোছালি আর বললেই দোষে! নে—চল্ ওপরে বসিগে।"

সুজাতা বললে, "বারে, কেন এলি সেটা বল্‌বিনে বুঝি? তবে ডাক্তারী করতে শুধু শুধু এলি কেন শুনি? মাঝ থেকে আমাদের মিটিং-এর দিন পিছিয়ে দিলি।"

মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে অসীমার মুখের দিকে চেয়ে ইন্দিরা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা চিঠি দেখায়, "বল দিকি কার চিঠি? বলতে পারলে একটা সুন্দর জিনিস দেব।"

অসীমা মুখ ভেংচিয়ে বললে, "আমার কিছু দরকার নেই তোর সুন্দর জিনিসের।" কথার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ফস্ করে ইন্দিরার হাত থেকে খামখানা ছিনিয়ে নিয়েই একেবারে দৌড়ে নিজের ঘরে দোতালায় উঠে যায়।

পলাতকা অসীমার পিছনে "আরে ধর ধর গুণ্ডা" বলে সব ক'টি মেয়ে এমন হৈ হৈ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে পড়ল যে, যে রাঙ্গু দিবানিদ্রা থেকে উঠে সবেমাত্র পানের বাটা নিয়ে ঝিম্ মেরে একটু বসেছিল, হঠাৎ এই চিৎকারে সে ভয় পেয়ে, "কোথায়—কোথায়"—বলে দৌড়ে এসে

একেবারে ঢোকে অসীমার ঘরের ভিতরে। ভাবে হঠাৎ বুঝি দাঙ্গা লেগেছে।

দিবানিদ্রার আমেজটা যখন দাঙ্গার আতঙ্কে আর উত্তেজনায় ছুটে গেল তখন, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বুঝে হেসে ফেলে বলে ওঠে, "তাই বল! আমি ভাবলাম বুঝি দাঙ্গা লেগেছে।"

অসীমা দলে ভারী প্রতিপক্ষের কাছে হেরে গিয়ে হাসতে হাসতে বললে, "এটাও কি কম দাঙ্গা উঃ ইন্দিরার গায়ে যা জোর!"

রাসু বললে, "তোমরা দেখ্ছি বড় আর হ'লে না। এমনি করে কি এখন হুটোপাটি করে! পড়ে গেলে শেষে কেলেঙ্কারী! হাত পা ভেঙ্গে ঘরে বসে থেকো সব!"

"হাত পা ভাঙ্গলে তবু ভরসা হবে যে, কেউ বোঝা নেবে, নইলে—"

"চাপতে ত' পারছিস না, এই বলবি ত'?" অর্পণা সুজাতার কথাটা শেষ করে দেয় রসাল করে। তারপর বললে, "রাসুদি আগে আমাদের চা দাও বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

"কেন, পেট ভরেই ত' আসিস" অসীমা কৌতুকের টিপ্পনী কাটে বিছানার উপর জুত হয়ে বসে। মুহূর্ত্তে একটা হাসির দমকা ধাক্কায় রাসু পর্য্যন্ত হাসি চেপে ঘর থেকে পালাল দেখে সুজাতা বলে, "রাখ এখন বাজে কথা। আমাদের মিটিং-এর কি করবি বল!"

ভ্রূ'চোখ কপালে তুলে সবিস্ময়ে অসীমা বললে, "মিটিং কিসের?"

ইন্দিরা অসীমার পাশে বিছানাখানায় আড় হয়ে শুতে শুতে বললে, "একদল নোয়াখালী যাবার ব্যবস্থা করছে।"

"অর্থাৎ মিত্রার দলটি ত'?"

এতক্ষণ অপর্ণা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসেছিল, এখন সবিস্ময়ে সোৎসাহে উঠে বসতে বসতে বলে, "তুই জানলি কি করে?"

অসীমা অল্প হেসে বললে, "আজই সকালে এসেছিল। উঃ সে কি

লেক্‌চার! আমার অর্থ আছে, সামর্থ আছে সুতরাং বাংলার এই বিপ্লবের সম্পূর্ণ দায়িত্বটাই বলে আমার নেওয়া উচিত ছিল। এই সব কত কথাই বললে তার অত কি মনে করে রেখেছি! শেষে বললে, অন্ততঃ চাঁদাটা দাও। তা গোটা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তবে উঠল।” কথার শেষে অসীমা হাসতে থাকে হাল্কাভাবে।

ঠোঁট বাঁকিয়ে অপর্ণা বলে, “কাজের চেয়ে হাঁক-ডাকটাই হ'ল বেশী! ত্যাখ্‌না কতদূর ওরা এগুতে পারে, আমি ত' ৫'টি টাকা ঠেকিয়ে সরে পড়েছি ওর ফাঁদ থেকে।”

“সুজাতা একেবারে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। অর্থাৎ তত সহজে বাবা টাকা বার করেন না, সুতরাং সটান ওকে ড্রইংরুমে বসিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়েছি।”

সুজাতার কথায় ইন্দিরা বলে ওঠে, “আমাকে বিপদে ফেলবে রাতে এসে। দাদাকে সরিয়ে রাখতে হবে। এমনিতে আমাদেরই কাজে টাকা কম পড়ছে তার ওপরে যদি বাইরের চাঁদা দিতে হয় তবে সত্যি অসম্ভব।” এই দাঙ্গার পরিণতি কি এখন ত' বোঝা যাচ্ছে না!”

অসীমা চুপ করে বসে কি যেন ভাবছিল, এখন ইন্দিরার কথার সূত্র টেনে বলে, “মন্দ ব্যাপার হয়নি, কালনিমির লঙ্কা ভাগের অবস্থা হ'ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কূটচক্রীটি ভারতকে রক্ষা করতে পারবে কি!”

“সে পারা না পারা ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু এখন কি করব তাই বল! শুনছি দলে দলে গুণ্ডা ভাড়া করে আনা হচ্ছে—”

“ভবানীপুর, কালিঘাট, বালিগঞ্জ এগুলো দখল করার জন্যে ত'?” অসীমা যেন অপর্ণার মুখ থেকে কথাটা একেবারে লুফে নিয়ে শেষ করে ফেলে তারপর গলায় জোর দিয়েই বললে, “এসব যদি সত্যিও হয়, আমি ভয় পাইনা।”

“তুই ভয় না পেলেও আমি কিন্তু সত্যি ভয় পাচ্ছি।” অপর্ণা ভয় ভয়

ভাবে কথার শেষে জানালা দিয়ে সাদার্ণ এভিনিউর দিকে চেয়ে নিজের মনেই যেন বলছে এমনিভাবে বলতে থাকে: "বোলই আগষ্ট যে হিন্দু নিধন যজ্ঞ সুরু হয়েছে, তাতে ওরাই জিতবে বলে মনে হচ্ছে। উঃ, এই ক'মাসে পূর্ব্ববাংলাটা একেবারে হিন্দু শূন্য করে ফেললে।"

ধম্‌কে উঠে ইন্দিরা বলে, "তুই দেখছি সব নষ্ট কর্‌বি! এতই যদি ভয় তবে কেন সমিতিতে নাম লেখালি ?"

অসীমা অপর্ণার বিব্রত অবস্থাটা দেখে ধমক দেয় না, শুধু অল্প হেসে বললে, "সত্যি, তুই এত ভয় পেলে কাজ করবি কি করে বলত ? এখন আমাদের ভয় বলে জিনিসটা আমল দিলে চলবে না।"

মুখটা বিরক্ত করে অপর্ণা রাগত সুরে বললে, "আমি কি মরার ভয় করছি নাকি ? শেষে বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারীকেই বা ভয়। ওদের কি জ্ঞান বা শিক্ষা আছে, পশুর চেয়েও অধম ওরা, নইলে এমনভাবে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতে পারে ?"

মাথা নেড়ে অসীমা সায় দিয়ে বললে, "এটা একটা ভাববারই কথা! কেননা মেয়েদের ওপর পর্য্যন্ত দেশ ভাগের আক্রোশটা যেখানে নিতে পারে, সেখানে আত্মসম্মান সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন বই কি!"

সুজাতা খবরের কাগজটা এই অবসরে দেখছিল। সে হাতের কাগজটা ভাঁজ করে কোলের উপর রাখতে রাখতে বললে, "এই কাগজেই গান্ধিজীর উক্তি রয়েছে এই বিষয়ে যে, এই ভ্রাতৃঘাতী বিচ্ছেদ যদি বন্ধ না হয় তবে আমরণ তিনি অনশন গ্রহণ করবেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য অসীমার ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রূপের স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠল। ইন্দিরার দিকে ফিরে সে বললে, "তোর ত' ডাইরী লেখা অভ্যেস, আজকের তারিখটা লিখে নিচেতে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখিস মহাত্মার বাণী—ভ্রাতৃবিদ্বেষ নিবারণ হেতু আমি আমরণ অনশন গ্রহণ করিব। সাতই নভেম্বর, উনিশ শ' ছেচল্লিশ।"

ঘরটার মধ্যে আকস্মিক জমাট-বাঁধা একটা স্তব্ধতা যেন ছড়িয়ে পড়ল। একজন দেশমান্য পরম শ্রদ্ধেয় মহামানবের প্রতি এই বিদ্রূপাত্মক শ্লেষে সকলেই বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তারপর যেন অসীমাকে আক্রমণ করার মত করেই স্তব্ধতা ভেঙ্গে ধারাল-গলায় সুজাতা বলে উঠল, "তুই শেষে মহাত্মা গান্ধিজীকেও বিদ্রূপ করার সাহস রাখিস?" রাগে সুজাতার কথা হারিয়ে যায়। আশৈশব যাকে শ্রদ্ধা করেছে, যাকে দেখতে দশ বছরের মেয়ে হয়েও মামার সঙ্গে ওয়ার্ধা গেছে, তাঁকে বিদ্রূপ সে সইতে পারলে না।

সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে কৌতুকে অসীমার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। "আমি গান্ধীবাদী নই বলে, তাঁকে বিদ্রূপ বা অশ্রদ্ধা করছি, মোটেই তা নয়। তাঁর সঙ্গে আমার মতের এখানে অনৈক্য ঘটেছে এটাই আমি বলতে চাইছি।"

"যেখানে সবাই এই আশ্বাসবাণীতে ভরসা পাচ্ছে, সেখানে তোর মতের অনৈক্য ঘটলে কিছু আসে যায় না।" অপর্ণা কথাটা একেবারেই যেন উড়িয়ে দেয় রাম্বুর হাত থেকে চায়ের বিরাট সরঞ্জামটি সামনের টিপয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে।

ম্লান হেসে অসীমা বললে, "আসে যায় কিনা জানিনা, তবে ভীরুর মত এই আশ্বাস বাণী আঁকড়ে থাকাটাকে আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনা। এখন আমাদের দেশের যা অবস্থা, তাতে মুখোমুখি সংগ্রামই প্রয়োজন। এই সব মহত্বের দাম নেই।"

"বলিস কী? ওরা না হয় হীনতা দেখাতে পেরেছে, তাই বলে আমরাও করব!" ইন্দিরা ক্ষুণ্ণ হয় হিন্দুর মহত্ব সম্বন্ধে অসীমার শ্লেষোক্তিটা শুনে।

"সত্যিই হীনতা দেখাতে হবে। অর্থাৎ মারলে আমিও যে মারতে পারি, সেটা ওদের বুঝিয়ে না দিলে, এটা ক্রমশঃ বেড়েই যাবে। মহাভারতে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কি কথা বুঝিয়ে ছিলেন? এই একই ব্যাপার ত'?

অর্জ্জুন দ্বিধা করছেন নিজের আত্মীয়দের বুক নিশানা করে ধনুক-বাণ হাতে তুলতে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উত্তেজিত করে বোঝালেন এই যুক্তি দেখিয়ে যে, অন্যায়ের প্রতিবিধান করা উচিত, এই মায়া ভীরুর লক্ষণ। আমি তাই বলছি আমরা যদি দেখাতে পারি নিজেদের সাহস শক্তি, তবে ভাড়াটে গুণ্ডা এনে আর কলকাতা দখল করতে হচ্ছে না।”

অসীমার কথাটা ইন্দিরা কিছুটা যেন মেনে নেয়। বলে, “কিন্তু সকলে যাকে শ্রদ্ধা করে তাঁর কথার ওপর ত' বাংলার ছেলেরা কথা বলতে পারেনা!”

“বাংলার ছেলেরা হয়ত পারেনা, কিন্তু বাংলার মেয়েরা কি তাঁর উপদেশ মত আঁচলে বিষটা বেঁধে রেখেছে?”

অসীমার কথায় সবাই হেসে উঠল। মহাত্মা গান্ধীর মত এমন একজন দেশপূজ্য ব্যক্তির মুখ থেকে এই রকম ছেলেমি কথাটা সত্যিই হাস্যকর। নারীর অপমানের প্রতিশোধ নেই, তাই তাকে বিষপান করে হিন্দু-নারীর সম্মানরক্ষা করতে হবে। এই হিন্দুত্ব বজায় রাখার কোন সার্থকতা নেই। যারা নারীর সম্মান রাখতে এগিয়ে যেতে পারেনা, সেই জাতিকে গর্ভে ধারাণ করাও যে অপমান।

চায়ের কাপে অপর্ণা চিনি মেশাতে মেশাতে বললে, “এটা সত্যি হাসির কথাই নয় উনি বলেছেন। যদি বিষই আঁচলে বেঁধে দিন কাটাতে হয়, তবে বেঁচে থেকে কি লাভ?”

“আমি ত' তাই বলছি, ও-সব উপদেশ না মেনে, ছেলেমেয়ে সবাইকে এখন মুখোমুখী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া উচিত। নইলে আর বাঁচতে হবে না। যেভাবে বাংলার ওপর জুলুম সুরু হ'ল, তা'তে করে বাঙ্গালী শীগ্‌গিরই লুপ্ত হবে।”

ইন্দিরা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অসীমার কথার রেশ টেনে বললে, “আর লুপ্ত হ'তে বাকীই বা কি বল! এই যে বক্তৃতা হ'ল, বিহারের

জন্যে তাতে কৃতজ্ঞতার যেন ঢেউ বইয়ে দিলে, এই বিহারের অমুক আর তমুক বলে। কিন্তু বাংলা কি কংগ্রেসের জন্যে কিছুই করেনি? মনে ত হয় একদিন এই বাংলাই সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসকে পরিপুষ্ট করে তুলতে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আর বাংলার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছেন.।"

সুজাতা কথার কাটান দিয়ে বললে, "এটা তোর মিথ্যে দোষারোপ হচ্ছে আজ যদি কেউ বাংলাকে বাঁচাতে এগিয়েই না আসত তবে বড় বড় সব দেশপূজ্য লোকেরা এমন ভাবে ছুটে আসত না চারিদিক থেকে।"

বিদ্রূপে ঠোঁট বাঁকিয়ে অসীমা বলে, "ছুটে কেউ আসছেনা বটে, তবে প্লেনে ঘুরে ঘুরে বাংলার পোড়া মুখটা দেখছেন ঠিকই।"

খিল খিল করে হেসে অপর্ণা বললে, "এই সঙ্গে তাঁদেরও মুখটা ঠিক পুড়ল কিনা জানিনা, তবে সন্তান-হারা মা, অপমানিতা নারী যে অভিশাপ বর্ষণ করছে তাতে প্লেন থেকে না পড়ে বেচারীরা।"

"সত্যি কথাই সেদিন সন্তান-হারা মা'টি বলেছিল, "যদি নেতৃত্ব করারই শক্তি না রাখ, তবে কেন মানবো তোমাকে! ঘর গেল, সন্তান গেল, যাদের জন্যে তাদের উপদেশ চাই না!" উঃ, সে কি ভদ্রমহিলার উত্তেজনা!" ইন্দিরার স্বর আবেগে জড়িয়ে যায়।

ক'দিন আগেকার ঘটনাটি মুহূর্ত্তে যেন অসীমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে এমনিভাবে, বারান্দার কোণে নিচের বাগান থেকে লতিয়ে লতিয়ে যে জুঁই ফুলের গাছটা সহস্র বাহুবিস্তার করে অসীমার ঘরের জানালাটা ধরার চেষ্টা করছে, সেই দিকে চেয়ে থাকে। তারপর নিস্তেজ গলায় ধীরে ধীরে বলে, "বাংলার কত ঘরে যে শোক আর অপমানের কান্না আজ উঠছে তার হিসেব করা যায়না। বাংলা মরবে, কিন্তু বাঙ্গালী কখনই মরবেনা। তারা গৃহহীন, গৌরবহীন, অপমানে লাঞ্ছনায় দেশে দেশে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়ে একটা যাযাবর জাতিতে ধীরে ধীরে হয় ত' পরিণত হবে।"

'রক্ষে করো বাবা স্বাধীনতা! আমি ত' এ ক'মাসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।" রাসু এদের কথার মধ্যে বারান্দা থেকেই যোগ দেয় স্বাধীনতার প্রতি বিরক্ত হয়ে।

সুজাতা সহাস্যে বললে, "ঐ শোন, রাসুর কথা!"

"ঠিকই বলেছে রাসু। যেখানে স্বাধীনতা নিয়ে সংগ্রাম, সেখানে এই স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। তার চেয়ে বরং যেমন পরাধীন ছিলাম তাই ভাল।"

ইন্দিরার কথাটা লুফে নিয়ে অসীমা বলে, "ভাল বই কি! দেশকে শাসন করার মত আমাদের যখন ক্ষমতা নেই, দু'পক্ষে শুধু তর্ক আর আর লড়াই হচ্ছে, তখন তৃতীয় শক্তি বেঁচে থাক্। তবু জানবো, পরের কাছে আছি, দুঃখকষ্ট স্বাভাবিক।"

"নাঃ, তোর সব কথাতেই একটা কেমন যেন ধার! তাই ভাবছি বেচারী ভদ্রলোক এত করে চিঠিখানা লিখে পাঠালে দাদাকে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি অশেষ দুঃখ কপালে আছে!" ইন্দিরা হঠাৎ একেবারে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

সুজাতা সকৌতুক হাস্যে বললে, "মিঃ লাহিড়ী এদিকে ভাবছেন শ্রীমতী অসীমা দেবী বেজায় কাজ ক'রে বুঝি অসুস্থ; সুতরাং তার খোঁজ-খবরটা যেন আমরা করি।"

"কিন্তু এদিকে যে, উনি দেশপূজ্য লোকদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে খুঁজে বার করে, রাতারাতি একজন দেশনেত্রী হবার আশায় বড় বড় লেকচার ঝেড়ে আমাদের মাথা গরম করে তুলছেন, সে ত' বেচারী জানে না!" ইন্দিরা কথার শেষে অসীমার দীর্ঘ বেণীটায় টান মেরে হাসতে থাকে।

"তাই ত' ভাবি হঠাৎ তোরা আমার খোঁজে কেন? যাই হোক তবু একজন আমার শরীর খারাপ হয়েছে এই ভেবে চিন্তা ত' করে!. এতদিন ভাবতাম পরের রোগ অসুস্থতাই বুঝি ভাবতে হবে, কিন্তু

আমার জন্যেও যে দূর-বিদেশে কেউ ভাবছে শুনে সত্যি খুশি হলাম। দে, চিঠিখানা বাঁধিয়ে রেখে দিই।" দুষ্টুমী করে ইন্দিরার ভ্যানিটিব্যাগটা অসীমা কেড়ে নেয়।

অপর্ণা ধমকে বলে, "চা যে জুড়িয়ে গেল! নে খেতে খেতে গল্প কর!"

সুজাতা চেয়ারে আড় হয়ে লুচি আলুর দম খেতে খেতে বললে, "ত্যাখ কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, যার জন্যে সত্যি আসা এতদূরে সেটা বল্ কি করবি?"

দু'চোখ বিস্ময়ে বড় বড় করে অসীমা বললে, "এখনও কথাটাই শুনলাম না, অথচ, আমি কি করব সেটা জিগ্‌গেস করছিস! অদ্ভুত মেয়ে তুই! সাধে কি মেয়ে ঠাঙ্গানোর কাজ নেবেছিস!" অসীমা চায়ের কাপটা অপর্ণার হাত থেকে নিয়ে নিজের মাপ মত চিনি মেশায়, চিনির পাত্র থেকে।

"ও আমরা ভেবেছিলাম নাড়ি টিপে সত্যি বুঝি বুঝতে পারিস! যাক্ মুখেই তবে বলছি।" ব'লে সুজাতা হাসতে হাসতে আরম্ভ করে, "মিত্রারা নোয়াখালী যাচ্ছে দেখে, কিছু মেয়ে মেতে উঠেছে যাওয়ার জন্যে। এখন তুই যদি রাজি থাকিস যাওয়া সম্ভব হয়।"

বারান্দা থেকে ভেংচে ওঠে রাসু, "তুই যদি রাজি থাকিস। আহ্লাদ একেবারে দিন দিন বেড়ে চলে মেয়েদের! পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এই অবস্থায় কেউই যাবে না। একদিনের জন্যে গিয়েছিল না সীমা?" রাসু কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে এমনভাবে যে, মনে হয় এই তরুণীগুলির যেন সেই একমাত্র অভিভাবিকা। তারপর সে আবার বলে, "যা করার এখানেই ত' করছ, ঐ সব জায়গায় যেতে হবে না। পুরুষে যাচ্ছে যাক্, মেয়েদের এসব ধিঙ্গীপনা মোটেই আমি দেখতে পারি না!"

"তোমাকে আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। সীমাই যথেষ্ট লেকচার ঝেড়ে মাথা গরম করেছে, এখন তুমি একটু চুপ ক'রে থাক কেউই যাচ্ছে না।"

রাগের ভিতরেও রাসু ইন্দিরার কথায় একটু হেসে ফেলে বললে "না যাওয়াই উচিত। কাজের ত' অভাব নেই—হাঁা, যা বলছিলাম—তোমরা যে জামা বানাতে দিয়েছিলে সমিতির জন্যে, তা হয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে যাবে কি ? না, ভোলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

খুশি হয়ে ইন্দিরা বললে, "আমরাই নিয়ে যাব বার করে রাখ।"

রাসু চলে যায় জামা আনতে। অসীমা চায়ের কাপটা হাতে করে ফিস ফিসে গলায় বলে, "মিত্রাদের মিটিংটা শুনলে হ'ত, যাবি ?"

সভয়ে অপর্ণা পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলে। সুজাতা মুখটা নিচু করে চাপাহাসি হেসে আস্তে বললে, "একটা ফন্দি করে বেরুতে পারবি ?"

ইন্দিরা বিছানা থেকে উঠে হঠাৎ বললে, "কাল থেকে তুই রুগী-গুলো ফেলে রেখেছিস, শেষে একটা কিছু হলে সেবা করছে যারা তারা দায়ী হবে।"

রাসু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, "আমার কাছে তোরা উড়ে যাবি ভাবিস নি,! আমি ঠিক বুঝেই ব্যবস্থা করে এলাম। যাই গাড়ীটা বার করতে বলি।" রাসু সমিতির জামাগুলো একটা কাগজের মোড়কে বেঁধে গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। জোরাল গলায় হাক দিতে দিতে। "এই কেষ্ট গাড়ী বার করতে বল !"

অসীমা একটু হেসে বললে, "হ'ল ত' ! এখন সারা রাস্তা বুড়ী জালাবে।"

"আমাদের অভিভাবিকার অন্ত নেই দেখছি। যেখানেই যাও, সেখানেই এই চারটি মেয়ের জন্যে দু'জোড়া চোখ আর কান খাড়া আছে একেবারে।" সুজাতা হাস্যমুখে কাপড়টা ঝেড়ে ঠিক করতে করতে

দরজার দিকে এগিয়ে যায় সকলের আগে মোটরে গিয়ে জায়গা জুড়ে বসার ছেলেমি খেয়ালে। কিন্তু সুজাতাকে ডিঙ্গিয়ে ইন্দিরা, অপর্ণা ছুটে সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গেল দেখে, অসীমাও দৌড়ে তাদের সঙ্গ ধরলে। চতুর্দ্দিকে হাসির কলোরব ছড়িয়ে সমবয়সী মেয়ে চারটি যেন বিরাট বাড়ীটাকে বর্ত্তমান পরিস্থিতি থেকে আকস্মিক প্রাণ-চাঞ্চল্যে উচ্ছল করে তুলল।

আঠার

মাসতিনেক পরের কথা। বর্দ্ধমানে বাস্তুহারাদের জন্য যে ব্যবস্থাটি করা হয়েছে, সেখানে লোক ভর্ত্তি সুরু হয়েছে দিনসাতেক ধরে। অসীমারা দল বেঁধে মাঝে মাঝে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে, এবং আর কি আবশ্যক তার তত্ত্বাবধান করছে। আজও তারা কিছু আগে ট্রেন থেকে নেমে, সবে মাত্র চা খেয়ে আরামের উদ্দেশ্যে বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পরবর্ত্তী কাজের একটা লিষ্ট করছে, এমন সময় রামু একটা শ্লিপ হাতে ঘরে ঢুকল। অসীমা খাটের ছতরিতে ঘাড়টা হেলিয়ে রামুর দিকে ফিরে, প্রশ্ন করে, "কে আবার এল ?"

রামু অসীমার হাতে স্লিপখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, "একজন কেরানীবাবু এসেছে চন্দননগর থেকে। বললে, খুব নাকি দরকার !"

"আঃ, যত আপদ এই সময় এসে জুটল ! একটু যদি বিশ্রাম নেবার সময় থাকে। আজই আমি মিলের জেনারেল ম্যানেজারকে চলে আসার জন্যে তার করে দিচ্ছি। মাসের পর মাস আমি চালাতে পারব না !"

অসীমার বিরক্তি দেখে সুজাতা হেসে বললে, "মিঃ লাহিড়ী কিন্তু বেশ বুদ্ধি করেই সরে পড়েছেন ! এখন ঠ্যালাখানা নিজে বোঝ ! রাতদিন বেচারীর কত মাথা ঘামাতে হয়েছে।"

"তা ঠিক ! উনি না হলে এই মিল চালান সম্ভব হ'তনা সীমার দ্বারা। টাকা, উৎসাহ, ইচ্ছে অনেকেরই থাকতে পারে, কিন্তু এমন একটি সঙ্গী পাওয়া সত্যিই দুর্লভ !"

অপর্ণার কথায় ঠোঁটের কোণে মৃদু-হাসি টিপে অসীমা বলে, "দুর্লভ বলেই বুঝি আমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। জানে এক

মুহূর্ত্ত তাকে ছাড়া আমার কাজ হয়না, অথচ কেমন নোয়াখালি গিয়ে আর্ত্তের সেবা সুরু করে দিয়েছে।"

"আহারে, অবলা নারী! তবু যদি এই কাজের সূত্র ধরে শচীনবাবুকে টেনে আনতে পারিস নিজের আঁচলের তলাতে। কাছে থাকতে বেচারীকে অনেক ভুগিয়েছিস, ন্যাকামী করে এখন বাজে কথা না বলে সটান আসতে তার করে দে, আমরা বিয়ের ভোজটা খাই।" ইন্দিরা সহাস্য মুখে বিছানা থেকে একেবারে উঠে দাঁড়ায় কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে!

সবিস্ময়ে অসীমা বলে উঠল: "কাপড়চোপড় পাট করে এখনই কোথায় যাচ্ছিস?—বস আমি আসছি।"

বাধা দিয়ে সুজাতা বললে, "না ভাই আজ আমরা উঠি, বড্ড টায়ার্ড লাগছে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে সমিতির কাগজপত্রগুলো দ্রুত-হাতে গুছিয়ে নেয়।

অপর্ণা বললে, "রথীদা'র কাছে এগুলো জিম্মা দিয়ে আমরা এখন বিশ্রাম নেব। তুইও তোর ভিড় চট্‌পট্ মিটিয়ে একটু বিশ্রাম নে। হাত পাগুলো ব্যথা হয়ে গেছে দৌড়া দৌড়ি করে।"

"হ্যাঁ, বিশ্রামের সঙ্গে প্রিয়মুখটি চিন্তা করতে ভুলে যাস্‌নে যেন।" ইন্দিরা হাল্‌কা একটা ঠাট্টা করে দরজা দিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু অসীমার দিক থেকে কোন জবাবই আসে না। যেন ঐ ছোট্ট কাগজখানার স্পর্শে হঠাৎ অসীমার সমস্ত অনুভূতিগুলো অসাড় হয়ে গেছে একবারে! অবশ্য এই অসাড় নিশ্চল ভাবটা বেশীক্ষণ অসীমার ভিতরে কার্য্যকরী হয়না। হাতের মুঠোর মধ্যে সবলে দলে মুচড়ে কাগজটাকে ড্যালা পাকিয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাসুর গায়ে। বলে, "তুমি ভেবেছ কি—? মিলের যে কোন কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমি যাব সময় নষ্ট করে দেখা করতে? একটু চোখ দিয়েও কি কাগজটা দেখতে পারনা?"

থতমত খেয়ে রাসু কাগজের ড্যালাটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিতে নিতে বললে, "আমি কি ঐ সব নম্বর-টম্বর কিছু বুঝি, না ইংরেজী পড়তে পারি? তোমরাই একবার বল ত' দিদি এটা অযথা রাগ নয় দিদিমণির?" রাসু ক্ষুব্ধ হয়ে অসীমার বান্ধবীদের মুখের দিকে তাকায়।

"ওর কথার কি কোন মানে আছে রাসুদি? বিয়ে দিয়ে দাও সব ঠাণ্ডা তখন।" অপর্ণা হাসতে হাসতে দরজা দিয়ে চলে যায় ইন্দিরাকে একটা ঠ্যালা মেরে সরিয়ে।

"এই সুরু হ'ল এটার হুড়োহুড়ি।" ইন্দিরা স্মিতমুখে ধমকে ওঠে, পরে সুজাতার হাতের খাতাগুলোর কিছুভাগ তুলে নিতে নিতে বললে, "তুই কাল সকালে যাস্ কিন্তু—" সুজাতার সঙ্গে দ্রুত-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে যায় কথার শেষে।

অসীমা একটু সময় গুম্ হয়ে বসে থাকার পর, হঠাৎ যেন মেঝেতে ছিটকে একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, "এবার থেকে বলে দিচ্ছি চন্দননগর থেকে এক হেড্ক্লার্ক আর ক্যাসিয়ার ছাড়া এ বাড়ীতে কেউ ঢুকতে পাবে না। ওদের ওপরওয়ালা আমি বা জেনারেল ম্যানেজার নয়। যাকিছু বলতে হয় বলবে, চন্দননগরের শ্রীধর বাবুর কাছে।"

রাসু নিজের অজ্ঞতায় অপ্রতিভ হয়ে বললে, "কে কি কাজ করে, আমি ত' বুঝি না! লোকটা বারে বারে বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ঐ অফিস থেকে তাই বসিয়ে রেখেছি।"

"বসিয়ে রেখে আমার একেবারে চতুর্দিক উদ্ধার করেছ! কেন কিঙ্করদার কাছে পাঠালেই ত' পারতে, আমি ওদের অফিসের কি জানি! চন্দননগরের অফিসের ছোটবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করব, তুমি ভেবেছ কি আমাকে? হরে রামা, যে আসবে তার সঙ্গে মিলের মালিক দেখা করে, না?"

রাসু কিন্তু অসীমার হঠাৎ এই ক্রোধের যথার্থ কারণটা খুঁজে পায়না। তার সারাদিন পরিশ্রম করে আসার পর অফিসের কাজে অবার লোক আসায় অসীমা আকস্মিক বিরক্ত হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত এইটে ভেবেই সে বললে, "আমি কি তাড়াতে কম করেছি, কিন্তু নড়ে কি! কাগজ, পত্তর নিয়ে সেই বেলা দশটা থেকে গাঁট হয়ে বসে আছে।" অসীমা রাসুর কথার কোন জবাব দেয়না। গম্ভীরভাবে পাশের ঘরে ঢোকে বেশ বেশ পরিবর্ত্তন করতে। রাসু নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে বললে. "বসাইগে তবে দপ্তরখানায়!"

অসীমা গম্ভীরভাবে বললে, "যাও"!

প্রায় মিনিট দশেক পরে অসীমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডান দিকে না ঘুরে, বাঁ দিকে ঘুরে গিয়ে হাঁক দেয়, "বামুনদি, আমায় এক কাপ চা দিতে পার?" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা রান্নামহলে ভাঁড়াড়ের দরজাটার কাছে মোড়ার উপর বসে পড়ল। অসীমার ডাকে ব্যস্তভাবে রাসু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমি চট্ করে হিটারে এক কাপ চা করে দিচ্ছি, বামুনদি আহ্নিকে বসেছে।"

অসীমা সাগ্রহে বললে, "তাই দাও, বড্ড যেন তেষ্টা পাচ্ছে। শরীরটা ভাল লাগছে না কেন জানি।"

শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দূরের ঐ নারকেল গাছটার মাথা কুয়াশায় ক্রমশঃ ঢেকে আসছে। কিন্তু গাছটাকে এখনও বারান্দার পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে অসীমা। মনে হচ্ছে, এটা যেন নারকেল গাছ নয়; বুঝি অস্পষ্ট একটা প্রশ্নচিহ্নের মতন ওর ঐ ঝাঁপড়াল মাথার উপর একরাশ ধোঁয়াটে জটিলতা জড়িয়ে, ঝড়ে বেঁকে যাওয়া গাছটা অসীমার সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্ন চিহ্ন কেন?

অসীমা চমকে চিন্তার জাল কেটে বেরিয়ে আসে রাসুর কথায়, "চায়ের বাগানসুদ্ধ খেলেও শরীর চাঙ্গা হবেনা। সারাদিন এইভাবে হাড়

ভাঙ্গা খাটুনী, আমার বাপু ভাল লাগছে না! এখন যার জিনিস সে এসে জিম্মা নিলে, আমি দায় মুক্ত! কালই আমি কিঙ্করদা'কে দিয়ে শচীনদা'কে তার করাচ্ছি।"

অসীমার মনের আকাশে কিছু আগে যে বিরক্তিটা জমে দৃষ্টিটাকে ঘোলাটে করে তুলেছিল, মুহূর্ত্তে ভবিষ্যতের আলো লেগে সব যেন কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। খুশির সুরে অসীমা বলে, "তুমি দাওনা একটা তার করে, সত্যি আর ভাল লাগছেনা; কেবল কাজ আর কাজ! বিশ্রাম ত' চায় মানুষ!"

রাসু চায়ের কাপটা অসীমার হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, "নাও, ওদিকে বুঝি আঁচও পড়ল না এখনও!" রাসু ব্যস্তভাবে চলে যায় রান্না ঘরে। অসীমা চায়ের কাপে চুমুক দেয় অন্যমনস্ক ভাবে।

ধীরে ধীরে এক সময় অসীমা অফিসরুমের দিকে এগিয়ে যায়। তার-পর চিরপরিচিত প্রতিদিনের ব্যবহৃত অফিসরুমে ঢুকে সে চেয়ারটা টেনে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার সামনে বসে, কলিং-বেল টিপে অফিস-বেয়ারা ভোলানাথকে ডেকে, বাইরের বারান্দায় এতক্ষণ অপেক্ষায় বসে থাকা লোকটিকে ডেকে পাঠায়।

চন্দননগরের ছোটবাবু সুরেন চক্রবর্ত্তী এই পাঁচ বছরের চাকরিতে এতবড় সুযোগটা পায়নি। মিলের মালিকের সঙ্গে তাদের দেখা করার কথা নয়, তাদের মালিক হ'ল শ্রীধর হাজরা এখানের হেড ক্লার্ক। কিন্তু আজ যখন সুযোগটা মিলেই গেছে একটা সই করার ব্যাপার নিয়ে, তখন সুরেন চক্রবর্ত্তী আজ নিজের ভাগ্যকে প্রসন্ন না করে এখান থেকে যাবে না। কমলার চিঠিখানাও এই সঙ্গে দিয়ে দেবে। সুরেন চক্রবর্ত্তী বেলা দশটা থেকে মনে মনে অনেক কল্পনার জাল বুনে বুনে যখন ভোলানাথের সঙ্গে অফিসরুমে ঢুকল তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

উপেক্ষা আর ঔদাস্যে অসীমা ভ্রূটা একটু কুঁচকে সুরেন চক্রবর্ত্তী নামে লোকটার দিকে তাকাল। তারপর কিছু আগের ডাকে-আসা চিঠিটায় দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে পড়ে নেয়।

সুরেন চক্রবর্ত্তী নমস্কার করে দাঁড়িয়েই রইল দেখে, অসীমা একবার ভাবলে তার ঐ গদি-আঁটা চেয়ারগুলোতে লোকটাকে বসতে না দিলেও, দরজার ওপিঠে যে টুলখানা ভোলার ব্যবহারের জন্য থাকে ঐটে টেনে নিয়ে বসতে বলে। কিন্তু কেমন যেন লোকটাকে ভয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে বেশ কৌতুক লাগতে লাগল। গম্ভীরভাবে দেওয়ালে টাঙ্গান স্যার হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরাট তৈল-চিত্রখানার দিকে একটু সময় অসীমা চেয়ে থাকে। তারপর বলে, "কিঙ্কর রায় আপনাকে পাঠাচ্ছেন পরশুদিন, অথচ আপনি আজ এলেন কেন?"

মাথা চুলকে আমতা আমতা করে সুরেন চক্রবর্ত্তী বলে, "দু'দিন এখানে আসব আসব করে বেরিয়েও ট্রেন পাইনি। এই দেখুন কিঙ্করবাবুর চিঠি।" সুরেন চক্রবর্ত্তী গায়ের জড়ান আলোয়ানের ভিতর হাত চালিয়ে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চিঠি, আর খানদুই-তিন কাগজ বার করলে। অসীমা ঐ চিঠিটা পড়ে না আর। শুধু বলে, "কাগজগুলো এগিয়ে আনুন, সই করে দিচ্ছি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর থেকে পেনটা তুলে নেয় গম্ভীর মুখে। যেন এই বিরক্তিকর ব্যাপারটা এক্ষুনি সরিয়ে দিতে চায় কোন রকমে। সুরেন চক্রবর্ত্তী মিলের মালিক অসীমা দেবীর এইটুকু কাজ করার সৌভাগ্যবোধে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে, মিল সংক্রান্ত কাগজগুলো একটার পর একটা গুছিয়ে অসীমার সামনে ধরতে লাগল। আর ধীর গম্ভীর মুখে মিলের মালিক ফস্‌ফস্ করে প্রত্যেকটা কাগজে তার নিজের নামের জড়ান সইটা করে বাঁ-হাত ঠেলে সরিয়ে দেয়।

সুরেন চক্রবর্ত্তীর মত একজন গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষে নারীর এই পদমর্য্যাদায়

গম্ভীর চেহারাটা সত্যি, অদ্ভুত লাগে। এত বছর কাজ করেও যে মালিককে সে সামনে দাঁড়িয়ে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি, আজ তারই সামনে সে ফাইল ধরে রয়েছে কর্ম্মচারী হিসাবে। মনে মনে সে শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবু এই মহিমান্বিতা রাণীর মত রূপে অতুলনীয়া, মিলের প্রতিটি লোকের অন্নদাত্রী করুণাময়ীর সংস্পর্শে এসে অনেকগুলো আশা আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্ত্তে সুরেন চক্রবর্ত্তী বুঝি আকুল হয়ে ওঠে।

যাঁর কৃপায় এখানে বাস করা, তাঁকে সে খোশামোদ করে বই কি! মানুষ মাত্রেই চায় জীবনের উন্নতি। কমলাকে দিয়ে যখন হ'ল না, আজ সুবিধা মত সে মিলের করুণাময়ীর কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে তবে সে চন্দন-নগর যাবে। যদি শ্রীধর হেড্ ক্লার্ক হতে পারে, তবে সে কেন হবে না? টাইমবাবু থেকে ছোটবাবুর পদে উঠে কিছুই লাভ হয়নি তার। তবু টাইম-বাবুকে খুশি করতে শ্রমিকরা তাদের রুজি-রোজগার থেকে দু'চার আনা দিত। কিন্তু এখানে সবই ঐ শ্রীধর বুড়োর হাতে; লোকটা যেন তার উপর চোখ পেতে বসে আছে! আজ এই সুযোগ সে ছাড়বে না। ভাগ্যকে বিশ্বাস করে বই কি! নইলে এই সুবিধেটা কেন এল। বুড়োর জ্বর না হলে, ওকেই ত' কিঙ্কর শয়তানটা পাঠাত। মিলের এই দুই যক্ষীকে এবার সে জব্দ করবে। দেখুক বাঙ্গাল চক্কত্তি উন্নতি করে এগিয়ে গেল কিনা! স্বার্থলিপ্সু সুরেন চক্রবর্ত্তী মনে মনে জাল বুনে, চন্দননগর অফিসের ছোট বাবুর পদ থেকে, বড়বাবু পদে উঠে বসে, তারপর অনেককেই ডিঙ্গিয়ে ক্রমশঃ এত দ্রুতগতিতে করুণাময়ীর অনুগ্রহে এগিয়ে চলল যে, অফিসের জেনারেল ম্যানেজারের উচ্চপদটা প্রায় যখন ছুঁয়ে ফেলছে অবস্থা, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার দ্রুত উন্নতিটা বুঝি তাকেও ছাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে, এমনি ব্যস্তভাবে টেবিল থেকে পড়ে যাওয়া কাজটা তাড়াতাড়ি সে তুলতে গেল দু'পা এগিয়ে গিয়ে।

অসীমার হাতের ঠ্যালা খেয়ে শেষ কাগজটা যে, উড়ে একটু দূরে গিয়ে পড়ল, সেই দিকে অসীমা খেয়ালই করে না। ঔদাস্যের একটা দৃষ্টি ঐদিকে বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। পুরু গদি-আঁটা চেয়ারে অসীমা বুঝি ডুবে যাচ্ছে তাই, পিঠের দিকে একটু সরে গিয়ে, দু'দিকের হাতলের উপর হাত দুটো আড়াআড়ি করে সোজা তাকিয়ে থাকে সুরেন চক্রবর্ত্তীর দিকে।

সারা ঘরে ইলেকট্রিক বাতির আলো সব কিছুকে সে শুভ্র সুন্দর করে করে তুলেছে, কিন্তু তার মাঝখানে গোলাপী রংয়ের আলোয়া. জড়ান কালো লম্বা মানুষটা কেমন একটা বিশ্রী বেমান্ দেখাচ্ছে। তবু অসীমা উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে লোকটাকে দেখ্‌ছে। অতীত তোলপাড় করে ভাবতে চেষ্টা করে অসীমা, পূর্ব্বের চেহারাটা তবু কিন্তু মনে আসছেনা! অথচ এই লোকটার সঙ্গেই লৌকিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সরসী নামে গ্রামের সেই দুরন্ত তের বছরের মেয়েটির জীবন সমাজ একদিন বেঁধে দিয়েছিল। স্ত্রীর অধিকারে এবং হাতে সরসীর মান-সম্মানের দায়িত্ব অগ্নি আর দেবতা সাক্ষী রেখে লোকটা নিয়েছিল। কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেদিন স্ত্রীকে রক্ষা করার প্রয়োজন হ'ল, এই লোকই সকলের আগে সরসীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে পরিত্যাগ করেছিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য সেদিন ভাবেনি নিরাশ্রয় গ্রামের বধূটি অন্ধকার রাতে যাবে কোথায়?

সমাজ নির্য্যাতীতা সরসীর জীবনের রুক্ষতা মুহূর্ত্তে যেন অসীমাকে রুক্ষ কঠিন করে তুললে, "সোয়া ন'টার ট্রেনের অপেক্ষা করবেন না, যান।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা উঠে দাঁড়ায় চলে যাবার জন্য।

সুরেন চক্রবর্ত্তী কাগজগুলো গুছিয়ে পকেটে রাখার আগেই চলে যাবার এই তাড়াটা পেয়ে, কেমন যেন হকচকিয়ে যায় প্রথমটা। কিন্তু পর-ক্ষণেই ধূর্ত্ত লোকটির মধ্যে নিজের প্রয়োজনে আত্মসম্মানটুকুও বিসর্জ্জন

দিয়ে, খোশামুদে সুরে যে কথা বলতে পারে সেই মনবৃত্তিটাকে বুঝি সবলে সে খাড়া করে তুললে। ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে, পানের ছোপ-ধরা দাঁতগুলো বার করে হাত কচ্‌লে কচ্‌লে সুরেন চক্রবর্ত্তী বিনীতস্বরে বললে, "বাঙ্গাল চক্কোত্তিকে কাজ দিয়ে আপনি নিশ্চন্ত থাকুন। আমি এই লোক্যাল ট্রেনটাতেই যেতে পারব। কমলা একটা চিঠি দিয়েছে, বুঝতেই পারছেন ত' আমরা গরীব, কি বা আয়!" বলে চোখে-মুখে একরাশ দৈন্য ফুটিয়ে অভাব, অনাটন, চাকরির উন্নতি সব কিছু এক সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে জানিয়ে, কমলার চিঠিটা খুলে এগিয়ে দিলে। যেন চিঠিটা খোলার কষ্টটুকুও তার মালিককে দিয়ে সে করাতে চায়না এমনি প্রভুভক্ত বিনীত কর্ম্মচারী সে।

অসীমা ভ্রূ-কুঁচকে বিরক্তভাবে সুরেন চক্রবর্ত্তীর দিকে সোজাসুজি তাকাল। উঃ কি কুৎসিত লোকটা! মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝি ইচ্ছা করেই এই লোকটার স্বার্থেন্বেষী জঘন্য কুটবুদ্ধিটাকে মানুষের দৃষ্টিপথে ধরে দেবার জন্য অনেক ভেবেচিন্তেই এমন একটি কুরূপ দেহ সৃষ্টি করেছেন। অসহ লাগে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে-পড়া এই কাল, রোগা মত গোলাপী আলোয়ান জড়ান বিনীত হাস্যমুখের কুৎসিত মানুষটাকে। মূর্ত্তিমান শয়তান যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে অসীমার কাছে। ক্রোধে ঘৃণায় অসীমা বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে হঠাৎ সে বলে ওঠে, "কোন স্পর্দ্ধায় একটি নির্দ্দোষ মেয়ের নামে আপনি কলঙ্ক রটাতে এখন সাহস করেন? জানবেন, ফের যদি এসব ইতরামো শুনিত' মিল থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হবে আপনাকে।" উত্তেজনার প্রাবল্যে অসীমার সুঠাম ঋজু দেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শানিত তরবারীর মত যেন নিজের তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে চতুর্দ্দিক সতর্ক করে তোলে।

অসীমার এই ক্রুদ্ধ ভাবটা সুরেন চক্রবর্ত্তীকে বিহ্বল করে দেয়। আড়ষ্ট

গলায় কোন রকমে কৈফিয়তের সুরে সে বলে, "আমি—আমি কার নামে নিন্দে করেছি? এসব বড়বাবু আপনার কাছে মিথ্যে করে লাগিয়েছে। সত্যি ওঁর মেয়ের বিষয় আমি কি জানি যে বলব! না—না—আমি কিছুই বলিনি কাউকে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত কচ্‌লাতে থাকে ভয় ভাবনায় বিবর্ণ মুখে।

এই অশিক্ষিত ইতরমনের লোকটার সঙ্গে অসীমার প্রবৃত্তি হয়না বাদ-প্রতিবাদ করতে। তবু তাকে যেন প্রতিবাদ করতে হবে বলেই সে হুম্‌কি দিয়ে বলে উঠে, "জানবেন রাণুর নামে নিন্দে রটান সহজ হলেও, একদিন যাকে বিনা দোষে গ্রামসুদ্ধ লোক তাড়িয়েছিল সেই অসহায় সরসীর নামে আজ একটি অপমানসূচক কথা যদি আপনার মুখ থেকে বার হয়, আপনার চাকরিই শুধু যাবে না, জীবন নিতেও আমার মিলের দারোয়ানেরা দ্বিধা করবেনা। যান—এক্ষুনি আমার সাম্‌নে থেকে—দূর হয়ে যা—ন!" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা নিজেকে বোধ হয় অবলম্বন দিতেই সামনে চেয়ারের পিঠটা বাঁ-হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরে।

সুরেন চক্রবর্ত্তীর মত ধূর্ত্ত লোকও আজ যেন ঘটনাস্রোতের মধ্যে পাক খেতে খেতে বাক্‌-হারা হয়ে হাঁপাতে থাকে। সরসী নামটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে মনের চতুর্দ্দিক ঘিরে, কিন্তু সে ভেবে পায়না তার সঙ্গে এই অসামান্যা রূপসী বিদুষী নারীটির সম্পর্ক,—কোথাও দেখেছে বলেও মনে হচ্ছে না ত'!

বিভ্রান্ত সুরেন চক্রবর্ত্তীর মিটমিটে চোখ উজ্জ্বল আলোর তলায় দাঁড়ান অসীমাকে যেন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে থাকে একটু সময়। তারপর হঠাৎ সুরেন চক্রবর্ত্তীর চোখ দুটো জ্বলজ্বলিয়ে উঠল অসীমার বাঁ-হাতের মুঠোটার দিকে চেয়ে। বাঁ-হাতের ক'ড়ে আঙুলের মাথাটা একেবারে চ্যাপ্টা! এই অদ্ভুত আঙুল জীবনে সে একটিই দেখেছে!

সরসীর অপরূপ সৌন্দর্য্যের এই একটিই ছিল ত্রুটি। মুহূর্ত্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সুরেন চক্রবর্ত্তীর। একটা চাপা ধূর্ত্ততা ও শঠতায় সুরেন চক্রবর্ত্তীর মুখটা আরও যেন কুৎসিত দেখায়।

এইবার সে মিলের মালিককে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে। এত দান-ধ্যানের যথার্থ কারণ সে বুঝে নিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে যে পাপ ব্যবসায় সরসী অর্থসঞ্চয় করেছে, আজ সেই অর্থ দান করে সমাজে নিজেকে দানশীলা নারী নামে চালাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু আর সে সুযোগ পাবেনা, সুরেন চক্রবর্ত্তীর মুখ চাপা দিতে গোটা মিলটাই না হাতছাড়া হয়ে যায়। একেই বলে ধর্ম্মের ঢাক! বাবাঃ আমি হলাম বাঙ্গাল চক্রবর্ত্তী। আমার চোখে ধূলো দেবে তুমি? এইবার তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। হেড অফিসের ইনচার্জ্জ হয়ে আজ যদি না ফিরছি ত' কি বললাম। পতিতা স্ত্রীকে স্বামী ঘরে নেয় না বটে, কিন্তু তার অর্থে কোন দোষ নেই। বরং ব্রাহ্মণকে দান করলে দেহের পাপক্ষয় হবে। ধূর্ত্ত সুরেন চক্রবর্ত্তী নিজের মনেই মাথা নাড়ে অনেক-গুলো ফন্দি এক সঙ্গে পাকিয়ে। তারপর এখানে রীতিমত জেঁকে বসার উদ্দেশ্যেই একটা চেয়ার হড় হড় করে টেনে বসতে বসতে কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করে মুচকে হেসে বলে, "ফোঁটা তিলক কাটলেও আমার চোখে ফাঁকী চলল না। এইবার মিলের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে বসার সুযোগ এসেছে। তাই বলি এত দান-ধ্যান কেন! তা মন্দ রোজগার হয়নি এই ক'বছরে। বেচারী মানুকেই শুধু লজ্জায় ঘেন্নায় শেষে আত্ম-হত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে। এখন আমার মুখটা বন্ধ করতে কি করবে শুনি একবার!"

সুরেন চক্রবর্ত্তীর স্লিপটা পাওয়ার পর থেকে, অসীমার মাথাটা এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে, এখন আর সে নিজেকে সামলাতে পারলে না। মান-সম্ভ্রম সব যেন তালগোল পাকিয়ে হঠাৎ একটা উত্তেজিত কণ্ঠের ভিতর

দিয়ে বাজের মত নিস্তব্ধ বাড়ীটার উপর আছড়ে পড়ে, "সাট্ আপ্! আর একটি শব্দ বার হয়েছে কি, ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দেব!" কথায় শেষ রেশটা অসীমার ঠোঁট থেকে বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই সে হাক দেয়, "এই রাম সিং সুন্দর সিং জল্‌দি আও!"

স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী ধূর্ত্ত সুরেন চক্রবর্ত্তী ভাববার অবসর আর পায় না। গৃহকর্ত্রীর উত্তেজিত আহ্বানে লাঠি হাতে ভামকায় দরোয়ান দুটো ঘরের দরজার কাছে পৌছনার আগেই যেন দিক্‌বিদিক্ হারা হয়ে বাগানের দিকের দরজা দিয়ে ছুটে সে বেরিয়ে পড়ে গায়ের আলোয়ানটা বুকের ভিতর আকড়ে ধরে।

প্রথমটা অসীমা কেমন একটু বোকার মত চেয়ে থাকে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি সহকারে সুরেন চক্রবর্ত্তীর ঐ দৌড়ে পালানর দিকে। তারপর মুখটা ঘৃণায় কুঞ্চিত করে অফিস থেকে বেরুবার পথেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসা রামসিংকে দেখে বলে, "গেটে তালা দিয়ে দাও।" কথার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তায় "গেল—গেল" বলে একটা চিৎকার উঠল, এবং রাস্তা কাঁপিয়ে একটা মিলিটারী ট্রাক চলে গেল। অসীমা ভ্রূকুঞ্চিত অবস্থায় বলে, "দিলে বুঝি কাউকে চাপা! একে দুঃখ-দুর্দ্দশায় মানুষ মরছে, তার ওপর এই এক জ্বালা!"

কেষ্ট রাসুর কি ফরমাসী জিনিস সামনের দোকান থেকে কিনতে গিয়েছিল। সে জিনিস দোকানে ফেলেই দৌড়ে গেটের ভিতরে ঢুকে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "দিদিমণি, দিদিমণি এক্ষুনি একটা লোক ট্রাকে চাপা পড়েছে। উঃ, কী রক্ত—রাস্তা ভেসে গেছে একেবারে!"

অসীমা মুহূর্ত্তে যেন কিছু আগের তিক্ত ঘটনাটা থেকে নিজেকে ঠেলে রেখে আবার সহজ হয়ে ওঠে। আকস্মিক এই বিপদ-সংবাদে কর্ত্তব্য এবং স্নেহমমতা জড়ান ব্যাকুলকণ্ঠে কেষ্টকে সে বললে, "তুই আমার নাম করে ফোন্ করেদে হাসপাতালে। আমি ওষুধপত্র নিয়ে যাচ্ছি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা দ্রুত পায়ে ঘরের ছোটখাটো ব্যাপারে যে সব ওষুধ এবং সাজ-সরঞ্জাম গোছান থাকে সেই দিকে চলে যায়।

ডাক্তার হিসাবে অসীমা যখন ওষুধ পত্র সাজিয়ে, ব্যাগ হাতে ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছুল, তখন আহত লোকটিকে একটি সেবা সমিতির দল তাদের এ্যাম্বুলেন্সে শুইয়ে দিয়েছে, এবং মুখ চোখের রক্ত কিছুটা পরিষ্কার করে মানুষটাকে পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছে এরই মধ্যে। অসীমা এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন দু'পা পিছিয়ে গেল! জীবনের চতুর্দ্দিকে শ্বাস রুদ্ধ করে যে বিষাক্ত ভারী বাতাসটা এতদিন ঘুরপাক খাচ্ছিল, তার গতি আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে !!

অসীমাকে ঘটনাস্থল থেকে আস্তে সরে যেতে দেখে, এম্বুলেন্স-বাহী একটি বছর সতের আঠারর সুস্থ সবল ছেলে সাগ্রহে ডাকলে, "সীমাদি, আপনি মোটরে চলুন, নইলে হাসপাতালে আমরা সিট পাব না।"

চোখের সামনে আকস্মিক এই মুক্তিটা দেখে অসীমা কেমন যেন বিহ্বল হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এই লোকটার মৃত্যুতে শোক, কি আনন্দ মনে সাড়া দিয়ে উঠছে, নিজেই বুঝতে পারছে না এমনি অবস্থায়, অপর্ণার ছোট ভাই রুনু তার সাহায্য চাইল।

অসীমা জীবনে মৃত্যু, দুঃর্ঘটনা কম দেখেনি, সুতরাং চিকিৎসক হিসাবে রাগ, বিদ্বেষ, ঘৃণা ছেড়ে দিয়ে একটু এগিয়ে এসে নিরাসক্ত গলায় বলতে হয়, "রুনু বেডের দরকার হবে না, লোকটা পথেই শেষ হবে।"

"তা হোক তবু নিয়ে ত' যাই—চলুন।"

রুনুর তাড়ায় অসীমা একটু হেসে বললে, "রাস্তার লোক তুলে তুলে আমার এই নতুন ওয়ার্ডটা দেখছি ভরে ফেলবে। চলো, আমি যাচ্ছি।"

ভোরের দিকে অসীমা যখন ফিরে এল, রাসু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, "বাঁচবে ত'? আহা রে, লোকটা বুঝি এই জন্যেই কাল সকাল থেকে এখানে তীর্থের কাকের মত বসেছিল। একেই বলে নিয়তি।"

মুখটা বিরক্ত করে অসীমা বলে ওঠে: "থামাও তোমার নিয়তির কথা! এখন আমাকে হতভাগা লোকটা ডুববে দেখছি। মরবে না হাতি! ক'মাস যে হাসপাতাল জুড়ে থাকবে কে জানে! মরলে একটা সহজ পথ হ'ত। কিছু টাকা দিয়ে বৌটাকে পাঠিয়ে দিতাম কোথাও। কিন্তু হাড় শয়তানটা এখন টাকার বিষ্টি করাবে। বাবার যেমন কাজ, স্টাফের যে কোন লোকই হোক্ তাকে হাসপাতালে কেবিন ভাড়া করে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে। কি জ্বালা দেখ দিকি!"

অসীমাকে এপর্য্যন্ত কোন লোকের বিপদে এমন বিরক্তি প্রকাশ করতে রাসু দেখেনি যদিও, তবে কেষ্টর মুখে বাঙ্গাল চক্কোত্তির চুরি এবং কাজে নানান ক্রুটি সম্বন্ধে সে অনেক কিছু শুনেছে বলেই বললে, "শুনেছি লোকটা সত্যি খুব শয়তান। কেষ্টর বাবা ভূধর ত' ওর জন্যেই সেবার বিপদে পড়েছিল। কি বলে ষ্টোরের জিনিস একেবারে গাপ্ করে দেয়। শচীনদা গিয়ে শেষে ছাড়ায়।"

অসীমা সোফাটায় আড় হয়ে বসে চায়ের কাপটা এগিয়ে নিতে নিতে বলে, "তোমার শচীনদা একেবারে দয়ারসাগর ত' জেল খাটালে ঠিক হ'ত। এখন দিব্বি হাসপাতালে রাজভোগ মারবে বসে বসে। তবে আমার ত' মনে হয় ব্রেনের একটু গোলমাল হবে। চোটটা মাথাতেই বেশী লেগেছে।"

বামুনদি' এতক্ষণ অসীমার চা-খাবার সামনের টিপয়ের উপর সাজিয়ে রেখে, দরজা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উভয়ের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে যেন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, কাল ঐ লোকটা অফিসরুম থেকে অমন ভাবে দৌড়ে ছুটে পালাল কেন বলত?"

অসীমার হাসি এসে গেল সেই দৃশ্যটা স্মরণ করে। বললে, "কাল যে এখানেই ওর মাথাটা যায় নি পরম ভাগ্যি। এখানে এসেছিল নিজের উন্নতির জন্যে স্ত্রীর চিঠি নিয়ে! তারপর স্টাফের এর-ওর নিন্দে।

পাকা শয়তান, একেবারে ঘাড় ধরে গেটের বাইরে বার করে দেবার ইচ্ছে ছিল! কিন্তু তার আগেই কেমন চোঁচা দৌড়টা দিল, দেখেছ ত'?" অসীমা হাসতে থাকে বামুনদি'র মুখের দিকে চেয়ে।

রাস্থ বললে, "লোকের মন্দ দেখে ভাল বলতে নেই যদিও, তবে কিছু দিনের জন্যে বাছাধন পড়ল বোধ হয়। চেহারাটাই ত' শয়তান শয়তান।"

অসীমা কোন জবাব করেনা, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে একটু বিশ্রামের জন্য বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ে ছোট্ট মেয়ের মত আব্দারে গলায় বললে, "আমার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাওনা রাস্থ—"

খুশি হয়ে রাস্থ বলে: "দিই—দিদি,—এই রান্নাটা বুঝিয়ে দিয়েই চলে আসছি এসোগো বামুনদি—" বলে রাস্থ ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বামুনদি'কে সঙ্গে করে।

উনিশ

সুরেন চক্রবর্ত্তী যে গাড়ী চাপা পড়েছে এই দুঃসংবাদটি কমলার কাছে পৌঁছুতে মোটেই দেরি হয় না। এই তিনটে দিন ধরে যে সুখের কল্পনা তারা স্বামী-স্ত্রীতে করেছিল, সব যেন প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে মুহূর্ত্তে তলিয়ে গেল!

সরল মনের বধূটি বিশ্বাস করেছিল স্বামী তার বীরভূম যাচ্ছে রাইসমিলের বড়বাবু হয়ে। সুতরাং মিলের কাগজপত্র নিয়ে অসীমা দেবীর সঙ্গে সুরেন চক্রবর্ত্তীকে তাই দেখা করতে হবে। যে সুখ কমলা মনে আনা দূরে থাক স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই ভাবি ভবিষ্যৎ কমলাকে যেন আনন্দে উজ্জ্বল করে তোলে। স্বামীকে তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে, কাগজপত্র গুছিয়ে, জুতো জোড়াটা দরজার কাছে সাজিয়ে রেখে একটা ছেলেমি আব্দার ধরেছিল যে, বড়গিন্নীর মত একটা লাল কস্তাপাড় দেশী শাড়ী তাকে কিনে দিতে হবে। এখানে সে সকলের চেয়ে পদমর্য্যাদায় ছোট, এবং অবস্থাও খারাপ, যেমন-তেমন অবস্থায় থাকলে নিন্দের নয়। কিন্তু, সেখানে কমলা যাবে বড়বাবুর স্ত্রী হয়ে। অতএব রীতিমত পদমর্য্যাদা মত তাকে চলতে হবে ত'! একদিন সেও ঐ বড়গিন্নীর মত একগোছ চুড়ী-পরা হাত নেড়ে নেড়ে পরের পর্য্যায় লোকদের উপদেশ দেবে মিটিয়ে মিটিয়ে।

সারাটা দিন কমলা দু'চোখ মেলে শুধু সুখেরই স্বপ্ন দেখে। ঘরের কাজে মন দিতে পারে না অন্যান্য দিনের মত। সন্ধ্যার ট্রেনে স্বামী আসবে, এই আশায় ঘর বার করছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে ক্রমশঃ যখন রাত এগিয়ে এল তখন কল্পনার রং আরও বুঝি গাঢ় হয়ে আসে। সদর

দরজায় তালা দিতে দিতে কমলার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদুহাসি ফোটে। আজ সীমাদি নিশ্চই আটক করেছেন ছোট ভগ্নিপতিটিকে। শুধু কাজের লোক বলেই অসীমা দেবী তাঁকে ভালবাসেন না, কমলাকে স্নেহ করেন বলেই কাজের এই উন্নতি!

ভোর রাত্রে খোকন বিছানা থেকে ঘুমের ঘোরে পড়ে যায়। কমলা আজ আর রাগ করেনা, উপরন্তু সাগ্রহে ছেলেকে বুকে তুলে চুমু খেতে খেতে বলে: "এবারে আমার সোনামণির জন্যে চারিদিকে ফ্রেম দেওয়া খাট বানিয়ে দেব। একবার বীরভূম পৌছুলেই হয়, আগে বাপু তোর খাট করাব।" কমলা আধ-ঘুমন্ত ছেলেকে আবার শুইয়ে দেয় বিছানায় মিষ্টি হাসি হেসে।

কমলা ভোরের ঐ চোখ জড়ান ঘুমটা ছাড়িয়ে বিছানায় যখন উঠে বসল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। ব্যস্তভাবে ওঠার আজ আর তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থেই কাজ হবে ভেবে, কমলা বিছানায় বসে বসে চুলের বিনুনী খোলে আলসেমা ভাবে হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে কাজে নামে—দরজা খোলা, রান্নাঘরে আঁচ দেওয়া ইত্যাদিতে। আজ সব কাজেই তার কেমন যেন দেরি আর কুড়েমী ধরছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ক'জন ভদ্রলোক এবং বড়গিন্নী যখন উঠানে এসে দাঁড়ালেন দুঃসংবাদটি বহন করে, তখন সমস্ত আলসেমীটা বুঝি প্রচণ্ডভাবে একটা ঝাকানী দিয়ে কমলাকে স্তব্ধ করে দেয় একেবারে। কিছুক্ষণ পরে কমলার যখন জ্ঞান ফিরে এল হঠাৎ সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুখের স্বপ্নটা দূরে ঠেলে দিয়ে।

চন্দননগরে সে দিন তাকে যদি বা আটকে রাখা গেল, পরের দিন আর রাখা সম্ভব হ'ল না। স্বামীকে দেখার জন্য যাকে সামনে পায়, তারই দু'পা জড়িয়ে এমন কাকুতি-মিনতি সুরু করে দিল যে, শেষ পর্যন্ত কোন্ করে অসীমার মত নিয়ে কিঙ্কর রায় কমলাকে

পরমেশবাবু আর একটা দারোয়ান দিয়ে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিতে বাধ্য হ'ন।

হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তির দিন নিতান্ত ভদ্রতার জন্যই অসীমাকে সুরেন চক্রবর্ত্তীর বিছানার কাছে দাঁড়াতে হয়েছিল। কিন্তু আজ কমলা আসছে স্বামীকে দেখতে, এই সংবাদ পেয়ে তাকেও অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে ঐখানে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, রোগী তারই মিলের কর্ম্মচারী। এবং যে ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয়েছে সেটিও অসীমা নিজের অর্থ দিয়েই বিশেষ বিভাগ খুলেছে। সুতরাং মনে বিরক্তি থাকলেও অসীমাকে যথাসময়ে হাসপাতালে আসতে হয়েছে। এতক্ষণ সে তার ক'টি সহপাঠী ডাক্তারদের মধ্যে যে এখন হাসপাতালে হাউস-সার্জেনরূপে কাজ করছে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল অন্যান্য রোগীদের সম্বন্ধে। কিন্তু তাদের আলোচনা আর বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে না। কমলা হাসপাতালে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠল। অসীমা ভ্রূটা কুঁচ্‌কে বিরক্ত স্বরে বললে, "মেয়েদের এই এক স্বভাব! এলেই সারা হাসপাতালটা কান্না আর চিৎকারে ভরিয়ে দেবে। আমি এগুলো সাপোর্ট করিনা।"

সহপাঠী ডাক্তারটি হেসে বলে, "তাই বলে বাধা দিতে পারা যায়না ত', যাক্ আপনার স্টাফের ভাগ্য ভাল লোকটা মরবেনা বলেই বোধ হচ্ছে।"

অসীমা কিছু উত্তর দেবার আগেই পরমেশবাবু এসে বললেন, "মা তুমি যদি না যাও, তবে বৌটাকে বোঝাবে কে বল! বড্ড কান্নাকাটি করছে মেঝেতে লুটোলুটি করে।"

বিরক্তভাবে 'অসীমা হঠাৎ বলে ওঠে: "কাঁদাই উচিত! মানুষের হাতে পড়েনি ত'। এখন বোধ হয় ওর অদৃষ্টে আরও দুঃখ আছে বলেই আপদটা বেঁচে উঠল।"

ম্লান হেসে পরমেশবাবু বললেন, "তা সত্যি! কেউই দেখতে পারেনা

বাঙ্গাল চক্রবর্ত্তীকে। কিন্তু বিনা দোষে বৌটাকে ত' আমরা শাস্তি দিতে পারিনা। চলো, তুমি যদি পার বৌটাকে একটু ঠাণ্ডা করতে। ডাক্তারবাবুর কাছে সবই শুনলাম এখন দুর্ভাগা বেচারীর চূড়োন্ত এসেছে; কচি কাচার মা—" পরমেশবাবুর স্বর কমলার দুঃখে জড়িয়ে যায়।

"বেশ—চলুন", বলে অসীমা ধীর গম্ভীরভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সহপাঠী ডাক্তারটিকে ডেকে।

অসীমা সহপাঠী ডাক্তারটিকে নিয়ে কেবিনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কমলা পাগলের মত ছুটে এসে অসীমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ল একেবারে। "দিদি—এমন সর্ব্বনাশ আমার কেন হ'ল, আমার যে কেউ নেই! কারুরত' কোন ক্ষতি আমি করছি বলে মনে পড়েনা, তবে,—তবে কেন এমন করে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! কে আমাকে এমন অভিশাপ দিলে দিদি—?"

আকস্মিক, অভিশাপ কথাটা অসীমাকে যেন ভাবিয়ে তোলে একটু। কই কখন ত' সে কমলাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে না! উপরন্তু কমলাকে সে কৃপার দৃষ্টিতেই এই ক'বছর দেখে এসেছে। দরিদ্র একটা কেরাণীর স্ত্রীর বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এক সুখের আকাশে সে মুক্ত পাখীর মত বিচরণ করছে। উচ্চ শিক্ষায়, প্রভূত অর্থে, অপরূপ সৌন্দর্য্যে, সুস্থ দেহে জীবনে সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এতটুকু ত্রুটি কোনদিক থেকে নেই! তবে কমলাকে কেন সে অভিশাপ দেবে? একদিন সমাজের বিরুদ্ধে তাকে সুরেন চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করেনি বলেই ত' আজকের অসীমা রূপে রসে গন্ধে, অতুলনীয়া হয়ে ওঠার সুযোগটা পেয়েছে। অতীতের সরসীর সেই নির্য্যাতিত জীবনটা থেকে সে তিলতিল করে গড়ে উঠেছে, এবং যাকে কেন্দ্র করে সংসারের পথে সে এগিয়ে চলেছে সেই প্রিয় মানুষটির সঙ্গে অদূরের ঐ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

লোকটার তুলনা করতে ও নিজের মনে ঘৃণা হয়, শুচিতায় আঘাত করে, বিদ্রূপে ঠোঁটের কোণ বাঁকা হয়ে ওঠে। অসীমা মনের রূঢ়তা চাপবার চেষ্টা করলেও মুখ ফস্‌কে বলে ফেলে: "তোমার এমন কি আছে যার জন্যে লোকে তোমাকে অভিশাপ দেবে, ঈর্ষা করবে! অশিক্ষিত মেয়েদের এই একটা ধারা। উঠে বসো পা ছেড়ে, আমরা চেষ্টা করছি দেখতেই ত' পাচ্ছ।—আসুন প্রশান্ত বাবু।" বলে সে তার সহপাঠী ডাক্তারটিকে ডেকে সুরেন চক্রবর্ত্তীর দিকে এগিয়ে যায়।

মুখে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে লোকটা। কমলা পায়ের উপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছে, খোকন আড়ষ্টভাবে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে আছে, খুকী বাপের ঐ অপরূপ চেহারটা দেখে ভয়ে কেঁদে ওঠায় বাইরে পরমেশবাবু তাকে ভোলাচ্ছেন।

অসীমা নিচু গলায় বললে, "আমাদের প্রফেসারকে আর একবার ডাকলে কেমন হয়!"

নার্স বললে, "ডাক্তারবাবু দেখে গেছেন। বললেন, এমনিভাবে আরও কিছু সময় যাবে। সকালের দিকে জ্ঞান হবে আশা করছেন!"

"আপনার স্টাফের ওপর দেখছি বেজায় মায়া!" হাল্কা পরিহাস করে পাশ থেকে আর একটি সহপাঠী।

অসীমা হেসে বললে, "মায়া অন্য দিকে," বলে কমলাকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে। তারপর একটু এগিয়ে এসে কমলার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ মাখা সুরে বললে, "ঐ শোন কমলা, ডাক্তারবাবুরা কি বলছেন। কাল সকালের দিকে জ্ঞান ঠিক হবে। তুমি বাসনার কাছে সব জেনে নাও, আমি যাই ভাই। সমিতিতে কাল থেকে যাওয়া হচ্ছেনা।" বলে অসীমা আর একটি নার্সকে কমলার জিম্মা দিয়ে ডাক্তারদের নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ব্যবস্থা হ'ল কমলাই এসে এখানে থাকবে। তাতে অন্ততঃ নার্স রাখার খরচটা একটু কম হবে। কেবিন ভাড়া, নার্স রাখা এখনকার দিনে সম্ভব হয়না। বিশেষ করে একটা একশ' টাকাওয়ালা মিলের ছোট বাবুর জন্য। তবে যতটুকু প্রয়োজন মিলের মালিক দেবে ঠিকই। পরমেশবাবু কমলার চাবি নিয়ে চন্দননগর চলে গেলেন প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিছু আনার জন্য।

দিন দুই পরের কথা। অসীমা ক্লান্তভাবে নিজের ঘরে সবে মাত্র এসে বসেছে, এমন সময় রাঙুর কলকণ্ঠ শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে কয়েকটা পায়ের শব্দ অসীমার কানে এল।

রাঙু হাসতে হাসতে বললে, "কি দিদি সীমা এখন দে!" রাঙুর যখন আনন্দটা নিজের ভিতরে আর রাখতে পারেনা তখনই ছোট্ট বেলার ডাকটা তার বেরিয়ে পড়ে।

অসীমা সহাস্যে বললে, "বারে, দিদ্দি আমাকে চেপে ধরলে দেখি, চিঠিটা কে লিখেছিল?"

"আর আমি বুঝি ঐ দূর থেকে শচীনদাকে দেখতে পেলাম না! দৌড়ে সেই মোড় থেকে আমি গাড়ীতে উঠে এসেছি।"

কেষ্টর বাহাদুরীতে বামুনদি হেসে বললে, "বেশ করেছিস, এখন যা ত' দৌড়ে একবার পুরুতমশাইয়ের কাছে, কাল হরির লুট হবে। বুঝলে রাঙুদি আমি মেনে রেখেছিলাম শচীনদা ভালয় ভালয় এসে পৌঁছুলে হরির লুট দেব।"

খুশি হয়ে রাঙু বললে, "ঐ সঙ্গে কালীঘাটে পূজাটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? দিন যে কি ভাবে কেটেছে ভগবানই জানেন!"

"বেশ যা হোক লোক তোমরা। দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যবস্থাই করছ কে কি

করবে, ওদিকে যে দাঁড়িয়েই রইলেন ভদ্রলোকটি সে খেয়াল বুঝি নেই! ঘরে এস।"

শচীন হাসতে হাসতে অসীমার কথার উত্তরে বলে, "সকলের ব্যবস্থা শুনলাম কিন্তু সীমার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা ত' শুনলাম না!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে ঢোকে পাশের ঘর দিয়ে ঘুরে।

"একটু না হয় বুড়ীদিদিকে ঠেলেই ঢুকতে ভাই, ছোঁয়া লাগলে বুড়ো হয়ে যেতে না!"

রাহুর ঠাট্টায় সহাস্যে শচীন বললে, "তোমাদের কথার ফ্লো'টা তাহলে নষ্ট হয়ে যেত! আর উনি কি বলেন সেটা ও শোনার আবশ্যক ছিল বইকি।" শচীন অসীমার পাশের সোফাটা জুড়ে বসে কথার শেষে।

কাজের তাড়ায় হাসি চেপে বামুনদি চলে যায়। রাহু পাল্টা জবাব করে, "ওঁর কথা আর বলার নয় ভাই। কাজের ওপর কাজে যেয়ে যেন বাড়ীতে আসাটা ছেড়েই দিয়েছে। তুমি নিজেই বলো, শরীরটা রোগা হয়ে গেছে কিনা! কিন্তু কে শুনবে সে কথা! এখন তোমার দায়িত্ব তুমি বুঝে নিলেই আমি ছুটি পাই।"

"সত্যি সীমা, তুমি যদি এমনি ভাবে কাজে নাবো তবে চলবে না। এক মাসে খুবই রোগা হয়ে গেছ।"

"আর নিজে বুঝি খুব মোটা হয়েছ, ভেবেছ? আমি ত' ভাবতেই পারিনি এত কাল হতে পার তুমি। সত্যি, একেবারে চাষা চাষা চেহারাটা হয়েছে।"

"শুনলে রাহু সীমা আমাকে কি বললে! এখনই এই, শেষে কুরূপ হওয়ার জন্যে তোমার সুন্দরী দিদিমণিটি আমাকে না সোফার বানিয়ে রাখে।"

"হ্যাঁ, কুরূপ বই কি! এই ত' অপর্ণারও বিয়ে হয়েছে, ইন্দিরারও ঠিক আছে, কিন্তু তোমার মতটি হয়নি।" রাহু শচীনের মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসে।

অসীমা হেসে ফেললে কৃত্রিম ধমক দিতে গিয়ে।

দু'চোখ বড়বড় করে কৌতুকের সুরে শচীন বললে, "হ'ল ত'! এতবড় জোরাল সার্টিফিকেট কার আছে দেখাও দিকি! হুঁ এবার রীতি-মত ভক্তি শ্রদ্ধা করবে।"

অসীমা মুখ ভেংচে রাসুর দৃষ্টি আড়াল করে চট্‌পট্‌ একটা চিম্‌টি কাটে শচীনের হাঁটুর কাছে। ব্যাপারটা কিন্তু গোপন থাকে না মোটেই। শচীন অসীমার হাতটা শক্ত করে ধরে বললে, "রাসু গরম চিমটেটা নিয়ে এসো, ওর সরু সরু আঙ্গুলগুলো একটু ঠিক করার দরকার হয়েছে। উঃ যেন সাঁড়াশীর মত মোচড়টা দিল।"

রাসু হাসতে হাসতে বললে, "তোমাদের চা নিয়ে আসি। এখন বিকেলের চা ওর খাওয়া হয়নি। কাজের ওপর কাজ ত' একটি বেড়েছে হাসপাতাল যাওয়া।

"হ্যাঁ, লোকটা আছে কেমন?" শচীন সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করে অসীমার মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু রাসুই চলে যেতে যেতে জবাবটা দেয়, "বাঁচবে ঠিকই তবে মাথায় বলে গোল হবে।"

"কোন্‌ দিন গোল ছিল না? নইলে, সব জিনিসই ষ্টোরে গোলমাল হ'ত কেন!"

"না, এবারের গোলটা ঠিকই, ব্রেনে শক্‌ পেয়েছে। তবে এটাই আশ্চর্য্য যে, এত বড় এ্যাক্‌সিডেণ্টটায় মরল না লোকটা! মিলিটারী ট্রাকচাপা সহজ কথা নয়।"

"বাঁদরের আয়ু নিয়ে লোকটা এসেছিল বোধ হয়!" শচীন কথার শেষে হাহাকরে হেসে ওঠে।

"তা নেহাত ভুল বলনি, মাথার গঠনটা বাঁদর শ্রেণীরই। উঃ—, কি কদাকার, দেখলে যেন গা ঘিন ঘিন করে। বাবা কি করে যে এই লোকটাকে কাজে ভর্ত্তি করলেন ভেবে পাই না!" অসীমা দারুণ

ঘৃণায় মুখটা বিকৃত করে কথার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর যেন ঐ প্রসঙ্গটাকে মন থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "এবার তাহলে মিলের সব দায়িত্বটা নিচ্ছ ত'? আমি আর সামলাতে পারবনা এ তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি।"

"কিন্তু আমার যে ওখানের কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়নি। নিতান্ত তোমার জন্যে সত্যি খুব মন কেমন করল বলেই হঠাৎ চলে এলাম।" শচীন অসীমার দিকে তাকিয়ে হাসে একটু। পরে চিন্তান্বিত স্বরে বলে, "সৌরীনটা থাকলেও না হয় চলে যেত, একা কতগুলো বাচ্চা ছেলে-ছোকরা নিয়ে কিছুতেই দিবাকর থাকবেনা। একটা গোলমাল শুনেছে কি, ছেলেগুলো তেড়ে বেরুবে। ওদের সেই সময় আটক করা সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার। এখানে আর দাঙ্গা কি হ'ল! দেখতে হয় পূর্ব্ব-বাংলায়।"

"আমার দেখার দরকার নেই। তবে তোমাকে একটা অনুরোধ করছি, এবার আর তুমি যেওনা। আমার যেন কেমন ভয়ভয় করছে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা এমন ব্যাকুল ভাবে শচীনের হাতটা চেপে ধরে দু'চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি ফুটিয়ে যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য শচীন যেন কথা খুঁজে পায় না। কোথায় ভয়, কেন ভয়, কোন কিছুই যদিও শচীন বুঝতে পারে না, তবু মনে মনে একটা কাল্পনিক আতঙ্কে অসীমা যে শিউরে রয়েছে এটা অনুভব করেই, মনে সাহস সঞ্চার করতে, বলে, "ভয়ের কি? এখন ত' অনেক কমেই এসেছে দাঙ্গা। তখন বরং ভয়ের ব্যাপার ছিল। আচ্ছা পাগ্‌লা তুমি দেখি।" সহাস্য মুখে শচীন অসীমার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দেয়, গালের পাশ থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দেয়।

অসীমা ঐটুকু আদরে মোটেই ভোলে না। আরও যেন আকুল হয়ে অজানা ভয়ে ছেলেমানুষের মত আব্দারের সুরে বলে ওঠে: "না, তুমি

আমাকে ছেড়ে ওখানে আর যেতে পাবেনা। তুমি আমার মনের কথাটা কেন বোঝনা বলো ত'? কাজে, কর্ম্মে, কোন কিছুতেই তুমি পাশে না থাকলে এক পাও এগুতে আমার সাহস হয়না। এই ন্যাখোনা কত বড় একটা হাঙ্গাম আমার মাথার ওপর দিয়ে গেল। তুমি থাকলে ত' এই ঝক্কিটা আমাকে পোয়াতে হ'ত না! বেশ ত' এবার না হয় রথীদা' যাবেন। কালও তিনি বললেন, তুমি তাঁকে একবারও যেতে দিচ্ছ না, সব ঝোঁকটা একা নিয়েছ। এখন তোমার রেস্ট নেওয়া দরকার। তিনিই এবার যান, কেমন?"

অসীমার ছলছলে ডাগর চোখ দুটো শচীনের মত কর্ম্মী পুরুষের মনটাকেও একটু বুঝি দুর্ব্বল করে ফেলে। হেসে সে বললে, "এতদূর থেকে এই জন্যেই বোধ হয় ছুটে এলাম। তোমরা নারী বড্ড সাংঘাতিক জিনিস! সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে থাকলেও মনে মনে পুরুষকে আকর্ষণ করে দিব্বি ছুটিয়ে আন দেখছি। মুনি ঋষিরা নারীকে এই জন্যেই এত ভয়ের চোখে দেখতেন। সারা জীবনের তপস্যা, নিষ্ঠা হয়ত' কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাঁদেরও সঁপে দিতে হয়েছে সুন্দরীর পায়ে। আর, আমি ত' সামান্য মানুষ, গৃহের মায়া আছেই। বেশ, আজই রথীদাকে বলে যাব কথাটা যে, আমার সুন্দরী ভাবী গৃহিনী 'যেতে নাহি দিব' বলে পথ আটকেছেন।" উচ্চকণ্ঠে শচীন হাসতে থাকে অদূরে রাসুকে খাবার চা গুছিয়ে, ট্রেখানা হাতে এগিয়ে আসতে দেখে।

অসীমা তার জলের ছায়া পড়া চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল করে এক মুখ হেসে বললে, "বেশ ত' চলনা এক সঙ্গে ইন্দিরাদের বাড়ী যাই। অনেক দিন যাইনা মেসোমশাই কেমন আছেন দেখে আসব। উনি আমার ওষুধে খুব বিশ্বাস করেন। আর মাসীমা ত' দেখলেই তোমার কথা হাজার বার জিগ্যেস করবেন। চা খেয়ে চলো ঘুরে আসিগে। রাসু তুমিও চলনা আমাদের সঙ্গে। অনেকদিন ত' ভবানীপুরে যাওনি—

যাবে?” রাহু ট্রেখানা শচীন আর অসীমার মাঝখানের টিপয়টার উপর রেখে বললে, “আমি—না বাপু, তোমরাই ঘুরে এস। শচীনদা'র জন্তে খাবারের ব্যবস্থা করা আমি ছাড়া হবেনা।”

“তোমার শচীনদা এমন একটা কি খাবে যে তুমি বেড়াতে যেতে পারবে না।—চলইনা একটু!”

শচীনের কথায় রাহু বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে ঔদাস্ত দেখিয়ে বললে, “বুড়ো মানুষ কি শীতে বেরুতে পারে। ঘরে বসেই আমার হাতপা শিটিয়ে যায়, আমি যাব মোটরে করে ভবানীপুর!—তোমরাই যাও।”

খিল খিল করে হেসে অসীমা বললে, “এখনও যদি শীত বলে কাঁপতে থাক তবে তোমাকে বাহাদুরী দিতে হয়! ফাগুন মাস বলে কিনা শীত!”

“শীত-টিত কিছু নয়, মোট কথা আমাদের সঙ্গে বুড়ী বেরুবে না।” শচীন স্মিতমুখে চায়ের কাপটা ট্রের উপর থেকে তুলে নেয় কথা বলতে বলতে।

রাহু মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে: “এই ত' সোজা কথা! তবে বেশী রাত করোনা যেন, আমি লুচির ময়দা মাখছি।”

অসীমা দুষ্টু মেয়ের মত ঘাড় বাঁকিয়ে পিছু থেকে রাহুকে শাসায়—“বুড়ীকে আজ সারারাত খাটিয়ে মারবো। কেবলি কুবুদ্ধি!”

“কুবুদ্ধি মোটেই নয় বরং ওর এই সুবুদ্ধিটুকুর জন্তে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি,” শচীনের কথায় রাহু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়, হাসতে হাসতে।

বিশ

কর্ম্ম স্রোতের অবিশ্রান্ত টানে আরও দুটো মাস অসীমার, কোথা দিয়ে কেটে গেল নিজেই সে ভেবে পায় না। যেন হাল্কা পালকের মত লঘু অথচ চঞ্চল গতিতে দীর্ঘ দুটো মাস চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সারা দিনই সে শচীনের পাশে পাশে থেকে প্রতিটি কাজে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে, সাহায্য করছে। শ্রান্তিতে যখন দুটি মানুষ অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন আসে রাসুর কাছে ভবিষ্যতের নানা স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে অসীমা যেন দোল খাচ্ছে! ভবিষ্যতের রঙ্গিন আকাশে অসীমার মন পাখীর মত উড়ে বেড়াচ্ছে নীড় বাঁধার কল্পনায়। নিজেকে নিয়ে অসীমা এত গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, কমলার কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। নিজে খোঁজ খবরটা নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। পূর্ণ দুটি মাস এসব ঝড় ঝাপটা শচীনের উপর দিয়েই গেছে। সে কোন খোঁজই রাখেনি, কোথায় কে এক দুর্ভাগা নারী রয়েছে! আজ যখন কমলার মৃত্যু সংবাদটা হঠাৎ রাসুর মুখ থেকে তার কাছে পৌঁছুল, সত্যি, মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝি সে স্তব্ধ হয়ে গেল। ভাবতে চেষ্টা করে কয়েকটা মাস পূর্ব্বের কথা। কমলা তার স্বামীকে সুস্থ দেহেই হাসপাতাল থেকে পুরান কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সে ত' নিজেই জানে। তারপর যতটা সম্ভব সুবিধা হতে পারে কমলাকে মিলের প্রতিটি লোক সাহায্য করেছে। বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষটার প্রতি দরদ কারুরই ছিল না। কিন্তু ঐ ফুলের মত নিষ্পাপ শিশু খোকন, দুর্ভাগা কমলাকে সকলে আগলে রাখতে চেয়েছিল, তবু সে এভাবে মরল কেন? অভাব, অনটন, দুঃখ, সব কিছুই কমলার জীবনে ছিল, কিন্তু শোককে

সামলে জীবন চালাতে পারলে না এমনি দুর্ব্বল মনের একটি বধূ সে! রাগ হয় অসীমার, কমলার বুদ্ধিহীনতায়। ঘরে বিকৃত মস্তিষ্ক স্বামী এবং অবোধ ক'টি শিশু ছেলেমেয়ের সামান্য কাজটুকু সামলে, সংসারও যদি চালাতে না পারে সে নার্সের কাজে কেন ঢুকেছিল?

অসীমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে রাসু সমবেদনার স্বরে বলে, "একেই বলে কপাল যখন ভাঙ্গে, সব দিক থেকেই ভাঙ্গন সুরু হয়। ছুঁড়ি পরের দয়ায় চিরকাল থাকার ভয়ে নার্সের কাজ শিখতে ঢুকল, আর কিনা এদিকে ছেলেমেয়ে দুটো ঘরে উনুন জ্বালতে গিয়ে এই কাণ্ড! ঐ পাগলাটার উল্লাসের চিৎকার শুনেই না পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসে কম্পাউণ্ডারের ছেলেটা। উঃ আগুনে পুড়ছে এদিকে কাচ বাচ্চা দুটো, পাগলাটার হেঁ হেঁ করে সে কি হাস হাততালি। একটু আগে যদি ধরা যেত, তবে হয়ত চেষ্টা করলে বাঁচত। বিষ খেয়েছে কি সাধে, মর এখন তুই পাগলা।"

অসীমা ম্লান হেসে বললে, "পাগলা। মরছেনা, মেরে গেল আমাকে। এখন এটাকে যে কোথায় পাঠাই ভেবে পাচ্ছিনা। পয়সা, টাকার, বিষ্টি কম হ'ল না। আমি আর টাকা ঢালতে পারবনা। ওটাকে রাঁচি পাঠাতে বলে দিই।" অসীমা ব্যস্তভাবে উঠে ফোন্ ধরলে।

শচীন মিলের কাজের সঙ্গে কমলার সৎকারের ব্যবস্থা, সুরেন চক্রবর্ত্তীকে রাঁচি পাঠান সব কিছু সেরে অসীমার সঙ্গে দেখা করতে এল। প্রথমেই সহাস্যে সে অভিযোগ করলে: "বেচারা বাঙ্গাল চক্কত্তির ভাগ্যটা হঠাৎ রাহুতে বুঝি গ্রাস করলে। একেবারে 'পপার ওয়ার্ডে' ঠেলে দিলে! আমার কিন্তু ভারী দুঃখ হচ্ছে বেচারাকে রাজতক্ত থেকে তাড়ানর জন্যে।"

"দুঃখ হচ্ছে ত' পকেট থেকে টাকা ঢেলে কেবিন ভাড়া করে রাখলেই হয়। কি টাকার শ্রাদ্ধই না করালে হতভাগা লোকটা। এক এ্যাকসিডেণ্ট

নিয়েই কি টাকা গেল কম! পূর্ণ শনির মত আমার মিলে ঢুকেছিল, এবার যদি শান্তি আসে।”

অসীমার বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে শচীন কৌতুক করে বললে, “বেচারী বাঙ্গাল চক্কোত্তি এমন কি তোমার কাছে অপরাধ করেছিল যে, শনির সঙ্গে একেবারে তুলনা করে ফেললে! একটু না হয় চুরী ছাঁচড়ামাই করত। আর তোমার পরিচয় ভাঙ্গাত’ যে তুমি তার স্ত্রীর কিরকম কাজিন্ হও। কিন্তু এবারে বুঝলে মিলের কর্ত্রী বড় কড়া। গুড়-শুড়িয়ে গাড়ীতে উঠে বসল পুরোন দলিলের মত কি একটা কাগজ হাতের ভেতর গুটিয়ে নিয়ে। শুনলাম দেশের বাড়ীটা কার কাছে বলে বাঁধা ছিল, সেটা শোধ করার পর থেকে ঐ কাগজটা নিজের কাছে কাছেই রাখত। এখনও পাগোল অবস্থায় কাগজটা আঁকড়ে বসে থাকে। অদ্ভুত লোক কিন্তু ঐ লোকটা!” শচীন হো হো করে হেসে উঠল সুরেন চক্রবর্ত্তীর খুঁটিনাটি কথা বলে।

অসীমা হঠাৎ রাগ করে বলে উঠে: “ঐ কাহিনী নিয়েই তুমি থাক! আমি আজই সন্ধেতে রাণীগঞ্জ যাচ্ছি।” অসীমা কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীনের গায়ে ছুঁড়ে মারে কিছু আগে আসা টেলিগ্রামখানা। তারপর শচীন পাছে রাণীগঞ্জ যেতে আপত্তি তোলে তারই যেন পথটা আটকাতে বলে উঠল, “এখানের মিল নিয়ে থাকলেই চলবেনা। বাবার এক পুরোন বন্ধু ঐখানে থাকেন, তাঁর সঙ্গে বাবার সেবার কি কথা হয় মনে আছে? একটা কলিয়ারী বিক্রি হচ্ছে। তিনি টেলিগ্রাম করেছেন।”

শচীন চোখে মুখে হতাশ ভাব এনে বলে, “এদিকে আমিই বিক্রি হতে বসেছি তবে কলিয়ারী আর বিক্রি কেন হবেনা।”

“বিক্রি মালের অত মতামত থাকেনা। তুমি দশটায় আসবে আমি বেলাবেলি মোটরে বেরুব।”

“বেশ—সোফারের উপর মালিক মহাশয়া যা আজ্ঞা দেবেন তাই হবে।

তবে এখনই আমাকে উঠতে হচ্ছে, ঘরে বুড়ী মা আছেন ত'! এক হপ্তার ওপর আমাদের মা ছেলেতে দেখাশুনো হয়না, দেখিগে মা কেমন আছেন।"

বিদ্রূপ করে অসীমা বলে, "একেবারে ভক্তিমান ছেলে! আমি থাকতে কাউকেই অমন দেখিগে বলে, দায়ঠ্যালা দেখতে হবেনা। নিজের কাজে যাও। আমি তোমার চেয়ে সংসার বুঝি। মাকে নিয়ে বামুনদি রাণীগঞ্জে কালই চলে গেছে। এখানে ওঁর শরীরটা ভাল দেখলামনা তাই ঘুরতে পাঠিয়েছি। শখ হয়েছে বদ্দিনাথ যাবেন।"

"তবে ত' হয়েই গেল আমি সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলিগে।" শচীন খুশি মনে ব্যস্ত হয়ে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

"আজ্ঞে সেটাও সারা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এখন দয়া করে সমিতিতে খবরটা দিয়ে আসুন গে, আর কিছু অনুগ্রহ ক'রে করতে হবে না।" অসীমা হাসতে হাসতে আলমারী খুলে নিজের জামা কাপড় গুছুতে থাকে শচীনের সুটকেস্‌টার ভিতরে ঠেসে ঠেসে।

রাণীগঞ্জ থেকে মোটর ছুটিয়ে আবছা অন্ধকারে যেখানে এসে তারা থামল, সেটা একটা নদীর পাড়। অসীমা কৌতুক হাস্যে পাশের মেয়েটিকে বললে, "এটাই বুঝি নদী? তুই আমাকে আচ্ছা বোকা বানালি কিন্তু বুলু!"

ফ্রক-পরা বছর এগার-বারোর' ফুটফুটে একটি মেয়ে, তার মাথার ঝাঁকড়া চুল নেড়ে সে শচীনকে সাক্ষী মানে—"আচ্ছা শচীনদা, আপনিই বলুন, বাবা নিজে বলেননি এই নদীটার কথা? সীমাদি বিশ্বাস করছেনা।" গাড়ী থেকে নেমে শচীন চতুর্দ্দিকে তাকাতে তাকাতে সহাস্যে বললে, "কাকাবাবু বলছেন ঠিকই, কিন্তু এই মরা একটা জলের স্রোত দেখে

কেমন যেন বিশ্বাস হতে চায়না যে এই ক্ষীণ কায়াটিই গত বর্ষায় ফুলে-ফেঁপে তেড়ে এসেছিল তোমাদের বাংলো পর্য্যন্ত !"

অসীমা কৌতুক করে বললে, "অথচ গরু হেঁটে যাচ্ছে, মানুষ পারাপার হচ্ছে কি বলিস্ ?"

গাড়ী থেকে বুলু ছিটকে নেমে দৌড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, "হুঁ আসুক না বর্ষা, দামোদরের সঙ্গে যোগাযোগটা হ'লে দেখবে কেমন চেহারা ওর। এই জন্যেই মা কি বলেন জানো সীমাদি, শ্রীরাধা অভিসারে চলেছেন, সব বাধাবন্ধন ভেঙ্গে তার বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনের জন্যে। নদীর মধ্যে শ্রীরাধা আসেন তখন, নয় ?"

শচীন বুলুর ছেলেমিও সরলতায় খুশি হয়ে বললে, "কাকীমা যখন বলেছেন তখন কি মিথ্যে হতে পারে! নিশ্চই আসেন।" শচীন বুলুর পাশে একটা পাথরের উপর বসে কথার সঙ্গে সঙ্গে।

অসীমা গাড়ী থেকে নেমে নদীর চতুর্দ্দিকটা দেখতে দেখতে ভাবে বুলুর মায়ের ঐ তুলনাটি। এখন যে ক্ষীণকায়া, ধীর মন্থর গতিতে কুলকুল শব্দে, উঁচু-নিচু পাথরগুলোর উপর দিয়ে তরঙ্গের দু'চারটে ক্লান্ত ঝাপটা মেরে কোন রকমে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, বর্ষার মেঘ দেখে এই ক্লান্ত নদীটিই দু'কূল ছাপিয়ে উন্মাদগতিতে ছুটে যাবে দমোদরের দিকে। সত্যিই যেন, শ্রীরাধার সমস্ত কামনা, বাসনা নিয়ে বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের দিকে চেয়ে, প্রিয় অভিসারে নিজেকে বিলিয়ে দেবার এক সর্ব্বগ্রাসী আগ্রহে ছুটে চলে আজকের এই শান্ত নদীটা।

গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া নদীর ভিতরে উঁচু উঁচু যে পাথরগুলো শেওলা শুকিয়ে এরই মধ্যে বুনোগাছের জন্ম দিয়েছে পাথরের ফাঁকে জমা মাটির ভিতরে, তার উপর দিয়ে লোক চলাচলের চিহ্ন দেখে অসীমা সাগ্রহে বলে, "পাড়ে বসে কি হবে, এখানে সব এসো।" বলেই সে ধপ করে একটা পাথরের উপর বসে পড়ে।

অসীমাকে বসতে দেখে দৌড়ে বুলু এগিয়ে যায় যদিও, কিন্তু বসেনা। একটু যেন থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, "ওখানে সাপ থাকে মা বলেছেন। শেষে যদি রাগ করেন বসলে ?"

"দূর, সাপ কোথা থেকে থাকবে! আয় আমার কাছে, এখানে বসে সূর্য্য দেখবো।" অসীমা হাতবাড়িয়ে বুলুকে কাছে টেনে নেয়।

শচীন হাতের ছড়িটা দিয়ে পাথরগুলোর উপর এলো মেলো ঠুকতে ঠুকতে বলে, "বোনটি আমার পিলে সুদ্ধু চমকে দিলে যে! এখন তোমার সীমাদির মত জেঁকে বসতে, সাহস হচ্ছেনা।"

"উঃ কি ভীতু" বুলু হাসতে হাসতে অসীমার কোলের উপর লুটিয়ে পড়ল। অসীমা হাসি চেপে মুখ ফিরিয়ে বললে, "বসতে সাহস হচ্ছেনা বলে ওদের আর খোঁচাতে হবে না।"

শচীন সুরে হতাশার ভাব এনে বসলে, "সাধে কি লাঠি ঠুক্‌ছি বাবার চেলারা যদি কেউ থাকেন সরে যাবেন।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমার কাছ ঘেঁষে একটা উঁচু পাথরের উপর বসে পড়ল রুমাল পেতে।

অসীমা মুখ টিপে বিদ্রূপের সুরে বুলুকে বললে, "আমাদের কাপড়ের চেয়ে বেশী দামী কাপড়, নারে ?"

"কাপড় দামী নয়, তবে গরীব মানুষ ত' নষ্ট হলে পাব কোথায় ?"

"তাই বটে! হিসেবী মানুষই, ক'জোড়া সুট, ধুতি, পাঞ্জাবী যে এধারে ওধারে সেদিন খুঁজে পেয়েছি মাকে জিগ্যেস করে দেখো। বুলু পর্য্যন্ত অবাক হয়েছে হিসেব দেখে।"

নিরীহ গো বেচারার মত মুখ করে শচীন বলে ওঠে, "ঘর বাঁধার সূচনাতেই শ্রীমতী অসীমা দেবী যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে এই মিষ্টি ভোরটুকু নষ্ট করেন তবে আমাকে উঠতে হবে এখান থেকে।"

"তুমি উঠবে কেন আমিই উঠে যাচ্ছি। আয়ত' বুলু আমরা চলে যাই!" অসীমা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে নড়ে চড়ে বসে। তারপর একটু

ফস্ করে ছোট্ট ঢিল তুলে শচীনের পায়ের দিকে তাগ করে মারতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বুলু খিলখিল করে হেসে উঠল।

"পারলে না তিক্ করেতে, দাও আমি করি।" বলে বুলু একটা ঢিল তোলে সাগ্রহে।

শচীন দু'চোখ সভয়ে বিস্ফারিত করে বলে, "এইরে! দু'বোনের তিক্ রাখতে বুঝি আমার নিরীহ পা দুটি যায়। রক্ষে কর বুলুরাণী, তোমার গুলতির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আপাততঃ এযাত্রা ছেড়ে দাও।"

বুলু দুষ্টুমী করে হাতের ছোট্ট ঢিলটা হাতে লুকতে লুকতে বললে, "বাবাকে যেমন বোল প্রিন্স বলে সবাই জানে। আমাকেও তেমন গুলতি মারার জন্যে সবাই জানে দেখছি। নইলে শচীনদা কলকাতায় বসে আমার খবর রাখেন কি করে! কি বল সীমা দি?"

অসীমা বুলুর ঝাঁকড়া চুলগুলো মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে সহাস্যে বললে, "দেখতেই ত' পাচ্ছিস কেমন গাত গুনতে জানে! গুণত' কেমন ঝগড়া করা আমার সঙ্গে!" বলেই হঠাৎ সবিস্ময়ে দূরে আঙ্গুল দিয়ে নদীর মাঝামাঝি একটা সাদা মত উঁচু ঢিবির দিকে দেখিয়ে বুলুকে প্রশ্ন করে, "ঐ সাদা মত উঁচু জিনিসটা কি রে?"

অসীমার আঙ্গুল বরাবর চেয়ে বুলু ফিক্ করে হেসে ফেললে, "ওটা ভুতুর চর। ওখানে বলে চোরা বালিতে বসে থাকে ভুতু বলে একটা চাষার ছেলে। কবে কোন দিন তার গরুগুলো চোরা বালিতে ডুবে গিয়েছিল, আজও ভুতু তাদের জন্যে খোঁজে আর কাঁদে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে বুলু অশরীরী আত্মার ভয়ে অসীমার গা ঘেষে বসে। আধ ফোটা আলো ছড়ান নদীর পাড়ে কেমন যেন ছম্‌ছমিয়ে ওঠে ছোট্ট মেয়েটি। অসীমা বুলুর ভয়টা বোঝে, তাই তাকে কোলের কাছে টেনে কৌতুক করে বললে, "তোর ভুতুর চরে ত' কাউকে দেখছিনা। শুধুই ত'

চিক্‌চিক্‌ করছে কেবল বালি আর বালি। সত্যি কি সুন্দর লাগছে জল থেকে উঁচু হয়ে ওঠা ঐ চক্‌চকে চরটুকু!"

অসীমার কথার সূত্র ধরে শচীন জোৎস্নার মত স্নিগ্ধ নরম আলো মাখা পৃথিবীর দিকে চেয়ে বললে, "হ্যাঁ, সত্যি সুন্দর এই জিনিসটা। কে বলবে যে ঐ চক্‌চকে বালির তলা দিয়ে খরস্রোত বয়ে যাচ্ছে।"

মুগ্ধ অপলক চোখে অসীমা চেয়ে থাকে দূরে ঐ জল থেকে মাথা উঁচু করে থাকা চক্‌চকে সাদা চরটার দিকে। মনে হচ্ছে যেন আজকের এই স্তূপ হয়ে পড়ে থাকা চকচকে সাদা বালির চরটা একদিন ঐ নদীরই তলায় অন্ধকার রাজ্যে রূপের দীপ জ্বেলে নিজের পূর্ণতায় সার্থকতায় জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু প্রলয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে যখন তাকে পাকিয়ে পাকিয়ে বিশ্বাসে আঁকড়ে থাকা বন্ধনটা সমূলে ছিঁড়ে, আছড়ে ফেললে আলো, বাতাসে ভরা অচেনা এক রাজ্যে, তখনই বুঝি বদলে গেল জীবনের পট-ভূমি! সৃষ্টির আর একটা পথে পুরাণো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে গেল নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাই বুঝি মাথা উঁচু করে চরটা জেগে উঠেছে পুরাণো জীবনটাকে আলোর স্পর্শ দিয়ে ধুয়ে মুছে শুভ্র সুন্দর করে তুলতে। মানুষের জীবনটাও এমনি করে হঠাৎ একদিন বদলে যায়! নিজের মনেই হাসি আসে সে দিনের কথা মনে করে। আজ কোথা থেকে কোথায় দূরে সরে এসেছে। সে দিনের সরসীর জীবনে এত আলোর স্পর্শ কি ছিল? আজ জীবনের চতুর্দ্দিকে যেন এই সাদা বালির চরটার মতই সুখের, আনন্দের আলো চিক্‌চিক করছে। ভরে উঠেছে জীবনের সার্থকতায়।

অসীমার চিন্তাস্রোতে বুলু ঝাঁপিয়ে পড়ার মত করেই যেন বলে উঠল: "আরে এই দিকে ত্থাখো, আকাশটা কিন্তু লালে লাল হচ্ছে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীমার মুখটা ঘুরিয়ে দেয় শাল বনের দিকে।

পূব-আকাশে তখন সবেমাত্র লালচে ক'টা রেখা পড়েছে দেখে শচীন

বললে, "এই রেখা ক'টা কিছু আগে আলোর আভা যাকে বলে, তেমনি একটা হাল্‌কা ভাব ছিল, কিন্তু এখন সেটা নিচের থেকে আস্তে আস্তে কেমন রেখায় রেখায় পরিণত হচ্ছে দেখেছ বুলু ?"

বুলু উল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে, "আমি দেখেছি তুমি দেখতে পেলেনা।"

অসীমা কিছু বলেনা শুধু, একটু হেসে আস্তে আস্তে নীল আকাশকে আলোর রেখায় রেখায় সাদা করে গাঢ় লাল একটা টিপের মত যে শিশু সূর্য্যটি শাল বনের উপর দিয়ে উঠছে সেই দিকে চেয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ বুলুরই যেন সমবয়েসী এমনিভাবে সরল উচ্ছ্বাসে বললে, "দেখ্‌লি, দেখ্‌লি ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া ঐ আকাশটায় সূর্য্যিটা কেমন লাফ্‌ মেরে উঠে পড়ল! ঠিক যেন দুষ্টু একটা ছোট্ট ছেলে!"

"মেঘের অতল সমুদ্র থেকে বেচারা সূর্য্যকে রোজই অমন লাফ্‌ মারতে হয়। তাই বলে একটি বীরশ্রেষ্ঠকে শিশুর সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়।"

"তোমার তাতে কি! আমি যদি শিশুর সঙ্গে তুলনা করতে ভালবাসি।"

শচীন অসীমাকে চটিয়ে দেবার জন্য বলে, "এখন থেকেই যে পরিমাণ ছেলের জন্যে ব্যস্ততা, শেষে আমি না পথে বসি!" জান বোধ হয় পুরুষ হিংসে করে—"

অসীমা চাপা গলায় ধমকে ওঠে: "কি হচ্ছে!" বুলুকে ইসারায় দেখিয়ে শচীনের কথাটা ঐখানেই থামিয়ে দিয়ে অসীমা রাগে গরগর করে এগিয়ে যায় দেখে, হো হো করে হেসে শচীন বুলুকে বললে, "তোমার দিদি চলল কোথায়, আমি কিন্তু ঐ চরের দিকটায় একবার যাব। বেশ সুন্দর জিনিসটা কাছ থেকে না দেখলে, ঠিক বোঝা যায় না।" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীনের চোখেমুখে একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে যায়। সে এতক্ষণ যে পাথরটার উপর বসেছিল, তার কিছু দূরের পাথরটার উপর হঠাৎ সে টপকে গিয়ে উঠে দাঁড়াতেই পাথরটা নড়ে উঠল, আর

নিচে থেকে খানিকটা জল ফোয়ারার মত ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বুলু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"চোরাবালি শীগ্‌গির নামুন।"

অসীমা দিক্‌-বিদিক্‌ হারার মত দৌড়ে এসে, একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে শচীনের হাতটা ধরে ভয়ার্ত্তস্বরে বলে ওঠে, "শীগ্‌গির" আর কোন কথাই সে বলতে পারে না। ভয়ে আতঙ্কে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে হাঁপাতে থাকে।

শচীন অসীমার কাঁধটাধ রে একটা ঝাঁকানী দিয়ে হাসতে হাসতে বললে: "আমরা চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে নেই, ভাল করে দেখলেই বুঝবে। উঃ কি ভীতু তুমি! একটু ঠাট্টা করতে গিয়ে দেখছি বোকা হয়ে গেলাম। তুমি বসো দিকি, কি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তোমার হাত! এতটা হবে বুঝলে কি বিষ্টির জমা জল নিয়ে মজা করতে যাই!" শচীন অসীমাকে পাথরের উপর বসিয়ে দেয় অপ্রস্তুতভাবে।

অসীমা কোন কথাই বলেনা শুধু, বুলুর কোলের উপর মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে নিজেকে যেন সামলে নেবার চেষ্টা করে। বুলু তার ফ্রকের পকেট থেকে রুমাল বের করে অসীমার ভয়ে ঘেমে ওঠা ঘাড়, গলা, কপাল মুছিয়ে দিতে দিতে হেসে বললে, "এবার যদি শচীনদার শিক্ষা হয়! সেদিন আগে নামার সময় এক কাণ্ড করলেন, আজ ত' তুলনাই নেই। আমি পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছি।" বুলু এমন ভাবেই তার ভয়ের ব্যাখ্যাটা করলে যে; তাতে মনে হয় অসীমার চেয়ে যেন তার জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট বেশী।

বুলুর কোল থেকে মাথা তুলে অসীমা বললে, "কী আমার পাকা বুড়ীগো!" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা উঠে দাঁড়ায়।

ক্লান্ত বিবর্ণ মুখে সে যখন মোটরে গিয়ে বসল তখন শচীনকে বাধ্য হয়েই বলতে হ'ল—"বুলু সত্যি এবার আমার শিক্ষা হ'ল! আর ত' এর সঙ্গে

ঠাট্টা নয়! আমার মত একটা কাঠ গোঁয়ারকেও হার্ট প্যাল্‌পিটেশান্ তুলে দিয়েছিল। মনে থাকবে তোমাদের এখানের সূর্য্যোদয়টি!"

শচীনের অপ্রতিভ মনভাবটা সরিয়ে দিতেই মোটরে সোজা হয়ে উঠে বসে অসীমা বলে উঠল, "মনে থাকাই উচিত। দাঁড়াওনা মার কাছে গিয়ে সব বলে দিচ্ছি।"

"আমিও মাকে বলব, মা আমায় সীমা ঠকিয়েছে! না আমি ভয় করি ঠিক তাই, দুর্ব্বল মনের খাঁটি একটি বাঙ্গালী বধূ!" শচীন প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে কথার সঙ্গে সঙ্গে। তারপর মোটরে উঠে বসে সাদা চরটার দিকে বলে, "একেবারে ঐ জিনিসটি তুমি। ওপরটি দিব্বি খটখটে শুকনো, পা দিয়েছ কি তলিয়ে যাবে তলার জলে। আগে এত ভয় ভীতিটি দেখতে পেলে আমিই সরে থাকতাম।"

"নাবুঝে যখন চোরা বালিতে পা দিয়েছ তখন, দুঃখ করে লাভ নেই। সুতরাং গাড়ীটা এখন দয়া করে স্টার্ট করলে আমি বেঁচে যাই "

"বাঁচবে বই কি; মা'র কা'ছে দশখানা করে লাগাবার জন্যে মন উস্‌খুস্ করছে ত'!"

হাসি চেপে অসীমা বলে,—"মায়ের খোকাটি যে গোঁয়ারগোবিন্দ সেটা উনি ভাল ভাবে জানেন বলেই—"

অসীমার কথা শেষ করতে দেয়না শচীন। গাড়ীর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করতে করতে বলে উঠল, "তোমাকে আমার গার্জ্জেন রেখেছেন।"

এতক্ষণ বুলু এই দু'টি পরিণত বয়সের নরনারীকে ছেলেমানুষের মত তর্ক, কথা কাটাকাটি করতে শুনে খুব কৌতুক বোধ করছিল। এখন শচীনের কথায় হেসে বললে, "শুনলে সীমাদি শচীনদার কথাটা।"

অসীমা হাসিটা কোনরকমে চেপে বলে: "মা যে আমাকে বেশী ভালবাসেন সেই জন্যে এই সব হিংসে। না! আর বেলা করলে এবার কিন্তু মা করবেন।"

শচীন গাড়ীতে স্টার্ট করতে করতে বললে, "দেরি ত' তুমিই করালে, এতক্ষণ বহু আগে বেরুন যেত। নাজানি কাকাবাবু আমার জন্তে এখনও বসে আছেন। আর এদের সঙ্গে আমি বেরুচ্ছিনা।"

অসীমাও পাল্টা জবাব দেয়ঃ "আমিও তোমার সঙ্গে আর বেরুব না। গাড়ীকে স্টার্ট করাতেই যদি দশঘন্টা লাগে, তবে পৌছুব কখন?"

শচীন কোন জবাব করেনা শুধু, ঘাড়টা ফিরিয়ে অসীমাকে ইঙ্গিতে শাসায়। তারপর নদীর শান্ত স্তব্ধতা ভেঙ্গে শচীনের মোটর গর্জ্জে ওঠে এবং মোড় ঘুরে কাঁকর বালির পথ কাঁপিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে চলে কয়লাখনি অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী "কোল প্রিন্স" এস, কে, গুপ্তর বিরাট বাংলোর দিকে। বুলু অনর্গল গল্প করতে থাকে। এদেশের সব খবর যেন তার কণ্ঠস্থ। অবাক হয়ে পথের দিকে চেয়ে অসীমা বুলুর গল্প শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

একুশ

চতুর্দ্দিকে আনন্দের উচ্ছ্বাস আর কোলাহল স্থুরু হয়ে গেছে। পনেরোই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হবে। যদিও বাংলার বুকে সীমানার প্রাচীর তুলে পূর্ব্ব বাংলাকে চিরদিনের জন্য দূরে সরিয়ে দিতে সকলের চোখেই জল এসেছে, তবু আসন্ন পনেরোই আগষ্টের জন্য ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন, আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। বন্ধ ঘরের দরজা জানলা আজ খোলা, স্তব্ধ রাজপথ কোলাহলে আবার মুখর হয়ে উঠেছে। যেন দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বাধীনতার বাতাসে নতুন করে বাঁচার আনন্দে ছুটোছুটি করছে। অসীমারও ছুটো-ছুটির অন্ত নেই। মিল সাজান, অফিস সাজান, বাড়ী সাজান সব নিয়ে এই দু'দিন যে রকম ব্যস্তভাবে ঘুরছে, তার চেয়েও যেন বেশী ব্যস্ত রাহু। সে সাজাচ্ছে অসীমার আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে ঘর। বাড়ীতে এর মধ্যেই রাজমিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। রাহু কোন দিক থেকে একটু ক্রটিও রাখবে না। ঘরের দেওয়ালে রঙের সঙ্গে মানান ক'রে দরজা জানালার রং এবং তার পর্দার রং হবে। এমন কি, কোন ঘরে কি রকম আসবাব প্রয়োজন, সে সব পর্যন্ত রীতিমত আর্টিস্ট এনে ব্যবস্থা করে ফেলেছে। বাড়ীতে এই প্রথম শুভ কাজ, রাহু তার এই একটি সূত্র ধরে যে রকম আড়ম্বর আরম্ভ করে দিয়েছে, তাতে অসীমা বাধা যদিও দেয় না তবে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রাহু কিন্তু সেসব মোটেই গ্রাহ্য করেনা। বরং তাকে জোর করে টেনে এনে ঘরগুলো দেখায় এবং এখনও আরও কি কি বাকী আছে, তার লম্বা একটা ফিরিস্তি মুখে মুখে বলে যায়। আশা, আনন্দ, উৎসাহ, রাহুর বয়েসটাকেও যেন হঠাৎ

অনেক কমিয়ে দিয়েছে। এমনিভাবে বিরাট বাড়ীটা সে একা তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে যখন অসীমা মিল সাজান উপলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছিল এমন সময় রাসু ডাকলে, "কোথায় যাচ্ছ দিদিমণি ?" অসীমা সিঁড়ি নামতে নামতে বললে, "বারে মিল সাজাতে হবেনা ? কালই ত' হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস।"

নিজের মনে রাসু আঙ্গুল গুণে বললে: "তবে মাঝে রইল মাত্র দুটো দিন, আজ ত' বাদই কাল আর পরশু। যাক্ তবে একটা চেক কেটে রেখে যাও। আমি তোমার জন্যে খাটের অর্ডার দিয়েছি, আজই আসবে।"

অসীমা দু'চোখ কপালে তুলে বলে ওঠে, "খাট! আমার কি খাট নেই নাকি!"

গালে হাত দিয়ে বামুনদি এগিয়ে এসে বলে, "ওমা এমন কথাও শুনিনি। পুরোনো খাটে ফুলশয্যে হয় নাকি! খাট বিছানা সব কিছু নোতুন করতে হয়।"

সখেদে রাসু বলে, "স্থাখ্‌লে ত' মজাটা, টাকা চাইলেই মেয়ে চোখ কপালে তুলে নানা কথা বলবে। আজ যদি কর্ত্তাবাবু বেচে থাকতেন তবে কি, একটা পুঁটকে মেয়ের কাছে প্রতি হাত টাকা চাইতে হ'ত।"

ওপাশ থেকে কেষ্ট একটা ঘুরপাক দিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললে, "বুঝলে দিদিমণি অশোকদা বলছিল রাসুকে এবার আঁকার ইসকুলে বলে মাস্টার করে দেবে। এই রং দাও ঐ রং দাও পছন্দ আর হয় না!"

ধমকে ওঠে রাসু: "যা শয়তান! জিনিসগুলো ঝাড়া মোছা করগে! নইলে ঝক্‌ঝক্ করবেনা। ঘর সাজান অত সোজা নয়।"

অসীমা হেসে বললে, "আপাততঃ তাইত' মনে হচ্ছে। একটা বিরাট মিল আমরা সাজিয়ে ফেললাম আর তুমি, ঘর সাজাতে কি যে করছ তুমিই জান। এক শিল্পী অশোক, সঙ্গে আবার তুমি!"

"বেশ, নিজের চোখেই দেখবে চলোনা। সবাই বলছে সুন্দর হয়েছে।

নইলে, কড়কড়ে একশ'টা টাকা কেউ এ্যাডভান্স দিয়ে যায় না।" অসীমার বিয়ে উপলক্ষ্যে রাসুর নির্দ্দেশ মত যে ঘরটা বিশেষ করে এখন সাজানো হচ্ছে সেই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে অশোক রং মাখা তুলি হাতে। অশোকের দিকে ফিরে কৌতুক হাস্তে অসীমা বলে, "তোকে আবার শিল্পী বলে কে স্বীকার করলে?"

অশোক মোটেই রাগ করে না। হেসেই জবাব দেয়ঃ "যার জন্মে এত আয়োজন তিনিই কাল সন্ধেবেলা তাঁর পোড়োবাড়ীটা একবার সাজাবার জন্মে শিল্পী অশোক বোসকে এ্যাডভান্স করে গেছেন। অতয়ের তুমি আমার নিন্দে করলে কি হবে!"

"তবে ত' তুই এবার মোটা টাকা পাচ্ছিস!" চাপা হাসিটা অসীমার ছ'চোখে ফোটে।

রাসু কথায় টিপ্পনী তুলে বলে, "শচীনদা পর্য্যন্ত ঘরদোর নোতুন করে সাজান গোছানর ব্যবস্থা করছেন, আর মেয়ের পক্ষ বসে থাক্! চেকটা লিখে তুমি যেখানে যাবার যাও। আমি ঘরগুলো দেখি। একা মানুষ কতদিক করব!"

বামুনদি বললে, "এই জন্মেই একজন অভিভাবকের দরকার। কাজটা নইলে সুশৃঙ্খলে হতে চায়না। খাওয়া-দাওয়ার একটা ফর্দ্দ আছে, গয়নাগাঁটি, কাপড়-চোপড় জিনিসপত্তর অনেক ব্যাপার, এখন কি টাকার দিকে টানলে চলে! সবাই আমোদ করতে চায়।"

অসীমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা চেক লিখে দিয়ে বললে, "এখন এই পাঁচশ' নাও, পরে দেখা যাবেখন। তোমরা আমাকে ফতুর করবে দেখতে পাচ্ছি। আমার মিল সাজান কত দূর হ'ল কে জানে! যে যার ঘর সাজাচ্ছে যখন, কাজ যে ঐ দিকে কি হবে বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এই অশোক, ছুপুর নাগাদ তুই একবার সুজাতাকে চন্দন-নগর পাঠিয়ে দিস্, তোর চেয়ে আর্টের জ্ঞান ওর বেশী।"

"হ্যাঁ আর্টের একেবারে দেবী! ছোড়দি যা বোঝে, তার চেয়ে মা ভাল জানেন। ওর বুদ্ধিতে সাজালেই মিল সাজান হবে।" অশোক সহাস্য মুখে আবার নিজের কাজে চলে যায়।

অসীমা অশোকের উদ্দেশ্যে বললে, "কাল বিকেলে যাস দেখবি তোদের চেয়ে কেমন সাজান হয়েছে। আলোর মালাই কী এক ছাঁদে ঝোলান হয়েছে! কত রকম ভাবে যে ডেকরেটরগুলো সাজাচ্ছে দেখলে অবাক হবি।"

রাসু চেকখানা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে ঠোঁট উল্টে বললে, "আমাদের ঘর-সাজানও দেখবে সেদিন! শোয়ার ঘর, বসার ঘর নিমন্ত্রিতদের জন্য নিচের ড্রাইংরুম কি ভাবে সাজিয়েছি। এখন খাটজোড়া এসে গেলেই শোয়ারঘর সাজান হয়ে যাবে। দেওয়ালের রংয়ের সঙ্গে ম্যাচ করে বিছানাপত্তর তৈরী করে ফেলেছি। এমন কি, সেদিন কোন ডিজাইনের গয়না পরবে, তাও অশোককে দিয়ে ঠিক করতে হবে।"

"ঐ তবে কর!" অসীমা হাসতে হাসতে বারান্দা পেরিয়ে চলে যায়।

"বামুনদিদি—" অসীমা মোটর থেকে হাঁক দিচ্ছে শুনে বামুনদি দৌড়ে এগিয়ে যেতেই অসীমা চাবির গোছাটা দিতে দিতে বললে: "এই চাবি রইল আমি রাতে ফিরব, যদি ভাঙ্গানী টাকা লাগে আলমারী থেকে নিও। কাল কি ঠাকুর পূজো দেবে বলছিলেনা, যা লাগে নিয়ে নিও।"

অসীমার মোটর গেটের বাইরে চলে যাওয়া পর্য্যন্ত বামুনদি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চাবিটা নিয়ে গিয়ে রাসুর হাতে দিতে দিতে হেসে সে বললে, "তুমি ত' রাগই কর! বেচারী যে লজ্জা পায় বোঝনা। বড় হয়েছে ত'।"

রাসু খুশি হয়ে বললে, "লজ্জা পেলে চলবে কেন? এত শিক্ষাদীক্ষা হ'ল তবু যদি লজ্জা করে বসে থাকে, তবে করবে কে? বাপ ত' নেই যে করবে!"

সখেদে বামুনদি বলে—"সেই জন্যেই ত' আমাদের জোর করতে হবে। যাক্ আমি কিন্তু বরণডালার ব্যবস্থা করেছি। দিদিমণি রাগ করলে তুমি সামলাবে। স্ত্রীআচারটা অন্ততঃ একটু করা উচিত। কি বলো রাসুদি ?"

রাসু মাথা দুলিয়ে বললে, "সে জন্যে ভেবনা। আমি ওসব সাহেবী বিয়ে পছন্দ করিনা, ঠাকুরমশাইকে দিয়ে একটা মাত্র পাঠ ঠিকই করিয়ে নেব।"

"শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে বিয়েটাই আমার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শচীনদা দিদিমণি কেউ রাজী নয়। বেশী ত' বলতে পারি না। চিরকাল হিন্দুরা যে বিয়েকে স্বীকার করে এসেছে, আজ ছাড়ি কি করে !"

কেন জানি রাসু হঠাৎ চমকে উঠল নিজের মনে। তারপরে ঐ প্রসঙ্গ একেবারে যেন সরিয়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘরের রং মিলিয়ে দরজা জানালার পর্দার ব্যবস্থা করতে।

অসীমা মিলের চতুর্দ্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। মিলের সীমানা থেকে আলোর মালা গেঁথে, মাঝে মাঝে তোরণের মত করে মিলের অফিস অবধি চলে গেছে। বিরাট ঐ লোহার ফটকের উপর নিজেদের জাতীয় পতাকা টাঙ্গানর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি সন্ধ্যায় পনেরোই আগষ্টের দীপমালা যাতে করে গঙ্গার জলে ঢেউ তুলে তুলে নাচতে পারে সেই জন্য, বহু উঁচু পর্য্যন্ত আলোর মালা টেনে মিলটিকে নানা ভাবে সাজান হচ্ছে। সানাই বাজবে তার জন্য মিলের সীমানা যেথান থেকে, সেই খানে অস্থায়ী একটা বাঁশের ঘর রঙ্গিন কাপড় আর কাগজের মালা দিয়ে এরই মধ্যে খাড়া হয়ে গেছে। ওদিকে শ্রমিকরা তাদের নিজেদের খরচে, যারা দেশ ভাগের হিংসায় আজ সর্ব্বহারা হয়ে ষ্টেশনে কোনরকমে এসে পৌচেছে তাদের, চিঁড়ে গুড় বিতরণ করার ব্যবস্থা করেছে দেখে, খুশি হয়ে অসীমা তাদের সঙ্গে যোগ

দিয়েছে। সে ঐ সঙ্গে প্রত্যেককে কাপড় দেবার ভারটা নিলে। স্বাধীন ভারতের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ঘরে ঘরে পতাকা উড়বে তেমনি এই দুঃখী মানুষগুলোর যতটুকু দুঃখ মোচন সম্ভব, সেদিন অন্ততঃ সে তা মোচন করবে। শুভদিনে ঐ গৃহহীন নিঃসম্বল লোকগুলো যদি ক্ষণিকের জন্যও ভুলে যেতে পারে তাদের জীবনের বিড়ম্বনা। স্বাধীনতার বাতাসে তারও যেন আবার বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে পারে, ক্ষতিকে আবার মানিয়ে নিতে পারে, জীবনের সামান্য লাভ দিয়েও। অসীমা আর বেশী কিছু চায়না। যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ হবে না কোনদিন। তবু বাঁচার জন্যে এই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মানুষগুলো একবার উঠে দাঁড়াক, এই সে চায়।

অসীমা ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ায় আফিসের কাছে। শচীন ব্যস্তভাবে হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, "আর দেরি নয়, বাড়ী ফেরা যাক্, সব কম্‌প্লিট!"

অসীমা এদিক ওদিক চেয়ে সুবিধা মত বলে ফেলে, "কম্‌প্লিট আর কোথায়, এখন অশোককে ডেকে চুপি চুপি ঘরটা সাজান বাকী।"

শচীন হাসতে হাসতে বলে, "অশোকটা দেখছি রীতিমত ট্রেচারাস্!"

অসীমা হাসিটা চেপে মোটরের দিকে এগুতে এগুতে বললে, "নইলে আমিই বা গোপন খবর পাই কি করে! দু' একজন এরকম ট্রেচারাস্ লোক সত্যি প্রয়োজন!"

শচীন বললে: "এই জন্যেই বুঝি অশোকটা তখন হাসছিল! দাঁড়াও ডেঁপো ছেলেটার আমি কি করি!" শচীন মোটরের দরজা খুলে দেয় অসীমার উঠে বসার জন্য।

"আপাততঃ করার মধ্যে, ওর ইচ্ছে মত তোমার বেডরুমটা সাজাবার হুকুম দিয়ে দাও, তাহলেই জব্দ হবে দুষ্টু ছেলেটা!" অসীমা হাসতে হাসতে মোটরে উঠে বসে।

শচীন সহাস্য মুখে বলে, "তবেই হয়েছে! যে ভাবে তোমার ঘরে অশোক রং আর তুলির সদ্‌ব্যবহার করছে, আমার ঘরের দেওয়ালে অমন রং ঢাললে থাকতে পারব না। আমি একটু সাদাসিদে পছন্দ করি।"

"তাই বটে! সাদাসিদেই লোক তুমি! বেশ ত' দেওয়ালটা না হয় শাঁকের মত সাদা করে, একটু একটু সব রংয়েরই ছিটে দিয়ে দেবে, যাতে করে রংয়ের ছিটেও রইল, অথচ লোকেও বুঝল বড্ড সাদাসিদে ভাবের লোকটি! চুপি চুপি রং করান হচ্ছে, আবার সাধুমী! অশোকটা কেমন রং ঢেলে দেয় চারিদিকে দেখবে।" কথার সঙ্গে সঙ্গে অসীমা হেসে ওঠে।

শচীন অসীমার পাশে বসে মোটরের দরজা বন্ধ করতে করতে বলে, "অশোক আর কত রং ঢালবে, শ্রীমতী অসীমা দেবীই ত' সে ভার আগেই নিয়ে নিয়েছেন। এখন দুটো দিন কাটাতে পারলে হয়।"

অসীমা কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে, "বছরের পর বছর কাটিয়ে এখন বুঝি দুটো দিন আর কাটান যাচ্ছে না! এসব দুর্ব্বলচিত্তের লোকগুলোকে শাস্তি দিতে হয় সারাদিন কাছে বসিয়ে সময় ঘণ্টা গোনান।"

"তাতে বরং খুশিতেই থাকব, যাবে বেড়াতে?" শচীন সাগ্রহে অসীমার দিকে তাকায়।

অসীমা ঝিলের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে, "আজ আর নয়, কাল আর পরশু সারা দিন মোটরে ঘুরে শহর বেড়িয়ে বেড়াব। সত্যি আমারও যেন এই দুটো দিন বড্ড বড় মনে হচ্ছে। সারাক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালে বেশ হবে কিন্তু! পরশু দিন একেবারে দশটায় বাড়ী ফিরব।"

হেসে শচীন বললে, "আমার আপত্তি নেই।" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীন তার গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে, ঝিলের লাল কাঁকরের পথের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে রঙ্গিন মালা আর পতাকার বাঁশগুলো বাঁচিয়ে এগিয়ে চলল।

বাইশ

রাসু শচীনের হাত থেকে তোয়ালেখানা নিতে নিতে বললে, "তুমি কিন্তু এখনই চলে যেওনা। আমি মাসীমার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। দেরি হবেনা, আমি চট্ করে খেয়ে আসছি।"

"আমার জন্যে তোমাকে চট্ করে খেয়ে আসতে হবে না। আপাততঃ তোমার নেমনতন্নের অনুগ্রহে, ঘণ্টাখানেক হাত পা ছড়িয়ে পড়ে না থাকলে আর উপায় নেই।" বলে সহাস্যে শচীন বারান্দার ঈজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে।

ওপাশ থেকে অসীমা বলে, "এতেই তুমি হাত পা ছড়াতে চাও, এখন ত' বেচারীর এত যত্নে সাজা পানটি তুমি খাওনি। এই বদ্ধ পাগল বুড়ী যে কি আরম্ভ করেছে বলা যায় না!" হাসতে হাসতে অসীমা রুপোর ডিসে সোনালী তবক মোড়া পানের খিলি ক'টি এগিয়ে দেয় শচীনের দিকে।

অসীমার হাসিতে রাসু বোধ হয় মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েই জবাব করে, "বেশ আমি না হয় পাগলই হলাম। কিন্তু আজও যখন রয়েই গেছি তোমাদের শুভদিনটা দেখার জন্যে, তখন এই দুটো দিন আমার কথা মত চললে তোমাদের সম্মানে লাগবেনা। সব জিনিসেই কেবল হাসি আর টিট্‌কিরী!"

রাসুকে ক্ষুণ্ণ করতে শচীনের মনে কেমন যেন আঘাত লাগে। সে কথার মোড় ঘোরাতে সাগ্রহে বলে ওঠে, "সীমার কথায় কান দিও না। যা সত্যি নিয়ম তুমি করবে বই কি! ওর সাহেবীআনার জন্যে তুমি

পিছিয়ে গেলে চলবে না।" কথার সঙ্গে সঙ্গে রাসুকে খুশি করতে শচীন পানের ডিস থেকে একটা খিলি তুলে নেয় আগত' ভাবে।

রাসু শচীনের উৎসাহ পেয়ে উৎফুল্ল ভাবে বললে, "তুমি যখন পছন্দ করছ, তখন ওর মতামত থোড়াই মানি। মাসীমার কাছে যাচ্ছি বৌ বরণের কথাটা বলতে। হিন্দু মতে বিয়ে হ'লনা বলে, বৌবরণ হবেনা এ কেমন কথা! আমি ও সব শুনছি না। মাসীমা ত' মাটির মানুষ, যে যা বলবে, তাতেই তিনি হাঁ বলবেন, আমি ওঁকে অত ঢিল দিতে দেবনা। যা নিয়ম তাই করতে হবে। যাক্ তোমরা গল্প কর ততক্ষণ, আমি যাই।" রাসু তোয়ালে হাতে ব্যস্ত পায়ে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

অসীমা রাসুর দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সহাস্য মুখে বললে, "যে টুকু ত্রুটি ছিল সেটুকুও সেরে নিতে মা'র কাছে চলল বুড়ী। বাবারে বাবা, কি ভালা কুলোই সাজাচ্ছে, নিচে নামবে যখন একবার ঘুরে দেখো কাল কি ব্যবস্থাটা হচ্ছে।"

মৃদু হেসে শচীন বলে, "মানুষকে খুশি করতে হয়। বিশেষ করে জীবনের এই শুভক্ষণটায় সকলের আশীর্ব্বাদ, অন্তরের শুভ কামনাই ত' আমাদের প্রয়োজন! রাসুকে বাধা দিয়ে ওর মনটাকে আমি দমিয়ে দিতে পারলাম না! আর বলতে গেলে এসব মেয়েলী অনুষ্ঠানগুলোর কোন মূল্য না থাকলেও, বেশ সুন্দর কিন্তু।"

"অতই যদি সুন্দর মনে হয়, তবে হিন্দু মতে বিয়েটাতেই বা বিরক্তি কেন?" অসীমা শচীনের চেয়ারের হাতলটার উপর ঝেঁকে বসে জোরাল একটা তর্কের সুযোগ পেয়ে।

শচীন হাসতে হাসতে বলে, "মেয়েলী আচার, অনুষ্ঠান সুন্দর লাগে বলে পাথরের নুড়ীটিকেও বিশ্বাস করতে হবে এমন কথা আমি কখনই বলি না। কেননা, ঐ নির্ব্বাক ঠাকুরে আমার কোন কালেই ভরসা

নেই। আইনকে সাক্ষী রাখাই হ'ল বুদ্ধিমানের কাজ। বিপদে আইনের শরণ নেওয়া চলবে, কিন্তু ঐ মুড়ীটি কোন কাজেই আসবে না।"

"অর্থাৎ বিয়েটা অস্বীকার করা যাবে না এই বলতে চাও ত' ?"

"হ্যাঁ, অস্বীকার করা যাবে না। আইন তা'হলে তোমাকে শাসন করবে।"

"যাক্ ভালই! যে ভাবে কথাগুলো বলছ, তাতে করে মনে হচ্ছে যে, আমি যেন বিয়েটা অস্বীকার করার মতলবেই রয়েছি। অতএব আইনের শৃঙ্খলে আমাকে বাঁধা হচ্ছে।" অসীমা খিলখিল করে হেসে ওঠে কথার সঙ্গে সঙ্গে।

কৌতুকের সুরে শচীন বলে, "বিশ্বাস কি! যা পল্‌কা মেয়েদের মন কখন যে কোন দিকে তারা নুয়ে পড়ে, স্বয়ং বিধাতাও বোধকরি বুঝতে পারেন না। আমি ত' নেহাত নগণ্য মানুষ। সুতরাং যাতে করে আমি সব দিক থেকে তোমার মত সুন্দরী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না নারীটিকে, চিরদিন নিজের অধিকারে বন্দিনী করে রাখতে পারি, তার জন্যে চেষ্টা করব বইকি।" কথার শেষ রেশটার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে অসীমাকে শচীন আরও ঘন করে নিজের কাছে টেনে নেয় দু'জনেই বুঝতে পারেনা।

হঠাৎ চম্‌কে অসীমা সোজা হয়ে বসে বলে, "নিচে গোলমাল যেন! কি হ'ল ?"

শচীন তখনও বোধহয় স্বপ্নের মধ্যেই ছিল, অসীমার চম্‌কে ওঠায় বিস্মিত হয়ে বললে, "কি হ'ল উঠে বসলে যে ?"

"নিচে বড্ড একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না ?"

শচীন একটু কান খাড়া করে থাকার পর, ঔদাস্যের হাসি হেসে বললে, "ও কিছু নয়, বোধ হয় ভিখিরী ঢুকেছে। যা বাতি জ্বেলে রেখেছে চারিদিকে, ভেবেছে আজই বুঝি ভোজ।" শচীন অসীমাকে নিজের কাছে টেনে নেয় আবার।

কিন্তু নিচের তলার গোলমালটা ক্রমশঃ এত বেড়ে উঠল এবং এগিয়ে আসতে লাগল যে, ভীষণ বিরক্ত হয়ে অসীমা বলে ওঠে, "একটা ভিখিরী নিয়ে কি গোলমালটাই না সুরু করেছে! একমুঠো ভাত দিয়ে বিদেয় করে দিলেই চুকে যায়, না রাত্তির বেলা হৈ হৈ করে তাড়া করেছে! রাসু কি করছে? একটু যদি স্বস্তি থাকে আমার!" অসীমা শচীনের ঈজিচেয়ারের হাতলের উপর থেকে ছিট্‌কে নেমে ক'পা এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিচে থেকে "ধর ধর ওপরে গেল, ওপরে গেল" ব'লে প্রচণ্ড একটা কলরবে, কৌতূহলী হয়ে শচীন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই অসীমা আকস্মিক ছুটে এসে একেবারে পথ আগলে দাঁড়ায়—"যাচ্ছো কোথায়? শেষে কি গুণ্ডার হাতে প্রাণ দেবে?" বলে, অসীমা শচীনের হাতটা শক্ত করে ধরে একেবারে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়াল। ভয়ে ভাবনায় মুহূর্ত্তে যেন সে দু' চোখে অন্ধকার দেখছে। দিনকাল যা পড়েছে, বিশ্বাস কোন কিছুতেই নেই। সন্ধির পরেও গুণ্ডারা আনাচে-কানাচে উৎপাত একটু করবেই।

ব্যাপারটা এদিকে শচীনের কিছু বুঝবার আগেই, অসীমা যে ভাবে ভয়ার্ত্ত মুখে ছুটে এসে হাতটা চেপে ধরল, তাতে প্রথমটা সত্যিই সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হট্টগোলটা সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে আসছে শুনতে পেয়ে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনা। কিছু একটা বিপদের সম্ভবনা বুঝেই সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, সবলে অসীমার হাতটা থেকে নিজের হাত সে ছড়িয়ে নিতে নিতে বলে ওঠে, "আঃ! ছাড় দিকি—এরকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত' চলবে না!" কথার সঙ্গে সঙ্গে শচীন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাবার আগেই হি হি হি করে হাসতে হাসতে যে লোকটা একটা লাফ মেরে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে পড়ল, তাকে দেখে অসীমা চিৎকার করে উঠল, "পা গো ল...পা গো ল, সরে দাঁড়াও!"

"পাগল না ছাই, ব্যাটা পাকা চোর!" ভোলানাথ একটা টপকান দিয়ে এসে দাঁড়ায় বারান্দার উপর লাঠিটা বাগিয়ে ধরে। সেই সঙ্গে দারোয়ান ছুটো, বাগানের মালী জগদীশ, কেষ্ট, এমন কি বাতে পঙ্গু বুড়ো চাকর তারানাথও কোমরটা কোন রকমে খাড়া করে লাঠি ঠুকে তেড়ে এল লোকটাকে।

এক সঙ্গে এতগুলো লোকের তাড়া খেয়ে পাগলটা কিন্তু মোটেই ভড়কে যায় না, বরং সামনে লম্বা টানা বারান্দাটা পেয়ে যেন খেলার সুবিধা হয়েছে এমনি একটা খুশির হাসি হেসে, "চু—" বলে হা-ডু ডু ডু খেলার মত অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে দৌড়তে আরম্ভ করে দিলে।

কেষ্ট হেসে ফেলে বললে, "আর খেলতে হবে না—উঃ, কি লাথিই ছুঁড়েছিল তখন!"

জগদীশ হুম্‌কী মেরে বলে, "বক্ বক্ না করে দড়িটা ঠিক করে ধর। এই রামসিং আচ্ছা করে দড়ি পাকড়ে ধরবি। সুন্দরসিং এদিকটা ধরে থাক্।" কথার সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ দেওয়াল ঘেঁষে পাগলটার পিছু পিছু কিছু দূর অবধি গিয়েই হঠাৎ এমন ভাবে হাতের দড়িটা ছুঁড়ে মারে পিছন দিক থেকে যে, লোকটার কোমরে ফাঁসটা জড়িয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ভোলা সকলের আগে ফাঁসটা কোমরে ভাল করে বেঁধে দেবার জন্যে যদিও এগিয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সামনে এগুতে আর সাহস করলে না। দু'চোখ ঘোলা করে পাগল উঠে দাঁড়িয়েছে আবার।

পিছন থেকে লাঠির খোঁচা মেরে তারানাথ খিঁচিয়ে ওঠে, "নবাবপুত্তুর এবারে কি করবে? অফিস রুমে টেবিলের তলায় লুকিয়ে থাকা! মেরে হাড় এবারে গুঁড়ো করছি!"

এই ফাঁকে কেষ্ট ধাঁই করে একটা লাঠির বাড়ি পাগলটার পায়ে বসিয়ে দিলে—"ম্যাথ্ লাথি ছোঁড়ার সুখ! পেটে ব্যথা ধরে গেছে একেবারে!"

জগদীশ এতক্ষণ রুদ্ধরোষে ফুঁসছিল, এইবার সেও দু'ঘা লাঠির বাড়ি দিয়ে শচীনের দিকে ফিরে বললে, "ব্যাটা খুনে আমার হাতটা কি করেছে দেখুন!" বলে সে রক্তমাখা নেকড়া জড়ান কব্জিটা তুলে দেখায়।
কেষ্ট দু'চোখ কপালে তুলে কথায় রসান কাটে, "কাটারীটা ওর গলাতেই দেওয়া উচিত। উঃ—কি ভয়ানক লোক, কাটারী বাগিয়ে টেবিলের তলায় বসে আছে। দেব এক ঘায়ে মাথা ঠাণ্ডা করে!" কেষ্ট সত্যিই পাগলের মাথায় লাঠিটা হঠাৎ বসিয়ে দিল দেখে, এতক্ষণ বাদে যেন স্বম্বিত ফিরে পেয়েছে এমনি ভাবে শচীন বলে উঠল, "আরে মেরে ফেলবি যে! পাগলকে কি মারে? বসে পড়ল যে, ভ্যাখ্!" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে কাছে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তারানাথ বলে, "আপনি কাছে যাবেন না। আপনাকেই খুন করার জন্যে ওত পেতে বসেছিল।"
ভোলানাথ বলে, "রাগ, ত' আপনার ওপরেই। আমি ভাগ্যিস সুন্দর-সিংকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম নইলে, কি বিপদ যে করত কে জানে! বলে কি, জেনারেল ম্যানেজারের মাথাটা আজ ওর বৌকে উপহার দেবে। ওই বলে সর্ব্বনাশের গোড়া, নইলে আজ ওর কি টাকার অভাব?"
বৃদ্ধ তারানাথ পাগলের অভিযোগ সম্বন্ধে যে টুকু রেখে, ঢেকে বলছিল, সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সরল বালক কেষ্ট সেটার উপসংহার টেনে সহাস্যে বললে, "শুনুন কতদূর কথা! বলে আপনি ওর বৌকে নাকি ভাগিয়ে এনেছেন—তাই খুন করবে!"
শচীন চাকর-দারোয়ানের সাম্‌নে এই বিশ্রী কথাটা শুনে অসন্তুষ্ট হলেও পাগলের উক্তিকে গ্রাহ্য না করে বললে, "যাই বলুক মারতে হবেনা লোকটাকে, বাঁধ্ শক্ত করে আমি ফোন করছি পুলিসে।"
অসীমা এই মুহূর্ত্তে যেন একটা বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে এমনি ভাবে বলে উঠল, "তাই কর, লোকটার কী ভীষণ চেহারা!" ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় অসীমা।

ভোলানাথ বললে, "ঠিক যেন খেঁকী কুকুরটার মত মুখ খিঁচুচ্ছে বসে বসে।—এই ওঠ্!" সে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারে। পাগল তবু সাড়াশব্দ দেয়না। যেমন বসে পড়েছিল কেষ্টর লাঠির বাড়িতে মাথা ঘুরে, তেমনি আড় ভাবে বসে, দেওয়ালের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে মুখ খিঁচুচ্ছে, কলা দেখাচ্ছে আর বিড় বিড় করে কি যেন বক্‌ছে।

জগদীশ বহুক্ষণ এই বেঁকে ছোট্ট হয়ে যাওয়া রোগাটে মত লোকটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হেসে শচীনের দিকে ফিরে বললে, "লোকটাকে আপনি চিনতে পারছেন? তখনই আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল, দেখুন ভাল করে।" বলে সে শচীনের সামনে থেকে সরে দাঁড়ায়।

জগদীশের কথায় সকলেই সবিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকায়। কই কিছুই চেনা ত' মনে হয় না! এক মুখ দাড়ি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, নোংরা ছেঁড়া একটা ফুলপ্যাণ্ট পরনে, গায়ে একটা আস্ত জামা, দুটো হাতে পাগলদের বেড়ী। বোধ হয় কোন পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছে এই লোকটা।

কৌতূহলী হয়ে সবাই জগদীশের দিকে তাকাল। শচীন লোকটাকে মোটেই চিনতে পারে না। সে অসীমার দিকে চেয়ে বললে, "তুমি চিনতে পারছ? আমি ত' বুঝতে পারছিনা জগদীশের কে এমন চেনা লোক!"

অসীমা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "আর বিশ্লেষণে দরকার নেই! লোকটাকে পুলিসের হাতে দিয়ে দাও। দেখছনা কেমন ভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে!"

অসীমার কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক একটা কুৎসিত গাল দিয়ে পাগল সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল শচীনের উপর। কিন্তু দড়ির টানটা দু'জন লোকের হাতে দু'দিক থেকে আটকে রাখায়, পাগল বেশী দূর আর এগুতে পারলে না। ভীষণ আক্রোশে মাঝখানে দাঁড়িয়ে

হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে, যতখানি তার অভিধানে ছিল সব কুৎসিত ভাষাটা প্রয়োগের পরে, সদম্ভে বুক ঠুকে বললে, "জানিস আমি কে?' বাঙ্গাল চকোত্তি! আমার কাছে চালাকী? তোর ম্যানেজারী ঘুচিয়ে দেব। দিচ্ছি চিঠি লিখে।"

শচীন এইবার হেসে ফেললে। "বাবাঃ—একখানা ব্রেন বটে! পরের অনিষ্ট করার এখন পর্য্যন্ত ইচ্ছে। মিলের হাড় জুড়িয়েছে এতদিনে। হতভাগটা এল কোত্থেকে?" যার দিকে ফিরে চেয়ে শচীন কথাটার শেষ করে, সে তখন সভয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখটা অসীমার মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে, দু'চোখের পলক পড়ছে না, একটু ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো, নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত যেন ফেলতে পারছে না। ভূত দেখার আতঙ্কের মত সমস্ত অনুভূতিগুলো শরীর থেকে বুঝি একেবারে মিলিয়ে গেছে। অসীমা নিজেই ভেবে পায়না এই ভয়াবহ বিভীষিকার মধ্যে এখনও সে জীবিত আছে কিনা! দু'চোখে সে আর কিছুই দেখতে পায় না, শুধু মনে হয় যেন মূর্তিমান মৃত্যু কদর্য্য দাঁত খিঁচিয়ে তার কণ্ঠনালী সবলে টিপে ধরতে আসছে।

বিহ্বল বিস্ফারিত চোখে পাগলটার দিকে ঐ ভাবে অসীমাকে চেয়ে থাকতে দেখে শচীন বলে, "তোমার সেই কমলার স্বামী রত্নটি! চিনতে পারছ না?"

কেষ্ট ফাঁক থেকে মুখটা বার করে বলে, "যা দাড়ি-গোঁফের ক্ষেত করেছে চেনার কি জো আছে।"

জগদীশ মাথা দুলিয়ে নিজের বাহাদুরীটা প্রকাশ ক'রে বলে, "আমি কিন্তু ওর ঐ মিটমিটে চোখ দেখেই সন্দেহ করেছিলাম। তার ওপর বারে বারে ম্যানেজারের মাথা চাই, ডাক্ শচীন লাহিড়ীকে, এই সব বলাতেই মনে হয়েছিল মিলেরই কেউ হবে বোধ হয়।"

রামসিং এতক্ষণ বাদে হাতের দড়িটা দিয়ে ছপাৎ করে একটা বাড়ি

পাগলের পায়ে মারতে মারতে মন্তব্য করে, "হাঁ—হাঁ, ইবাত ঠিক হ্যায়! ছে মাহিনা আগে উ ত দেওয়ানা হো গিয়া।"

সুন্দরসিং একটু বয়স অনুপাতে বেশী গম্ভীর। সে এই ফাঁকে চট্ করে দড়িটার আর একটা প্যাঁচ পাগলটার পায়ের ফাঁক্ দিকে টেনে নিয়ে, তার ঐ নিস্ফল আক্রোশে হাতপা ছোঁড়টাকে বন্ধ করে বললে, "এ ছোটা বাবু—থোড়াসে চুপ্ রহ—"

"আর, থোড়াসে চুপ রহ্! যেমন লাফ্-ঝাঁপ মারছে তেমনি কি মুখের তোড়! হতভাগাটা মরতে কোন চুলো থেকে এল?" রাসু এতক্ষণ বাদে সিঁড়ি খালি পেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে থেকে উঠে এসে এগিয়ে যায় অসীমার কাছে।

বামুনদি' পূজা সেরে ঠাকুর ঘরের শান্তি জলের ঘটহাতে করে সেই থেকে অবাক হয়ে তেতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। এখন রাসুকে দেখে প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বলে উঠল, "ও মা, কি কাণ্ড দেখলে? শচীনদাকে বলে খুন করার জন্যে হাতে কাটারী নিয়ে বসেছিল টেবিলের তলায়! দূর করো, দূর করো, এই পাজী খুনেটাকে! এই না বলে রাঁচিতে পাঠান হয়েছিল?"

রাসু একেই শুভ একটা সময়ে হঠাৎ এই গোলমালটা ওঠায় মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল, এখন একেবারে ক্ষেপে উঠল খুন করার কথাটা শুনে। রাগে উদ্ধত হয়ে ভোলানাথের দিকে চেয়ে বললে, "শচীনদা কোথায়? বের করে দে শয়তানটাকে মেরে। আমার সুখের ঘরে কাঁটা বিঁধবে এই লক্ষীছাড়া ভিখিরীটা! এক্ষুনি তোরা মারতে মারতে দূর করেদে—ছিঃ ছিঃ যত সব অলুক্ষণে কথা! কাল আমার ছেলের বিয়ে!—"

"বিয়ে, তার জন্য কি হ'ল?" শচীন পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পুলিসকে ফোন করে। তারপর ব্যাপারটাকে একটু সহজ করার জন্যই

হেসে বললে, "পাগলের কথার কোন যুক্তি আছে নাকি! আগাগোড়াই আমার ওপর স্কাউণ্ড্রেলটার দেখ্‌ছি ভীষণ আক্রোশ! মিলে চুরীর সুবিধেটা ত' তেমন পেত না, তাই মনে মনে যা ভাবত' এখন সেগুলো সব মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে।"

"তাই বলে বুঝি ক্ষমা করবে তুমি? দূর করে দাও।" বামুনদি উচ্চ-কণ্ঠে উক্তিটা ক'রে পাগলের দিকে তাকায়।

শচীন অবস্থার বিপর্য্যয়ে শান্ত ভাবেই জবাব দেয়, "দূর করে দেব কোথায়? রাঁচী পাঠাতে হবে। পুলিসে জিম্মা নেবেনা। নেহাত আমার কথায় কাল জমাদার এসে দিন দুই এটাকে জেলে আটকে রাখবে। তারপর রাঁচী থেকে লোক এলে, ভাড়া দিয়ে পাঠাতে হবে। পালিয়ে এসেছে ওখান থেকে।"

মুখটা ভেংচে রাসু বললে, "পালিয়ে একেবারে উপকার করেছে! এখন পাপটাকে রাখবে কোথায় শুনি? জ্ঞান, গম্যি যার নেই, তাকে আমি ঘরে থাকতে দেবনা। শেষে সব নোংরা করুক আর, কি—!"

জগদীশ হেসে ফেললে রাসুর কথাটা শুনে। সত্যিই এটা একটা ভাববার কথা! শচীনের দিকে চেয়ে বললে, "বড়বাবুর স্নানঘরটায় বন্ধ করে রাখব? তারপর কাল মেথর ধোয়ালেই হবে।"

মস্ত বড় একটা সমস্যার যেন সমাধান হয়ে গেল, এমনিভাবে শচীন ঈজিচেয়ারটার উপর বসে পড়ে বললে, "সেই ভাল, চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে ঘরটায় বন্ধ করে রাখ।"

পাগল এতক্ষণ নিজের মনে অনর্গল গালাগালির যেন ফোয়ারা ছুটিয়ে চলেছিল। হঠাৎ শচীনকে কাছাকাছি চেয়ারটায় বসতে দেখে বার কয়েক বেশ ভাল করে দেখল। তারপর, একটু মুচ্‌কে হেসে বললে, "কি হে সিরাজদ্দৌলা দিল্ বেশ খুস্ আছে ত'? 'তোমার মালেকা মহাশয়াটি কোথায়?"

শচীন হঠাৎ, কি জানি কেন, জোরে একটা ধমকানি দিল। খুব প্রচণ্ড জোরে। মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকটা ঘুরে পড়ে গেল।

রাসু চম্‌কে উঠে বললে, "মরে গেল নাকি?"

তারানাথ ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে বলে, "না গো-ঠাকৃরুণ! এটার দেখছি কেঠোর আয়ু। এই ভোলা, কেষ্ট, তোরা এই অবসরে হাত দুটো বেঁধে ফেল্, তারপর নিয়ে যা।"

জগদীশ এদিক-ওদিক থেকে কিছু না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিজের কাঁধের গামছাটা দিয়েই পাগলটার হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে ফেলতে ফেলতে বললে, "হাঁ, এই অবসরেই স্নান ঘরে বন্ধ করা যাবে। একটু জ্যান্ত হলেই ত' তিড়িং-বিড়িং করবে।"

শচীন পাগলকে কতকটা ক্ষিপ্তের মতো জোরে ধমকানি দিয়ে মনে মনে যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। যে কিছু বোঝেনা মাথাতেই যার গোলমাল তাকে বকাবকি করে লাভ কি? বরং এটা সাধারণ মানুষের নীতির দিক থেকে অন্যায়। "আগে একটু মুখে চোখে জল দাও, ইশ কিছু নেই শরীরে! একটা ধমকেই অজ্ঞান হয়ে গেল।"

একটু এগিয়ে পাগলের মুখের উপর ঝুঁকে কেষ্ট বলে উঠল, "কিছু না! চোখ পিটুপিটু করছে, বোধ হয় মাথাটা একটু ঘুরে গেছে।"

"যাই হোক্ এখন ধর্ দিকি এটাকে স্নান ঘরে নিয়ে যাই।" ভোলানাথ জগদীশকে সাহায্য করতে পাগলের মাথার দিকটা তুলে ধরে কথার সঙ্গে সঙ্গে। সাম্‌নেই স্নানঘরে পাগলটাকে আটকে রেখে চাকরগুলো হৈ হৈ করে সব দল বেঁধে হাসতে হাসতে যে যার ঘরে চলে গেল। মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যাপার! বাড়ীটার সম্পূর্ণ আবহাওয়া যেন হঠাৎ বদলে গিয়েছে একেবারে। শচীন চুপ করে স্নান ঘরের দরজার কাছে তখন পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে দেখে, রাসু একবাটি দুধ দুম্ করে পাগলটার কাছে রেখে বললে, "তুমি এখানে কি করছ? দিব্বি ত' উঠে বসে

গব্‌গব করে কেমন ভাতগুলো খেল, দেখলে না? মারাটা উচিত হয়েছিল, যত সব নোংরা আর অলুক্ষণে কথা! মেয়েটা কেমন যেন মন মরা হয়ে গেছে। তুমি আজ আর বাড়ী না হয় যেওনা, ও একা থাকতে পারবে না। টেবিলের তলায় কাটারী নিয়ে বসেছিল, ভাবলেই যে গায়ে কাঁটা দেয়। না না বাপু, আজ তুমি এখানে থাক, কাল স্বস্তেন করে তবে বিয়ের ব্যবস্থা!" শচীন পাগলটার দিকে একনজর দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বল্লে, "তোমরা দেখছি সবাই ভীতু আর কুসংস্কারগ্রস্ত! সীমা ত' একেবারে বোবা হয়ে গেছে লোকটার ব্যাপার দেখে। যাক্, দরজায় তালাটা দিতে ভুলনা, আমি সীমার ঘরে যাচ্ছি. ওদিকেও একটু ধমক না দিলে চলবে না। আচ্ছা সব তোমরা! সেই কাকে কান নিল অবস্থা!" শচীন সহজ মনে, সচ্ছন্দ গতিতে অসীমার পাশে এসে দাঁড়াল। অসীমা খোলা জানালার দিকে চেয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করে বসেছিল। শচীন যে ঘরে ঢুকল, পাশে এসে দাঁড়াল, কোন খেয়ালই সে করলে না।

পাগলটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

অন্ধকার রাতে এইভাবে চিৎকারটা শুনে শচীনও যেন চম্‌কে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন বিরক্ত মুখে অসীমার বিছানায় বসতে বসতে বললে, "সারারাত এই ভাবে চেঁচালেই হয়েছে! যেমন হতভাগাটার চেহারা তেমনি কি আওয়াজ! যেন শকুনের কান্না!"

অসীমা কথার জবাব করে না, শুধু ক্লান্ত অবসন্ন মাথাটা শচীনের কোলের উপর গুঁজে চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

সান্ত্বনা দেবার জন্য শচীন হাসবার চেষ্টা করে বললে, "পাগল দেখে তুমিও কি হঠাৎ পাগল হলে নাকি? কি হয়েছে বল ত'?"

"না না কিছু নয়।" অসীমা একটা চাপা উত্তর দেয়।

"কিছুই নয় ত' অমন করছ কেন? একটা পাগল দেখে থেকে তোমরা যে ভাবে হৈ চৈ সুরু করেছ, সত্যি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি আমি। ওকি

তোমাকে আঁচড়াচ্ছে না কামড়াচ্ছে, যে অমন শিউরে সাদাটে হয়ে গেছ ? দেখি মুখ তোল।" শচীন সহাস্যমুখে জোর করে দু'হাত দিয়ে অসীমার মুখটা তুলে ধরে।

আবার চীৎকার ক'রে ওঠে পাগলটা!

শচীন উষ্ণ হয়ে বলে উঠল, "আঃ—কি করি এটাকে নিয়ে বল ত'? আচ্ছা এক শনিগ্রহ জুটল দেখছি।"

অসীমা নির্জীব গলায় এতক্ষণ বাদে বললে, "চলো কোনখানে পালিয়ে যাই, যাবে? আমার মনে হচ্ছে ও আমাকে মেরে ফেলবে!" কথার শেষ রেশটা মিলিয়ে যাবার আগেই, কেমন যেন একটা ভয়ে আতঙ্কে অসীমা শচীনের হাতটা ধরে বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসে। অসীমাকে এরকম দুর্ব্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়তে দেখে, শচীন মনে মনে একটু কেমন আশ্চর্য্য হয়। উদাস স্বরে বলে, "ওর ভয়ে তুমি পালবে বেশ কথা ত'? ভোর হতে না হতেই এটা ঘাড় থেকে নাববে। মনটা এখন সুস্থ কর দিকি! কালকের কথা ভুলে এসব বাজে কথা ভাবতে হবেনা।"

অসীমা একটু সময় শচীনের দিকে চেয়ে থেকে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "হাসি, কান্না কোনটাই আমার আসছেনা। মনে হচ্ছে চিৎকার করে কাঁদলে বোধ হয় আমি সহজ হতে পারতাম। কখনও মনে হচ্ছে কাঁদব কেন? হাসব, খুব হাসব কিন্তু কোনটাই আমি পারছিনা—কেন বল ত'? আমাকে এখান থেকে শীগ্‌গির তুমি নিয়ে চলো। ওর বাতাসে পর্য্যন্ত আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বোধ হয় ও আমাদের মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেই এখানে আজ এসেছে! চলো, এক্ষুনি আমরা এখান থেকে চলে যাই—তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না!" অসীমা ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে শচীনের চোখে চোখ মিলিয়ে কি যেন বলতে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলে।

শচীন এতক্ষণ পরে অসীমার ভয়ের যথার্থ কারণটা বুঝতে পারলে।
হেসে সে বলে উঠল, "টেবিলের তলায় কাটারী হাতে নিয়ে বসে থাকলেই
কি খুন করতে পারে? আর, একটা বদ্ধ পাগলের কথার কি
কোন সত্যি অর্থ হয়? কি বাজে বাজে সব তোমার ভয় বুঝি না!
ভেবেছিলাম বন্ধুদের চিঠি লিখব, মাঝ থেকে আমার প্ল্যানটাই সব
নষ্ট হ'ল!"

স্তব্ধ অন্ধকার রাত থমথম করছে। মাঝে মাঝে পাগলের চিৎকার
শোনা যাচ্ছে। বদ্ধ ঘরে বসে অনর্গল বকে চলেছে পাগল নিজের মনে।
পাহারার জন্য দরজার উপর ভোলানাথ শুয়েছিল বোধ হয়। সে
কাঁচা ঘুমে জেগে রুক্ষস্বরে ধমকে ওঠে, "এই চুপ্!"

অসীমার ঘরে বসে চিঠি লিখতে লিখতে শচীন বললে, "এ যে Drama
within Drama! সব চেয়ে বড় আর্ট, যে-সে শিল্পীর কর্ম নয় একে
ফুটিয়ে তোলা!"

অসীমা কোন কথার জবাব দেয় না। নির্ব্বাক হয়ে বসে থাকে। মাটির
প্রতিমা যেন।

অসীমার এই স্তব্ধতা বোধ করি সহ্য করতে পারেনা শচীন। ঠেলা
দিয়ে চঞ্চল স্বরে বলে, "চিঠি লিখলে না যে?"

হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠতেই, ঝরঝর করে অসীমার কয়েক
ফোঁটা চোখের জল চিঠির প্যাডের উপর ঝরে পড়ল। সবিস্ময়ে
শচীন বললে, "কাঁদছ?"

জল ভরা ঝাপসা দৃষ্টি তুলে এতক্ষণ বাদে শচীনের সমস্ত বিস্ময় ও
কৌতূহলের অবসান ক'রে অসীমা বললে: "হ্যাঁ, কাঁদছি! আর
পারলাম না! একদিন যে নির্ব্বাক পাথরের নুড়িটাকে সাক্ষী রেখে
যে পুরুষের সহধর্মিণী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, এই পাগলই আমার সেই
স্বামী! আমি জানি, আর ঐ পাথরের নারায়ণ জানেন! আমাকে

তুমি ক্ষমা কর। আমাকে ছেড়ে দাও। জানি, এইভাবে নিজেকে অপমান করার চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু নেই! তবু চিরকালের সাক্ষীগোপাল যে নারায়ণ, তাঁকে কিছুতেই আজ ঠেলে ফেলতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা কর!...”

শচীন নির্ব্বাক দৃষ্টি অসীমার দিকে নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। দু'জনের চোখ-চোখি হয়, কেউ কোন কথা বলে না। জীবনের সব চেয়ে জটিল প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বোধ হয় এমনিই বিমূঢ় হয়ে যায়।

সমাপ্ত